১৩৩৮ বঙ্গাব্দে নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর

দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন প্রতিষ্ঠিত

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

# 'ভক্তি'

(১৩৩১ ভাদ্র হইতে ১৩৩২ শ্রাবণ পর্য্যন্ত

২৩শ বর্ষ)

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ।।

সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, জেলা হাওড়া
হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, "মানসী প্রেস" হইতে
প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য সডাক—১॥০ দেড় টাকা।

# "ভক্তি" ২৩শ বর্ষ সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| মঙ্গলাচরণম্ | প্রাচীন | ১ |
| সূচনা | সম্পাদক | ১ |
| তুমি আমার কে | সম্পাদক | ২ |
| আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন | পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ | ৩ |
| বিশ্বরূপের সঙ্গীত | শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী | ৫,২৫,৯০,১১৫, |
| শ্রীঅদ্বৈতের গর্ভবন্দনা | পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি | ৫ |
| শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী | ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা | ৮,৬৯,১০৭,১১৮ |
| ভক্তি ( রাগানুগা ) | শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৩ |
| অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম | ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা | ১৮,৫২,৭৩,১৩৯,১৮৬ |
| আলোচনা | সম্পাদক | ২৪,৬১,১১০,১৯০ |
| পঞ্চগীতা | পৃথকপত্রাঙ্ক | প্রতি মাসের শেষে |
| হরিনাম | শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক | ২৬ |
| গয়ায় পিণ্ডদান লীলা | পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি | ২৭ |
| শ্রীল ঠাকুর কবিচন্দ্র ভট্ট | শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট | ৩০ |
| আবাহন | শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী | ৪৭ |
| শক্তি সংগঠন | শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র প্রসাদ বসু | ৪৯ |
| বিজয়া | শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী | ৫৯ |
| প্রার্থনা | সম্পাদক | ৬৫,৮৯,১১৩,১৩৭,১৬১,২০১,২২৫,২৪৯ |
| শ্রীমতীর বিলাপ | পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা | ৬৬ |
| প্রেম রসময় গোরাচাঁদ | শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় | ৬৭ |
| শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ | শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট | ৭৮,১১৪,১৪৬,২২১ |
| তিনটী প্রশ্ন | শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট | ৮৫ |
| শ্রীচৈতন্য ভাগবত | শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ ভক্তিবিনোদ | ৯১ |

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীশ্রীতুলসী স্তোত্র | পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা | ৯৬ |
| একটী গান | ঐ | ৯৬ |
| শ্রীবৈষ্ণব ইতিহাস | শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী | ৯৭,১৩৪,১৫৬ |
| শ্রীবৃন্দাবনের তিন শ্রীবিগ্রহ | শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট | ১০০ |
| সুখ ও দুঃখ | সম্পাদক | ১০১ |
| শ্রীভক্তিরত্নাকর | শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ গোস্বামী | ১০৩ |
| উপাসনা কোথায় | পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ | ১১৫ |
| কালা তরে | শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক | ১১৭ |
| বৈষ্ণব সাহিত্যে দীনেশ বাবু | সৎ সাহিত্য সেবক | ১৩০ |
| নবদ্বীপ | শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক | ১৩৯ |
| গৌররায় | শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী | ১৪৫ |
| বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে দীনেশবাবু ও গোবিন্দ দাসের কড়চা | শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ ভক্তিবিনোদ | ১৫০ |
| শ্রীসরস্বতী বন্দনা | শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু | ১৬০ |
| বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট মহিমা | শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস | ১৬৩ |
| পাগলের খেয়াল | শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট | ১৭৮ |
| নগর ভ্রমণান্তে গৃহে প্রত্যাগমন কীর্ত্তন | শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী | ১৮০ |
| শ্রীগুরু স্তোত্র | শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বক্সী | ১৯৪ |
| বিরহিনী | শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস | ১৯৫ |
| মুড়গ্রামে গোস্বামী বংশ | শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী | ১৯৮ |
| রামকেলী সংস্কার | শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী | ১৯৯ |
| ত্যাগধর্ম্ম | পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ | ২০২ |
| কবে ন'দেবাসী হব | শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ গুহপাত্র | ২০৪ |
| মণিমন্দির | পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা | ২০৫ |
| নবদ্বীপে লক্ষণের শক্তিশেল চিত্র | শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস | ২০৭ |
| দশটী শাস্ত্রোক্ত উপদেশ | শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট | ২০৯ |
| প্রেম | শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বক্সী | ২১০ |
| শ্রীশ্রীহরিনাম | ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা | ২১৪ |
| বৈষ্ণব ব্রত তালিকা | শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর গোস্বামী | ২১৭ |
| প্রশ্ন | শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস | ২১৯ |

| | | |
|---|---|---|
| গান | স্নেহলতা | ২২০ |
| অভাগা | শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বক্সী | ২২৬ |
| বারাণসী ধামে শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অন্বেষণ— | | |
| | ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা | ২২৬ |
| ঘনশ্যাম-নরহরি কৃত ভক্তি-রত্নাকর | শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি | ২৩২ |
| বাল্য নৃত্য | শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস | ২৩৮ |
| করযোড়ে নিবেদন | শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী | ২৩৯ |
| প্রাপ্তপত্র সম্বন্ধে বক্তব্য | শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | ২৪১ |
| ভক্তি | শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, | ২৪৩ |
| রাগানুকামনা | শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপ্রসাদ বসু | ২৫০ |
| বর্ণাশ্রম ও শ্রীগৌরাঙ্গ | প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী | ১৫১ |
| ব্রজের পথে | শ্রীযুক্ত যদুপতিদাস | ২৫৪ |
| প্রতাপরুদ্র মিলন | ঐ | ২৫৫ |
| শ্যামবিনা | শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র প্রমাণিক | ২৬১ |
| নিবেদন | সম্পাদক | ২৬২ |
| ব্রজাঙ্গনার শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি | ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা | ২৬৫ |
| ব্যাকুলতা ও আক্ষেপ | শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ রায় | ২৭০ |


২৩শ বর্ষ সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

# ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

[ ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ( শ্রীজন্মাষ্টমী ) ১৩৩১ সাল ]

## মঙ্গলাচরণম্।

"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্র মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥"
"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

## ( সূচনা। )

আমরা নিজ শক্তিতে কখনও কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হই না, সকলই সেই মঙ্গলময় সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা। যাঁহার অপরিসীম কৃপাবলে এই তেইশ বৎসর যাবৎ "ভক্তি" পত্রিকা বহুভক্তের আদর-যত্ন লাভে সমর্থ হইয়াছেন, আসুন আজ সকলে মিলিয়া এই নব বর্ষারম্ভে সর্ব্বপ্রথমে নিখিল বিঘ্ন-বিনাশকারী সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া বলি—

"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্তৃপাতৃ প্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥"

হে মঙ্গলময়! তুমিই জীবের একমাত্র আশ্রয়, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তুমি বিশ্বের একমাত্র কারণ,—তোমারই শক্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নানারূপে বিকাশমান। তোমাদ্বারাই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংসাধিত হয়। তুমি পরম পুরুষ, তুমি নিত্য বস্তু, তুমি অব্যয় অর্থাৎ জন্মমৃত্যু রহিত, তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া আমরা আজ তোমারই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, তুমি কৃপাকরিয়া আমাদিগকে শক্তি সঞ্চার করিয়া কার্য্যের সাফল্য প্রদান কর।

# তুমি আমার কে?

ওগো! তুমি আমার কে? বল—বল নাথ, অমন ক'রে সুখেদুঃখে, সম্পদে বিপদে, আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর ফের, কিন্তু বুঝিতে পারি না, ধরিতে পারি না, দেখিতেও পাইনা। বুঝিতে বুঝিতে, ধরিতে ধরিতে, ভাবে ভাবে মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে অমনি কোথায় লুকাইয়া যাও। তুমি কি আমার পরম শত্রু, না আনন্দ দাতা পরম মিত্র? কিছুই ত স্থির করিতে পারিতেছি না, তুমি দয়া করিয়া দীনহীনকে বলিয়া দাও তুমি আমার কে?

এক একবার মনে হয়, তোমাকে ধরিয়া দু'টো প্রাণের কথা বলিয়া ধীরে ধীরে তোমার পরিচয় নিব, কিন্তু তুমি চোরের মত লুকাইয়া আসিয়া আমার প্রাণ ব্যাকুল করিয়া দিয়া আবার কোথায় লুকাইয়া যাও, কিছুই বুঝিতে পারিনা। চতুরচূড়ামণি! এবার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তুমি মিত্রই হও আর শত্রুই হও অথবা আমার কেহ না-ই হও, একবার দেখা দিয়া, পরিচয় দিয়া আশা মিটাও। আমিও তোমার সহিত আমার কি সম্বন্ধ তাহা জানিয়া নিশ্চিন্ত হই। আমার যাহা কিছু ভয়, আমার যাহা কিছু সন্দেহ, যতকিছু দুশ্চিন্তা সব দূর হইয়া যাউক।

মনের ত আমার স্থিরতা নাই-ই, তাই আবার এক একবার মনে হয় যখন তোমার পরিচয় পাইলাম না, তোমাকে যখন ধরিতে পারিলাম না, প্রাণের দু'টো সুখদুঃখের কথা বলিতে পারিলাম না, আর তুমিও যখন আমার কষ্ট বুঝিলেনা তখন তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু প্রাণ যে সেকথা শোনে না, সে যে সর্ব্বদাই তোমার পরিচয় পাইবার জন্য ব্যাকুল। কে তুমি অমন করিয়া

দেখা না দিয়া ভালবাসিতেছ, ভাল না বাসাইয়া নিজে ভালবাসিয়া প্রাণ টানিতেছ, পরিচয় না দিয়া—সম্বন্ধ না জানাইয়া সর্ব্বদা উপকার করিতেছ, আপনি প্রেম করিয়া ব্যাকুল না হইয়া আমাকে ব্যাকুল করিতেছ ? বল—বল নাথ তুমি আমার কে ? বড়ই বাসনা, বড়ই আগ্রহ, প্রাণ যথার্থই বড় ব্যাকুল হইয়াছে—একবার দেখা দিয়া বল তুমি আমার কে ?—

"দীনে, দেখা দিলে কি মান যাবে ?
আমি তব ঠাঁই, কৃপা নাহি চাই,
( কেবল ) চোখের দেখা একবার তাও কিনা দিবে ?
জানি হরি তুমি দেবারাধ্য ধন, ভক্তিভাবে তোমায় পূজে দেবগণ,
তা' ব'লে কি দেখা দিলে পতিতপাবন
পতিতের সঙ্গে পতিত হ'য়ে যাবে ?
তাই যদি হরি ভাবহে অন্তরে, না হয় দেখাদিও থাকিয়ে অন্তরে,
(যদি ) না রও অধিক কাল থেকে কিছুকাল
না হয় হরি আপন ঘরে চলে যাবে ॥
( যদি ) সরল হ'য়ে দেখা দিতে পাও ভয়, ( না হয় ) বাঁকা হ'য়ে দেখা দিও দয়াময়,
( যদি ) দেখিতে এ মুখ হওহে বিমুখ
( না হয় ) আড়নয়নে হরি আমার পানে চাবে ॥
( যদি ) হয় হে এ চিতে দিতে ও চরণ, সঙ্গে রেখ সদা প্রহরী আপন,
সত্য, দয়া, তপ, শৌচ, চারিজন
( তারা ) যেন আক্রমণ করে আমার সবে ॥

দীন—সম্পাদক

# আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন।

দেশ আজ শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত মধুর ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু কে সে বাণী শুনাইবে ? এ ধর্ম্মের প্রচার তো শুধু পুঁথি পড়াইয়া নয়; আচারেই এ ধর্ম্মের প্রথম প্রতিষ্ঠা, আচারেই এ ধর্ম্মের শিক্ষা, আচারেই এ ধর্ম্মের প্রচার। প্রভু আমার—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

প্রভু নিজেই বলিতেন,—"আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।" তাই আমরা আজ চারিদিকে নানারূপ ব্যভিচার, নানারূপ উৎপাৎ দেখিয়া তাহা নিবারণ-জন্য

আচারনিষ্ঠ আচার্য্যগণের পানেই চাহিয়া আছি। কেননা, তাঁহারাই যে এ ধর্ম্মের প্রচারক।

গৌর-কথায় যাঁহার প্রাণ গলিয়াছে, গৌর-নাম গ্রহণে যাঁহার পিপাসা জাগিয়াছে—তাঁহাকে আজ কোথায় পাইব? কে আজ আচারে প্রচারে আমার গৌর মহিমা গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারিবেন?

গৃহীই বা কি, আর ত্যাগীই বা কি—চাই আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন। যাঁহার চলনে, বলনে, লিখনে, পঠনে গৌর-প্রীতি ফুটিয়া উঠে, চাই এমনই সব গৌর-সর্ব্বস্ব আদর্শ বৈষ্ণব। যাঁহার চরিত্র প্রভাবে অবৈষ্ণবের হৃদয়েও বৈষ্ণবভাবের উদয় হয়—যাঁহার এতটুকু করুণাপাঙ্গ ভঙ্গী দর্শনে শত অপরাধীর চিত্তসরোবরও প্রেমচন্দ্রের শীতল কিরণে আলোড়িত হইয়া উঠে, চাই এমনই আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন। আসুন—কে কোথায় আছেন।

দেশে দেশে তখন এখনকার মত এত সংবাদপত্র ছিল না—পুস্তক পুস্তিকা বিতরণেরও এত সুযোগ সুবিধা ছিল না, তথাপি কেমন করিয়া চারিশত বৎসরপূর্ব্বে এ ধর্ম্ম এমন প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহা ভাবিলে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়। জ্ঞান বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ এক একটি ভক্তজীবনই তখন যথার্থ এক একটি সুবিশাল প্রচারকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। যে পথ দিয়া এমনই একজন বৈষ্ণব বিগ্রহ একবার গমন করিয়াছেন, অপূর্ব্ব চরিত্রমহিমায় সে সমগ্র দেশটাই ধন্য হইয়া গিয়াছে। রাজার অধিক ঐশ্বর্য্য, বৃহস্পতির মত জ্ঞান, কন্দর্পের মত রূপ এ সব কিছুরই উপর যাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, 'হা কৃষ্ণ' বলিতে সত্যই যাঁহার নয়ন গলিয়া দ্রষ্টার চিত্তকে আর্দ্র করিয়া তুলে, তেমন প্রচারক না পাইলে কি আর এই ঘোর কলিকালে উপায় আছে ভাই? শুধু কথায় প্রচার হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে আচার দিয়া প্রচার করিতে হইবে। আচার দ্বারা যে প্রচার তাহার তুল্য আর প্রচার নাই। তাই আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন গড়িয়া তুলিবার দিকে বেশী লক্ষ্য দেওয়াই এখন সকলের বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। মনে রাখিতে হইবে যে, একজন রঘুনাথ, একজন হরিদাস, একজন কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ হ্যাণ্ডবিল বিলি করিয়া তাহার শতাংশের একাংশ সাধনও সম্ভবপর নয়। সেইজন্য আদর্শ বৈষ্ণব-জীবন গঠনের দিকেই এখন সর্ব্বপ্রকারে অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

## বিশ্বরূপের সঙ্গীত।

### ( ১৯ )

৩৪।—বল্‌রে ভুবনমঙ্গল নাম ( এযে ) শ্রবণে মধুর।
এ নাম প্রেমামৃত রসপুর॥ ( হরিবোল, হরিবোল, )
এ নামে আছে এমনি সুধা, ( ইথে ) মিটায় বিষম বিষয় ক্ষুধা,
তৃষিতের তাপ তৃষ্ণা করে দূর ;—
হরিবোল যে বলে তার গোল ঘুচে যায়
ও তার হৃদে জন্মে প্রেমাঙ্কুর॥
যদিও সে নামনামী, অভিন্ন তবুও শুনি
হরি হ'তে হরিনামের মহিমা প্রচুর ;—
ও তার সত্যভামা জানিতত্ত্ব
কৈলেন নিজ ভ্রান্তি দূর॥
এ নামে প্রাণ আপনি মাতে, বারি ঝরে শীলা হ'তে,
মরুভূমে বাণ ডাকে শুনি শব্দ সুমধুর ;—
ওরে বিশ্বরূপের অবোধ মন
তুই হরি ব'লতে হ চতুর॥

## শ্রীঅদ্বৈতের গর্ভ-বন্দনা।

দেশ যখন অত্যাচার অনাচারে উপদ্রুত হয়, যখন প্রীতি ভালবাসার স্থলে হিংসা বিদ্বেষ মস্তক উত্তোলন করে, ভ্রাতৃভাবের স্থলে লোক অসুর ভাবাপন্ন হইয়া উঠে, ধর্ম্ম ম্রিয়মান হইয়া পড়েন, তখন ধার্ম্মিক যাঁরা, কাতর প্রাণে তাঁরা তাঁহারই স্মরণ লন—যিনি ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক। আর তখনই তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। ইহাই তাঁহার নিয়ম।

পাঠানরাজত্বের অবসান সময়ে যখন এ দেশে বিচার ছিল না, শাসন শৃঙ্খলা ছিল না; দেশ তস্কর দস্যুর লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল, লোকে মান ও প্রাণভয়ে সদা শশঙ্কিত ছিল, ধর্ম্মের নাম যেন দেশ হইতে দূর হইয়াছিল, তখন যে দুই একজন সাধুভক্ত দেশে ছিলেন, তাঁহারা প্রাণে প্রাণে ভগবানের কাছে ক্রন্দন করিতেন। তাঁহাদেরই প্রধান ছিলেন বঙ্গদেশে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য।

শ্রীঅদ্বৈত দেশের দুর্দ্দশা দর্শনে ভাবিতেন, এত অধঃপতন যখন মানব সমাজে ঘটিয়াছে, তখন কি তিনি আসিবেন না, যিনি তাহাদের একমাত্র গতি? এ কথা মনে হইলেই তাঁহার যেন ভরসা জন্মিত, মনে বল আসিত। তখন আপন মনে বলিতেন—হাঁ আসিবেন তিনি। কিন্তু অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ এক এক সময়ে নিরাশ হইয়া পড়িতেন। তখন তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিতে হইত;—তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিবার সময়ে কখন কখন অদ্বৈতের আবেশ উপস্থিত হইত, তাঁহার দেহমুখ তেজে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, আবিষ্টের ন্যায় তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন "ভয় করিও না তোমরা, তিনি আসিবেন—নিশ্চয় আসিবেন। আমি তাঁহাকে আনিবই; যদি না আইসেন, তবে এই দেহ হইতেই চতুর্ব্বাহু বহির্গত করিয়া লইব; সব অত্যাচার বিদূরীত করিব।"

শ্রীঅদ্বৈতের এ সব বাক্যের মূল্য অত্যধিক, কথাগুলি প্রতি অক্ষরে প্রাণময় ছিল। কারণ তিনি এইজন্যই সঙ্কল্প করিয়া ভগবদারাধনা করিতেন, গঙ্গাজলে তুলসীদলে অঞ্জলি অর্পণ করিতেন এবং তাহাতে নিজ মনে ভরসা পাইতেন। একদিন দুইদিন নয়, প্রতিদিনই এরূপ করিতেন, একদিন কিন্তু গঙ্গাজলে তুলসী ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল, অঞ্জলির কুসুমাদি উজাইয়া চলিল!

অদ্বৈত রহস্য বুঝিলেন, আনন্দে অদ্বৈতের নয়নে নীরধারা ঝরিতে লাগিল, আনন্দে তিনি সে অঞ্জলির কুসুমাদির অনুসরণে তীরে তীরে চলিলেন। যথা অদ্বৈত প্রকাশে—

"একদিন প্রভু ( অদ্বৈত ) বসি গঙ্গার গহ্বরে।
তুলসী চন্দন পুষ্পে কৃষ্ণে পূজা করে॥
গঙ্গাতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আরোপ করিয়া।
তিন পুষ্পাঞ্জলি গঙ্গায় দিল ভাসাইয়া॥
কৃষ্ণেচ্ছায় পুষ্পাঞ্জলি যায় দ্রুতগতি।
পূর্ব্বমতে শচীদেবীর অঙ্গে কৈল স্থিতি॥"

অনেকেই গঙ্গায় পূজা করিয়া থাকে, পূজার ফুল জলে ভাসাইয়াও দিয়া থাকে। কোন কোন ফুল স্রোতের বেগে ভাসিয়াও আইসে, আবার সরাইয়া দিলেই স্রোতে চলিয়া যায়। শচীও তাই মনে করিয়া ফুলগুলি স্রোতে সরাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহা পুনঃ পুনঃ আসিয়া শচীদেবীর গর্ভ স্পর্শ করিতে লাগিল।

শচী প্রথমতঃ বিস্মিতা হইলেন, মনে কিঞ্চিৎ ভয়ও হইল, কারণ তখন তাঁহার গর্ভাবস্থা ; তিনি কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া তাড়াতাড়ি তীরে উঠিলেন।

"তবে ঝাট তুলসী কুসুম ঠেলি ফেলি।
তীরে উঠে রাম নারায়ণ করি বলি ॥" ( অদ্বৈত প্রকাশ। )

এদিকে অঞ্জলির পুষ্প অনুসরণে আসিয়া অদ্বৈত দূর হইতে তাহা দেখিতেছেন আর আনন্দে ভাসিতেছেন।

অদ্বৈত বুঝিলেন যে, এই পবিত্র গর্ভেই তিনি অধিষ্ঠিত, যাঁহার উদ্দেশ্যে তিনি অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। অদ্বৈত মনে মনে গর্ভের বন্দনা করিয়া গৃহে গেলেন, কিন্তু গিয়াও তিষ্ঠিতে পারিলেন না। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে চলিলেন।

শচী জগন্নাথ উভয়েই অদ্বৈতের শিষ্য ছিলেন। গুরুকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। কিন্তু গুরুদেবের আজ কি বিপরীত ব্যবহার! যেন তিনি আজ প্রকৃতিস্থ নহেন। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সমাগতা শচীকে প্রদক্ষিণ করিলেন, করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে—

"অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সর্ব্ব গুণধাম।
ত্রিজগতে ধন্য তাঁর নাহিক উপাম ॥
দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সম্ভ্রমে।
বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে ॥
চরণের ধূলি লৈল মস্তক উপরে।
সম্ভ্রমে আচার্য্যে কৈল বিনয় বিস্তরে ॥
পদ প্রক্ষালনের জল দিল শচীদেবী।
শচী দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা অনুরাগী ॥
শচী প্রদক্ষিণ করি করে পরণাম।
চমকিতা শচীদেবী দেখিয়া বিধান ॥
জগন্নাথ সসন্দেহ, শচী সবিস্মিতা।
কি কর কি কর বোলে হৃদয়ে দুঃখিতা ॥"

কেবল তাহাই নহে, জগন্নাথ কেবল বিস্মিত নহেন—মর্ম্মে মর্ম্মে দুঃখিত ও বিষাদিত হইলেন, হইয়া বলিলেন—প্রভো, সংশয় দূর করুন;

"নহে কি চিন্তা! অগ্নিতে পোড়াইব দেহ।"

শচী জগন্নাথের এই সংশয় সত্বরেই দূর হইয়াছিল; কিন্তু তাহা এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে বক্তব্য নহে। বলা বাহুল্য যে, এই শচীগর্ভ সুধাসিন্ধুর প্রস্ফুট কমলই আমাদের কলিকলুষহারী দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

# শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী।

( ৪ )

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলধামে গমন করিলে প্রভুর ভক্তগণ গভীর দুঃখের সহিতই তাঁহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন, আর তাঁহার উদাসীন ভক্তগণের মধ্যে বক্রেশ্বর পণ্ডিত এইসময় কিছুদিনের জন্য দেবানন্দ পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন।

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গ-মাহাত্ম্যে এবং তাঁহার মহাভাবাপন্ন সাত্ত্বিক নৃত্যাদি দর্শনেই দেবানন্দের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়াছিল। তাই তিনি নিরতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। যাঁহার নিকট এক সময়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রেমক্রন্দন পরম বিরক্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাঁহার গৃহে এখন আর সঙ্কীর্ত্তন কলরবের নিবৃত্তি নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নৃত্যে বক্রেশ্বর প্রভু-ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই বক্রেশ্বরের অতুল নৃত্য দেখিয়াই দেবানন্দ মোহিত হইয়াছিলেন। বক্রেশ্বর নৃত্য করিতে উঠিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন এবং লোকের ভিড় সরাইয়া দিয়া নৃত্যের স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিতেন, আর বক্রেশ্বর যখন নৃত্য করিতে করিতে জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া যাইতেন তখন সেই তপ্তকাঞ্চনতুল্য দেহ সযত্নে আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়া বসিতেন। এখন আর দেবানন্দের প্রেমভক্তির সীমা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। শাস্ত্র যথার্থই বলিয়াছেন যে, সহস্র

বৎসর যোগাদি অভ্যাসে যাহা লাভ না হয় একবার সাধুসঙ্গ হইতে তাহা অনায়াসে লভ্য হইয়া থাকে। কারণ সাধুদের সংস্পর্শ হইতে কেমন আপনা আপনিই সাধুভাব নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিগণের দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। পাষণ্ডীগণের নীরস হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত করিয়া দিয়া আপন মহিমা প্রকটিত করাই যে তাঁহাদের কার্য্য। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গগুণে দেবানন্দের জীবনস্রোত কিরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মুখেই শ্রবণ করুন,—

"দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্তি-বশে।
রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেম-রসে॥
দেখিয়া তাহার প্রেমপুঞ্জ কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণুভক্তি ধর॥
দেবানন্দ পণ্ডিত পরম সুখীমনে।
অকৈতব প্রেমে তানে করেন সেবনে॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্রহস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ॥
আপনে করেন সব লোক একভিতে।
পড়িলে আপনে ধরি রাখেন কোলেতে॥
তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তিমনে।
আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে॥
তাঁর সঙ্গে থাকি তান দেখিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস॥
বৈষ্ণব সেবার ফল কহে যে পুরাণে।
তার সাক্ষী এইসব দেখ বিদ্যমানে॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান।
ভাগবত অধ্যাপনা বিনা নাহি আন॥
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ বিষয়।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয়॥
তথাপিও গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বর প্রসাদে সে কু-বুদ্ধি বিনাশ॥
কৃষ্ণ সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥"

তথাহি—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
নিসংশয়োস্তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥"
"এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
ভক্ত সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণপায়॥"

এই বক্রেশ্বরের সঙ্গলাভ করিয়াই দেবানন্দ পণ্ডিত বৈষ্ণব চূড়ামণি হইয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি বক্রেশ্বর প্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

বক্রেশ্বর প্রভু এইরূপে কিছুকাল দেবানন্দ পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান করিয়া

শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। ঘটনাটী আমরা একটু বিস্তারিত করিয়া বলিতেছি।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চারিজন সঙ্গীভক্ত লইয়া নীলাচলে গমন করিয়াছেন। এদিকে নবদ্বীপবাসী প্রভু-ভক্তগণের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখুন। তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে কিপ্রকার অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন তাহা বর্ণনাতীত। যাঁহারা "দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোরা চাঁদ না দেখিলে মরমে মরিয়া" যাইতেন, তাঁহাদের অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ব্রজগোপীগণের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলেও ব্রজ গোপীগণের প্রকাশ বক্রেশ্বর পণ্ডিতাদি প্রভুর মর্ম্মীভক্তগণের সেই প্রকার অবস্থাই হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপীদিগের পুনর্ম্মিলনের আশা দিয়া জীবিত রাখিয়া গিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গও তদ্রূপ ভক্তগণকে আশ্বাসিত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "কখনও বা তোমরা নীলাচলে গমন করিবে, কখনও বা আমি গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তোমাদিগকে দর্শন দিয়া যাইব।"

কতদিন হইল শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীধাম নবদ্বীপ আঁধার করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, ভক্তগণ আর প্রভুর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। মধ্যে প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া শ্রীল বিশ্বরূপের অনুসন্ধান উপলক্ষ্য করিয়া দক্ষিণদেশের জীব উদ্ধারের নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন। এখন ভক্তগণ শুনিলেন প্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণ শেষ করিয়া আবার নীলাচলচন্দ্ররূপে নীলাচলে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তখন তাঁহাদের উৎসাহ দেখে কে! সকলেই মহানন্দে শান্তিপুরে "গৌর আনা গোসাঞি" অদ্বৈতের নিকট চলিলেন। কারণ মহাপ্রভুর অভাবে এখন অদ্বৈতপ্রভুই প্রধান এবং ভক্তগণের কর্ত্তাস্বরূপ ছিলেন। তাই ভক্তগণ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট আপনাদের মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিতে চলিলেন।

ভক্তগণকে দেখিয়া আচার্য্যের চিত্ত মহানন্দে পূর্ণিত হইল এবং তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া কয়েক দিবস ধরিয়া মহামহোৎসব করিলেন। শেষে ভক্তগণকে লইয়া আচার্য্য প্রভু নীলাচলে যাওয়াই সাব্যস্থ করিলেন। ভক্তগণের আর আনন্দ ধরে না। যাত্রার দিন স্থির হইলে, আচার্য্য প্রভু ভক্তগণকে লইয়া নবদ্বীপে শচীমাতার নিকটে অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিদায় লইবার জন্য আসিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন।

ভক্তগণের সঙ্গে বক্রেশ্বরও চলিয়াছেন তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গে নাই কিন্তু তিনি তাঁহাকে দর্শনকরিতে যাইতেছেন এই আনন্দে তিনি নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন। নৃত্য যে মহানন্দের চিহ্ন।

ভক্তগণ ক্রমশঃ নীলাচলে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহাদের অকৈতবপ্রেম, সেইজন্য যতদিন তাঁহারা নীলাচলে ছিলেন ততদিন তাঁহারা আপন আপন স্ত্রী পুত্রাদির কথা বিস্মৃত হইয়া—অনুরাগে মাতিয়া তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিতে ছিলেন। কিন্তু প্রভু কাহাকেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতে দিলেন না, তিনি নিয়ম মত চারি মাস পরে গৃহী ভক্তগণকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন; উদাসীন ভক্তগণ আর গৃহে ফিরিলেন না। তাঁহারা সঙ্কল্প করিয়া আসিয়া ছিলেন যে, প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া প্রভুর সেবায় জীবন কাটাইয়া দিবেন। সুতরাং তাঁহারা প্রভুর নিত্য সঙ্গী হইয়া নীলাচলেই রহিয়া গেলেন। ঐ সকল উদাসীন মর্ম্মী ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবক্রেশ্বর একজন প্রধান ছিলেন। এই সমস্ত উদাসীন ভক্তগণের নাম আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানিতে পারি। যথা,—

"পরমানন্দ পুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন॥"

এই সকল বন্দনীয় শ্রীগৌরাঙ্গের পারিষদগণের মধ্যে আমরা শ্রীমৎ বক্রেশ্বরকে একজন প্রধান বলিলাম এই জন্য যে, তিনি মহাপ্রভুর সহিত গম্ভীরা গৃহে বাস করিতেন।

যে চারিমাস কাল নবদ্বীপবাসীগণ নীলাচলে অবস্থান করিতেন সেই সময় মহাপ্রভু মহাহর্ষে যে সমস্ত অনন্ত অপার লীলা করিতেন সে সমুদায় বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। তবে এ স্থলে আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্গত স্থূল স্থূল ঘটনা সমূহ ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতিদিন গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আরতির সময় শ্রীমন্দিরের সম্মুখে অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। গৌড়বাসী-গণ এজন্য দেশ হইতে মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি সঙ্গে আনিয়া ছিলেন। এই

অতুলনীয়, অভিনব এবং মনমাতান সঙ্কীর্তন দেখিয়া উড়িষ্যাবাসীগণ একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেই হইতে তাঁহাদের মধ্যেও সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার হইয়াছিল। ঐ সঙ্কীর্ত্তনদলের মধ্যে প্রধান নৃত্যকারী ছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত। মহাপ্রভু চারিটী দল প্রস্তুত করিয়া যথাক্রমে নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অদ্বৈত ও শ্রীবাসকে তাহার এক একটী দলের কর্ত্তা করিয়া দিতেন, এবং সাধারণতঃ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইলেই শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ চারিটীদলের চারিজন কর্ত্তাকে নাচিতে বলিতেন। তাঁহারা নাচিতে আরম্ভ করিলে কিঞ্চিৎ পরে প্রভু আর থাকিতে পারিতেন না, নিজে অতি নয়ন রসায়ন ও ভক্তি-উদ্দীপন নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিতেন। সে সময়ে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া এরূপ দ্রুত সকল সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেন যে, তাহাতে সকল সম্প্রদায়ই বোধ করিতেন যেন প্রভু আমাদের মধ্যেই নৃত্য করিতেছেন। শ্রীভগবানের কার্য্য যে, এইরূপই অদ্ভুত। তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের মনেই এইরূপ ধারণা জন্মে যে, তিনিই তাঁহার ঠাকুরের অতিশয় প্রিয় পাত্র। শ্রীবৃন্দাবন লীলায় রাসোৎসবের সময় গোপীকারা সকলেই ভাবিয়া ছিলেন যে, প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন।

প্রভু ভাবে বিভোর হইয়া যখন নৃত্য করিতেন তখন মধ্যে মধ্যে বক্রেশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিতেন।

রথযাত্রার সময়ই প্রভুর প্রকাশ্য নৃত্য উড়িষ্যাবাসীগণ একপ্রকার সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার নৃত্য দর্শন প্রায় কাহারও সৌভাগ্যে ঘটে নাই—সকলেই শুনিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপ নগরে শচীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এখন সন্ন্যাসীরূপে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। যাহার ভাগ্য আছে সে-ই দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকে কিন্তু আজ তিনি সর্ব্ব নয়ন গোচর হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে লোক বিমোহিত হইত, তাঁহার নৃত্য দর্শনে পাষণ্ডও বিগলিত হয়। সেই নবীন গৌরচন্দ্র আজ দিবাভাগে সর্ব্ব-জীব-সমক্ষে নৃত্য করিতেছেন, সেই নৃত্যে কঠিন জীবের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া নয়নদ্বয় হইতে ভক্তি-অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। সকলে আরও অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতেছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল॥
মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥

এক এক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোক জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
জজ্ জজ্ গগ গগ গদ্ গদ্ বচন॥
জল যন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশ্ পাশ্ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহ কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম

প্রভু কখনও কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইয়া শ্রীকর যুগল জুড়িয়া জগন্নাথকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন। কিন্তু এত কাঁপিতেছেন যে, ঠিকমত প্রণাম করিতেও পারিতেছেন না। আবার তাঁহার নৃত্য বর্ণনা করাও অসাধ্য ব্যাপার। কারণ সকল সময়ে তাঁহার নৃত্য একরূপ ছিল না। তাঁহার নৃত্য অনবরত নূতন নূতন আকার ধারণ করিত। কখন তিনি আনন্দিত হইয়া নাচিতেছেন তাঁহার সঙ্গীদেরও আনন্দ হইতেছে। মধুর নৃত্য করিতেছেন—সম্মুখে দেখিলেন বক্রেশ্বর। অমনি তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, শুধু আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না সাদরে মুখ চুম্বন করিলেন। আবার স্বরূপকে দেখিয়া এমন গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করিলেন যে, ভক্তগণ মনে করিলেন যেন তিনি স্বরূপের দেহে বিলীন হইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

ডাঃ শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

# ভক্তি—( রাগানুগা। )

ইতিপূর্ব্বে "শ্রীগৌরাঙ্গসেবক" পত্রিকার ১৩২৪ সালের বৈশাখ সংখ্যায় "ভক্তি" সম্বন্ধে কিছু অসম্পূর্ণ আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন আশা ছিল এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ আরও আলোচনা করিব। কিন্তু জানি না,—হয় ত কৃপাময় ভক্তগণের অনভিপ্রেত হওয়ায়—বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে সে আশা এতদিন দুরাশাই হইয়া ছিল। নিজের অনবসর ও শারিরীক অসুস্থতাও এই সকলের পরিপোষক হইয়াছিল। তার পর আবার ভক্তির আলোচনা করা যে সৌভাগ্য-সাপেক্ষ তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভক্তির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে উক্ত পত্রিকায় বলিয়াছি যে, অনুকূল অর্থাৎ রুচিকর ভাবে প্রীতিবিষয়াত্মকবোধে—মাধুর্য্যপূর্ণ লীলা দ্বারা চরাচর বিশ্বের

আকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিবার এবং তৎসম্বন্ধশূন্য যাবতীয় বিষয় সকল ত্যাগ করিবার যে শারিরীক, মানসিক এবং বাচিক চেষ্টা—তাহারই নাম ভক্তি। জীবের দুইটি ধর্ম্মের—সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের মধ্যে ভক্তিই বিশেষ ধর্ম্ম; শ্রীভগবান আছেন এবং জীবজগৎও আছে, এই দুইটি অস্তিত্বের মধ্যবর্ত্তী সম্বন্ধই সেই বিশেষ ধর্ম্ম বা ভক্তি। ভক্তির যে বৈধী এবং রাগানুগা নামক দুইটি বিভাগ আছে তন্মধ্যে বৈধী ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই অনেক কথা বলা হইয়াছে, এবং তাহার পরিশেষে ভাবানুযায়ী ভজন ক্রিয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম। আজ "ভক্তি" পত্রিকার ভিতর দিয়া সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এই চেষ্টা। বিলম্বজনিত অপরাধে আমি দুষ্ট, 'ভক্তি'-সেবক ভক্তগণ কৃপা করিয়া সে ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীভগবৎকথা শ্রবণাদিতে বিশ্বাসযুক্ত শ্রদ্ধার মধ্যেই ভক্তির প্রথম উদ্দীপন। তদনন্তর সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ও তৎপরে ভজন ক্রিয়ার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া শ্রীভগবৎ কথা কীর্ত্তন শ্রবণাদিতে বিশেষ রুচি জন্মে; অতঃপর শ্রীভগবানে আসক্তি, রতি বা ভাব এবং পরিশেষে প্রেমের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। ইহাই ভক্তিশাস্ত্রানুমোদিত প্রেম-পথ।

ভাবানুযায়ী ভজন বলিতে রাগানুগা ভক্তির সাধনই উপলক্ষিত হয়। শ্রীব্রজবাসীগণের প্রকাশ্য কৃষ্ণানুরাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা ভক্তি। পূর্ব্ব সুকৃতিফলে অথবা বর্তমান জীবনের সাধনাবলে শুদ্ধচিত্ত সাধকভক্ত ব্রজবাসীগণের ভক্তিভাব-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই ভাব-প্রাপ্তির লোভে শ্রীগুরুদেব নির্দ্দিষ্ট ব্রজবাসীগণের অনুগত হইয়া যে অনুরাগময়ী ভক্তির সাধন করিয়া থাকেন, তাহাই রাগানুগা ভক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উক্ত লোভই রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ। এই লোভের উৎপত্তি শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা করে না, ভাবমাধুর্য্যের আকর্ষণই ইহার কারণ। ইহাও নিষ্কাম-ভক্তিপর্য্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া সাধুগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কামানুগা এবং সম্বন্ধানুগা ভেদে ইহা প্রধানতঃ দ্বিবিধা। সম্ভোগেচ্ছা বা তত্তাবেচ্ছাময়ী ক্রীড়ামাত্র হেতুক অনির্ব্বচনীয় মাধুরীপ্রাপ্ত গোপীগণের বিশিষ্ট প্রেমের অনুগতা ভাবময়ী ভক্তিই কামানুগা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রেম হইতে মাধুর্য্যের বৈশিষ্ট্য হেতু এই অনির্ব্বচনীয় গোপী-প্রেমকে পণ্ডিতগণ 'কাম' আখ্যা দিয়াছেন, তদনুগা ভক্তিকেও

তাই কামানুগা বলা হইয়া থাকে। আর সম্বন্ধাভিমানযুক্ত শ্রীব্রজগোপ-গোপীগণের যে প্রেম, তদনুগতা বা তদ্ভাবেচ্ছাময়ী ভক্তিই সম্বন্ধানুগা বলিয়া কথিত হয়। রসভেদে এই সম্বন্ধানুগা ভক্তি প্রধান পাঁচটি ভাগে বিভক্ত, যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তা বা মধুর। পরে এই গুলির বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সুষ্ঠু রমণাভিলাষী শ্রীদ্বারকামহিষীগণের ভাবলুব্ধ ভক্ত বিধিমার্গ অনুসরণ পূর্ব্বক সেবাদি করিয়া থাকেন। বাৎসল্য সখ্যাদিভাবলুব্ধ ভক্তগণ শ্রীনন্দ-যশোদা-সুবলাদির ভাবানুগত হইয়া সেবাদি করিয়া থাকেন। আর শ্রীনন্দ-নন্দন-প্রেয়সীগণের শুদ্ধমাধুর্য্যময় ভাবলুব্ধ সাধকভক্তকে নিজ নিজ যুথেশ্বরীর অনুগামী হইয়া সেবাদি ভজন করতে হয়। সিদ্ধ প্রণালী অনুসারে যিনি যাঁহার অনুগামী তিনি তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তদীয় ভাবে শ্রীগোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের সেবাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই সিদ্ধ প্রণালী লীলাতত্ত্বের অন্তর্গত একাদশ ভাবে অনুরঞ্জিত। শ্রীগুরুদেব —যিনি নিজেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ পার্শ্ববর্ত্তিনী নবযৌবনা সখী বিশেষ, সাধক ভক্তকে তিনিই উহা শিক্ষা দিয়া থাকেন। উক্ত একাদশ ভাব এই, যথা—সম্বন্ধ, বয়স, নাম, রূপ, যুথপ্রবেশ, বেশ; আভরণ, বাসস্থান, সেবা, পরাকাষ্ঠা এবং পাল্যদাসীভাব।

ভজনাঙ্গগুলি সাধকের অধিকার ও ভাব অনুযায়ী চারি প্রধান বিভাগে বিভক্ত, যথা—ভাবময়, ভাবসম্বন্ধী, ভাবানুকূল এবং ভাবাবিরুদ্ধ। (ক) প্রাপ্তব্য ভাব হইতে অনতিরিক্ত দাস্য সখ্যাদি কয়েকটি ভাবময়-সাধন। (খ) ভাবগঠনের উপাদান স্বরূপ শ্রীগুরু পদাশ্রয় ও মন্ত্র জপাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের ও অভিলষিত তৎপ্রেয়সীগণের লীলা, গুণ, রূপ ও নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও পরিচর্য্যাদিই ভাবসম্বন্ধী-সাধন। (গ) একাদশী, জন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকব্রত, ভোগাদিত্যাগ এবং অশ্বথ তুলস্যাদির সম্মাননা প্রভৃতি ভাবানুকূল-সাধন। (ঘ) আর নামাক্ষর, তিলক ও মাল্যাদি ধারণ এবং প্রণামাদি ভাবের অবিরুদ্ধ বা উপকারক বলিয়া এই গুলিকে ভাবাবিরুদ্ধ সাধন বলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত স্মরণ, ধারণা, ধ্যান এবং অনুস্মৃতি প্রভৃতি রাগানুগা ভজনের বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া জানিবে। স্মরণ করিতে করিতে তন্মধ্যস্থ চিন্তাবিক্ষেপ সকল তিরোহিত হইয়া স্মরণের নৈরন্তর্য্য সিদ্ধ হইলে, সেই অবস্থার নাম

ধারণা; ধ্যেয় বস্তুর সর্ব্বাঙ্গ ভাবনাই ধ্যান; এবং ধ্যানে স্থিরতা সিদ্ধ হইলেই, তাহার অনুস্মৃতি আখ্যা হইয়া থাকে। সাধনের পরিপাকাবস্থায় এই অনুস্মৃতি সাধক ভক্তের সিদ্ধ ভাবকে পূর্ণ. পূর্ণতর এবং পূর্ণতম শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসে নিমজ্জিত করিয়া সাধককে মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ করিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং তদীয় ভক্তগণের করুণাই রাগানুগা ভক্তিলাভের কারণ হয়। রাগানুগা ভজন প্রেমলাভের সাক্ষাৎ পুষ্টিকারক হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে পুষ্টিমার্গ ভজনও বলিয়া থাকেন।

ভজন করিতে করিতে সাধকভক্তের ভাব যত পুষ্টিলাভ করিতে থাকে ততই ক্রমশঃ অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া নিষ্ঠাভক্তি এবং অভিলষিত লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে বিশেষ রুচি জন্মিয়া থাকে। এই অবস্থাই আসক্তি বা রতির পূর্ব্বাবস্থা; এই সময়ে সাধকের চিত্তস্নিগ্ধকারিণী ভাবময়ী মনোবৃত্তি ক্রমশঃ স্ফুটনোন্মুখী হইতে থাকে, এবং তাহাতে প্রীতির অঙ্কুর স্বরূপ কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ভক্তিশাস্ত্রে এই লক্ষণগুলির নিম্নোক্ত নাম কথিত হইয়াছে। যথা—

ক্ষান্তি (ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও চিত্তের যে অক্ষুব্ধভাব), অব্যর্থ কালত্ব (ভজনশূন্য বৃথা কাল যাপন না করা), বিরক্তি (শ্রীভগবৎ সম্বন্ধশূন্য বিষয়ে অরুচি), মানশূন্যতা (উৎকর্ষ সত্ত্বেও নিজের অমানিত্ব প্রকাশ), আশাবন্ধ (শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ় আশা), সমুৎকণ্ঠা (অভীষ্টলাভের জন্য গুরুতর লোভ), নামগানে সদারুচি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ গুণ-কথায় আসক্তি, বসতিস্থলে (অধিষ্ঠানক্ষেত্রে ও ধামাদিতে) প্রীতি প্রকাশ এবং বাসের অভিলাষ প্রভৃতি।

সাধনে অভিনিবেশ ব্যতীত কখন কখন শ্রীভগবৎ এবং ভাগবতগণের প্রসাদ হইতেও এই প্রকার ভাবাঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। কিন্তু বিশুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত অন্যত্র এই প্রকার ভাব লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও তাহা ভাগবতী-রতি-পদবাচ্য হইবে না। অনভিজ্ঞজনের নিকট উহাদিগের চমৎকারিত্ব বোধ হইলেও পণ্ডিতগণ তত্তৎস্থলে দৃষ্ট লক্ষণগুলিকে রতির আভাস মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভোগমোক্ষেচ্ছু কর্ম্মী-জ্ঞানীজনে প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস, ভক্তসঙ্গাদি হেতু অজ্ঞজনে ছায়া-রত্যাভাস দৃষ্ট হইয়া থাকে; এই রত্যাভাস স্থায়ী হয় না; তবে হরিপ্রিয় ভক্তগণের অনুগ্রহ

থাকিলে কখন কখন এই ভাবাভাসও ভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার শ্রীভগবদ্ভক্তজনের নিকট অপরাধ জন্মিলে প্রাপ্ত ভাবই ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে, হয়ত একেবারেই বিনষ্ট বা হীন জাতীয়তা প্রাপ্ত হয়। ইহার বহু বহু প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

এই রতির বা ভাবের গাঢ় অবস্থাই,—যখন অভীষ্টে অতিশয় মমতা-বোধ জন্মে,—সেই চিত্তস্নিগ্ধকারিণী গাঢ় রতিই 'প্রেম' আখ্যা পাইয়া থাকে। উহা দ্বিবিধ,—মহিম-জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল বা শুদ্ধ মাধুর্য্যময়। বিঘ্নাদির দ্বারা হ্রাস না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াই প্রেমের লক্ষণ। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় ইহার সংজ্ঞা করিয়াছেন,—

"সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

যে ভাববন্ধন ধ্বংসের কারণ সত্বেও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, তাহারই নাম প্রেম।

অন্তরঙ্গ ভজনাঙ্গগুলির নিরন্তর সেবন দ্বারা ভাব পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেই, তাহা 'ভাবোত্থ' প্রেম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। আর শ্রীভগবান নিজ সঙ্গ দানে যে ভাবকে পোষণ ও উৎকর্ষদান করেন তজ্জনিত প্রেমকে 'অতি-প্রসাদোত্থ' প্রেম কহে। ইহাই ভক্তের প্রতি ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। অতি প্রসাদ, এবং ইহা—এই প্রেম দানই স্বয়ং ভগবানের কার্য্য; ইহা সাধনসাপেক্ষ না হইতেও পারে। এই জগতে ভগবানের অসংখ্য অসংখ্য অবতার হইয়াছে, কিন্তু মাত্র দুইটি ক্ষেত্র ব্যতীত, কুত্রাপি এমন প্রেমদান লীলার অভিনয় হয় নাই। শ্রীধাম বৃন্দাবন এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ, এই দুই চিন্তামণি ক্ষেত্রই স্বয়ং ভগবানের অতিপ্রসাদোত্থ প্রেমদান লীলার দুই অভিনয় ক্ষেত্র। 'ভাবোত্থ' শুদ্ধ মাধুর্য্যময় প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ, কিন্তু এই 'অতিপ্রসাদোত্থ' কেবল প্রেম তাহা হইতেও গুরু; জগতের ভাষায় এই প্রেমের কোন উপযুক্ত বিশেষণ পাওয়া যায় নাই বা কেহ দেন নাই।

রাগানুগা ভক্তের এই কেবল প্রেমই প্রয়োজন বলিয়া নির্ণীত। তন্মধ্যে কামানুগাভক্ত 'অতিপ্রসাদোত্থ' প্রেম লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। বৈধী ভক্তির লেশাভাস মাত্রও থাকিলে এই কেবল প্রেম লাভ হয় না। এই কেবল প্রেমই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী, এবং শ্রীকৃষ্ণও কেবলমাত্র এই প্রেমেরই বশীভূত। শ্রীগুরুদেবের কৃপাশক্তিমন্ত ভক্তই এই কেবল প্রেমের উপলব্ধির অধিকারী।

প্রেমের ক্রমোৎকর্ষে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব এই কয়েক প্রকার বিলাস হইয়া থাকে। ভক্তবৃন্দের কৃপা হইলে ইহা-দিগের বিষয় পরে বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ ইহার পরেই আমরা ভক্তির রস বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। জয় ভক্তির জয়!

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

# অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম।

## ( ৫ )

প্রভু রামরায়ের নিকট বিদায় লইয়া তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছেন—দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। প্রভুর বিরহে রামরায়ের দিন আর কাটে না। তিনি প্রভুর আশায় আশায় আশাপথ চাহিয়া তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতেছেন। সহসা একটী আনন্দ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল প্রভু ফিরিয়া আসিতেছেন, সেই সুবর্ণ চম্পক কান্তি—অতি লোভনীয় অপূর্ব্ব নবীন সন্ন্যাসী ভুবন আলো করিয়া আবার বিদ্যানগরে ফিরিয়া আসিতেছেন। রামরায়ের বিরহীচিত্ত প্রিয়-সমাগম আশে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি সানন্দে সাগ্রহে প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রামরায়ের আশা বিফল হইল না, সত্য সত্যই প্রভু একদিন বিদ্যানগরে শুভ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল, মঙ্গল দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়া সমগ্র রাজধানীতে মঙ্গল বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া দিল। আর শ্রীল রামানন্দের আনন্দের কথা আর আমরা কি বর্ণনা করিব? তিনি বহুদিনের পর স্বীয় আরাধ্য দেবতার দর্শনলাভ করিয়া আনন্দাবেশে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তাঁহার পাদপদ্মে সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেলেন। প্রভুও বহুদিন পরে তাঁহার প্রিয়ভক্তকে বুকে তুলিয়া ধরিয়া প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন উভয়ের নয়নদ্বয় হইতে অবধ্য প্রেমবারি নির্গলিত হইয়া উভয়ের উরস প্লাবিত হইতে লাগিল। ভক্তির প্রিয় পাঠকগণ, মানস-নেত্রে এই মধুর মিলন-চিত্র দর্শন করুন, আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে সুস্থির হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাপ্রভু আপনার নিকট হইতে দুইখানি পুঁথি বাহির করিয়া রামানন্দকে বলিলেন— "আমি দক্ষিণাপথের তীর্থ সমুদায় ভ্রমণ করিয়া এই অমূল্যরত্ন সদৃশ গ্রন্থ দুইখানি আনিয়াছি।" গ্রন্থদুইখানি—"শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" ও "ব্রহ্মসংহিতা।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমার নিকট যে সমস্ত তত্ত্বকথা শুনিয়া গিয়াছি তাহারই নিদর্শন ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে।" শ্রীল রামরায় তখন পুঁথি দুইখানি আস্বাদন করিয়া দেখিলেন উহা একেবারে অমৃত। তখন আবার সেই অমৃত সাগরে তুফান উঠিল, উভয়ে কৃষ্ণ-কথা-সুধার্ণবে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। এইরূপে সাত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল।

তখন আবার মহাপ্রভুর বিদায় লইবার সময় আসিল। কিন্তু এবার আর তত বিষাদের নহে। কারণ যাত্রাকালে রামরায় শ্রীচরণে প্রণত হইয়া বলিলেন —"প্রভু আপনি অগ্রসর হউন, কয়েক দিবস পরে এ দাসও আপনার শ্রীচরণান্তিকে উপনীত হইবে। আমি মহারাজা প্রতাপরুদ্রকে আপনার কৃপা আদেশ জানাইয়া ছিলাম তিনি সানন্দে আমার বিষয় বন্ধন কাটাইয়া নীলাচলে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

প্রভু তাঁহার এই প্রিয় ভক্তকে এতই ভালবাসিয়াছিলেন যেন তিনি তাঁহাকে তাঁহার সহিত যাইবার জন্য আকাঙ্খা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রামানন্দ উড়িষ্যার রাজার মন্ত্রী, তিনি সাড়ম্বরে শ্রীক্ষেত্রে গমন করা উচিত বুঝিয়াছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার বিষয় কার্য্যের শৃঙ্খলা করিয়া গমন করিতেও দিনকতক বিলম্ব ছিল। তিনি যদি সাদাসিধা ভাবে বিনাড়ম্বরে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেন তবে সম্ভবতঃ মহারাজা প্রতাপরুদ্রের সম্ভ্রমের হানি হইত। তাই তিনি প্রভুকে অগ্রে গমন করিতে বলিলেন। আর প্রভু যে বলিয়াছিলেন,—"তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন।" ইহা তাঁহার রামরায়কে আর এক রকমে পরীক্ষা মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন, ভক্তগণ তাঁহার বিরহে মৃতবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভু যেদিন তাঁহার নীলাচলবাসী ভক্তগণকে কাঁদাইয়া দক্ষিণ দেশ পর্য্যটনে গমন করেন, কৃপাময় পাঠক! একবার সেই দিনের কথা স্মরণ করুন। প্রভু যাত্রা করিলে ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আলালনগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এইখানেই প্রভু তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান। নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, প্রভু চলিয়া গেলে সারা দিনরাত্রি তথায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর তাঁহারা মলিন মুখে

শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। গৌর-গরবে গরবিত ভক্তবৃন্দ ক্ষুন্ন চিত্তে কালক্ষেপ করিতেছিলেন এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ-সূর্য্যের উদয়ে তাহাদের দুঃখনিশার প্রভাত হইল।

প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া গমন করিলে তাঁহার মহিমা আরও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ এই কথা প্রচার হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীরূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন এক্ষণে তিনি সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তখন নীলাচলবাসীগণ দলে দলে আসিয়া শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের চরণে প্রার্থনা জানাইয়া গেল, মহাপ্রভুর সহিত তাঁহাদিগকে মিলন করাইয়া দিতে হইবে। এই প্রার্থনাকারীগণের মধ্যে স্বয়ং মহারাজা প্রতাপরুদ্রও একজন। প্রভুর কৃপা হইলে ৬৪ মোহান্তের অন্যতম শ্রীল প্রতাপরুদ্রের চারু চরিত্র আমরা পরে বর্ণনা করিব।

প্রভু নীলাচলে আসিলে সার্ব্বভৌম নীলাচলবাসী ভক্তগণের সহিত—যাঁহারা প্রভু দক্ষিণাপথে গমন করিলে ভক্ত হইয়াছিলেন—মহাপ্রভুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই সময় রামরায়ের পিতা ভবানন্দ রায়, তাঁহার চারিটী পুত্রের সহিত আসিয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন।

"হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥"

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের প্রমুখাৎ এই পরিচয় অবগত হইয়া ভাগ্যবান ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

"রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহিলে না হয়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তি।
পঞ্চপুত্র পাণ্ডব তোমার পাঁচ পুত্র মহামতি।"

যেমন রামানন্দ, তেমনি-ই তাঁহার পিতা ভবানন্দ রায়। তিনি মহাপ্রভুর এই প্রশংসাবাক্যে দীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিতান্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "আমি নিতান্ত হীন ব্যক্তি, আপনি নারায়ণ, আমাকে যে আপনি কৃপা করিয়া স্পর্শ করিলেন ইহা আপনার একান্ত দয়া, আমি আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি

এবং পুত্রাদি সহ আপনার অভয় চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম। আমাদিগকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করুন।

"রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি—এই ঈশ্বর লক্ষণ॥
নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চ পুত্র সনে।
আত্মসমর্পিনু আমি তোমার চরণে॥"

এই বাক্য ভবানন্দ রায়ের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিই বলিতে পারেন। তিনি স্বীয় পুত্র বাণীনাথকে প্রভুর নিকট পরিচারক রূপে নিযুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন—

"এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই হবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে॥"

এখন দেখুন ভবানন্দ রায় কিরূপ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। তাঁহারা অতি সম্ভ্রান্ত লোক এমন কি মহারাজা প্রতাপরুদ্রের নীচেই তাঁহাদের মান। তিনি স্বীয় স্নেহের সন্তান বাণীনাথকে মহাপ্রভুর ভৃত্যরূপে নিয়োজিত করিয়া দিলেন। আরও বলিয়া দিলেন প্রভু, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামানন্দ আপনার মিত্র বলিয়া ইহাকে কোন প্রকার আদেশ প্রদান করিতে আপনি কুণ্ঠিত হইবেন না। আপনার যখন যাহা আবশ্যক হইবে ইহাকে আদেশ করিবেন। অবতার শিরোমণি প্রভু অমনি বলিলেন,—

কি সঙ্কোচ? নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর॥"

রঙ্গিয়া প্রভু তাঁহার ভক্তের নিকট কেমন স্পষ্ট করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেন দেখুন। প্রভুর এই পরম উদার ও আশ্চর্য্য বাক্যে ভবানন্দ কত দূর যে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। প্রভু ভগবৎ আবেশে বলিলেন "ভবানন্দ, তুমি বাণীনাথকে আর নূতন করিয়া আমার পরিচারক নিযুক্ত করিয়া কি দিবে? তোমরা যে জন্মে জন্মে সবংশে আমার দাস।" প্রভুর বাক্যে আমরাও ভবানন্দ পরিবারের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারি। প্রভু আরও বলিলেন,—

"দিন পাঁচ সাত ভিতর আসিবে রামানন্দ।
তার সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥"

ইহার পর ভবানন্দ প্রভুর চরণে প্রণাম করিয়া বাণীনাথকে প্রভুর নিকট রাখিয়া অপর তিন পুত্রসহ স্বীয় ভবনে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক দিবস পরে রামানন্দ রায় নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন। মহারাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত রাজধানীতে গিয়া দেখা করিলে তিনিও তাঁহার সহিত নীলাচলে আসিলেন। রামানন্দ মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন,—

*  *  *  *

হেন কালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইল ॥
রামানন্দ রায় আইল গজপতি সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে ॥
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জন প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥
রায় সনে প্রভুর দেখি স্নেহ-ব্যবহার।
সব ভক্তগণ মনে হইল চমৎকার ॥"

রামরায় রাজকার্য্য করিতেছেন, তাহার উপর সেইরূপ পদোচিত আড়ম্বরের সহিত আসিয়াছেন এবং প্রভুর প্রতি রাজা আকৃষ্ট হইয়াছেন কিনা তাহা তিনি জানেন না, সুতরাং তিনি ব্যবহারিক কর্ত্তব্য বজায় রাখিয়া মহারাজের সহিত প্রথমেই সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন,—

"রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল ॥
আমি কহিনু আমা হৈতে না হয় বিষয়।
চৈতন্য চরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয় ॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হইতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥
তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশ।
মোর হাত ধরি কহে পীরিতি বিশেষ ॥

তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ ॥"

এইখানে মহারাজের প্রভুর প্রতি প্রেম-ভক্তির সীমা অনুভব করিতে পারিতেছি। তিনি লোকমুখে মহাপ্রভুর রূপ গুণের বার্ত্তা অবগত হইয়াই তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাই আজ রামরায়ের গৌর-প্রীতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—"বড় আনন্দের কথা যে, তুমি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিতে যাইতেছ, তোমাকে আর রাজকার্য্য করিতে হইবে না কিন্তু তোমার যে জমিদারী ছিল তাহা রহিল অধিকন্তু তুমি যে বেতন পাইতে তাহাও পাইবে—যাও তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীগৌরের সেবা কর।" এবং তিনি যে রাজা বলিয়া সেই প্রচ্ছন্নবেশী সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিবার অনুমতি পান নাই তজ্জন্য তাঁহার আর্ত্তি দেখুন,—

"আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জীবনে ॥
পরম কৃপালু তিঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবে দরশন ॥"

রামরায় যখন রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন তখন প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে একটী অভিলাষ জানাইয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া ছিলেন "আমি যাহাতে শ্রীচৈতন্য প্রভুর দর্শন লাভ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিবে।" রামরায় দেখিলেন রাজার শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি কি গভীর অনুরাগ! তাই তিনি মহাপ্রভুকে বলিলেন,—

"যে তাঁর প্রেম আর্ত্তি দেখিনু তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে ॥"

আর যাহাতে তিনি রাজাকে দর্শন দেন তজ্জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। ইহাতে সেই শঠচূড়ামণি কেমন উত্তর দিলেন দেখুন,—

"প্রভু কহে তুমি কৃষ্ণ ভকত প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সে-ই ভাগ্যবান ॥
তোমাতে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবেন অঙ্গীকার ॥"

প্রভুর বাক্যে আমরা মহারাজের ভাগ্যের সীমা ও প্রভু-ভক্ত রায় রামানন্দের যোগ্যতা-পটুতা বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারি।

ক্রমশঃ

ডাঃ শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

# আলোচনা।

বহুদিন হইতেই ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিব বলিয়া আশাছিল, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এতদিনে সে আশা পূর্ণ হইল। বর্ত্তমান বর্ষের এই প্রথম সংখ্যা হইতে ভক্তি প্রতিমাসে ৪ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশ হইবেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে ছাপাখানার প্রত্যেক জিনিষেরই অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, আমরা বাধ্য হইয়াই সে সময় ভক্তির মূল্য ৷৹ আনা বেশী করিয়াছিলাম। এক্ষণে যদিও কাগজাদির মূল্য কিছু কম হইয়াছে তথাপি পূর্ব্বের মত হয় নাই। এমতাবস্থায় আমরা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভক্তি দেবীর কলেবর কিছু বৃদ্ধি করিলাম। আমাদের একান্ত ভরসা আছে যে, ভক্তির পাঠকগণ নিশ্চয়ই যাহাতে দেবীর এই বর্দ্ধিত কলেবর স্থায়ী হয় তজ্জন্য চেষ্টার ক্রটি করিবেন না। বর্ত্তমানে ভক্তির যে সকল গ্রাহক আছেন তাঁহারা যদি প্রত্যেকে অন্ততঃ একজন করিয়াও নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন তাহাহইলেও আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়। আশাকরি স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, বৈষ্ণব জগতের কল্যাণকামী সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট আমাদিগের এ প্রার্থনা বিফল হইবে না।

* * * *

আর একটী বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে, বর্ত্তমানে আমরা পৃথক-পত্রাঙ্কে ভক্তির সহিত "পঞ্চগীতা" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এইটী শেষ হইলেই "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার" গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে পারিব। বলা বাহুল্য আমরা বহু পরিশ্রমে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। "পঞ্চগীতা" শেষ হইলেই আমরা উহা পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারিব।

* * * *

এবার ১৯এ আশ্বিন শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা, অনেক স্থলে এই পূজায় ছুটী ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত থাকে। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া ১২ই কার্ত্তিক হইয়াছে। "ভক্তি" মাসের প্রথমেই বাহির হয়, সে কারণ আমরা আশ্বিন মাসের প্রথমেই আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুই মাসের পত্রিকা একত্রে প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি। কেননা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে পত্রিকা বাহির হইলেও অনেক স্কুল কলেজ তখন বন্ধ থাকিবে, তজ্জন্য পত্রিকা পাইতে নানাপ্রকার গোলযোগ হইতে পারে।

"ভক্তি" কার্য্যাধ্যক্ষ।

# ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

[ ২৩শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩৩১ সাল" ]

## বিশ্বরূপের সঙ্গীত

( ২০ )

৩৫। (জয়) রাধানাথ রমণ রাধাকান্ত হরি ;
শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবন কুঞ্জ-বিহারী॥
(জয়) কাল কালিয়া খল দমন দুঃখহরণ,
কেশী-মথন শকটাসুর-মর্দ্দন,
শ্যাম-গোবর্দ্ধন গিরিবরধারী॥
অভিনব সুন্দর, বেণুবাদনপর,
মদন-মান-মনহারী ;—
(জয়) রাস-রসিক-রস রঙ্গিনীগণ পতি,
গোপীমোহন গোপবালক দলপতি,
ভূপতি নন্দ নন্দন বনয়ারী।
চির অকলঙ্ক, শশাঙ্ক শুভঙ্কর,
নট কিশোর গোঠচারী ;—
(জয়) কৃষ্ণ কৃপাল গোপাল গুণাকর,
গোকুলবীর বিবিধ রস তৎপর,
এ বিশ্বরূপ মনতাপ নিবারি॥

# হরিনাম

অন্ধ বধির চিরনিদ্রিত
জাগ জাগ সবে আজ,
প্রেমের নিমাই এসেছেরে আজ
এসেছেরে প্রেমরাজ।
ভক্ত-কাঙাল ভক্তের তরে
দ্বারে দ্বারে দেন নাম,
জাগরে সবাই, ভাঙ্গ মোহ ঘোর
কর কর নাম গান।

পাপের গভীর পঙ্কে ডুবে
কে কোথায় আছ আজ,
নিমাই দিতেছে লও সবে নাম
ফেলে দিয়ে শত কাজ।
পাপ দূরে যাবে, শীতল হইবে
কর সবে নাম গান,
প্রেমের সিন্ধু উথলি উঠিবে
কর নাম-সুধা পান।

কে কোথায় আছ এসরে ছুটিয়া
নিমাইএর পদতলে,
রোগ শোক তাপ দূরে চলে যাবে
লইবেন প্রভু কোলে।
বৈতরনীর পরপারে যেতে
রবেনাক' কোন ভয়,
নামের গুণেতে ভব-জলধিতে
ভাঙ্গা তরী পার হয়।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

# গয়ায় পিণ্ডদান-লীলা

গয়াশ্রাদ্ধের প্রবর্ত্তন কখন হইতে, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। তবে ত্রেতা-যুগে ভগবান রামচন্দ্রও যে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন তাহা নানা ভাবেই জানিতে পারা যায়।

পিতৃলোকের উদ্ধারার্থ বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান হিন্দুর একটি চিরন্তন রীতি ও পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম। লোক-শিক্ষা-গুরু শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বিষ্ণুপাদ-পদ্মে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতেই বলিতে গেলে পতিত মানব পতিত-পাবন গৌরচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছে। যে মূর্ত্তিতে তিনি নিখিল জীবের প্রতিনিধিরূপে—আদর্শ রূপে—ভগবানরূপে অর্চ্চিত, প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার পর হইতেই সেই মহামহিমান্বিতরূপে পতিত জীব তাঁহাকে পাইয়াছে।

ঈশ্বর সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্য সমন্বিত। ভগবান যখন নরদেহে নরসমাজে আবির্ভূত হন, তখন সেই ঐশ্বর্য্য গোপন করিয়া আসেন বটে; কিন্তু একটু অবকাশ পাইলেই তাহা আত্মপ্রকাশ করে। নরসমাজে যখন তিনি আগমন করেন, নরের প্রকৃতি—নরের স্বভাবই তখন অঙ্গীকার করেন এবং তাঁহাতে তখন তাহাই উদ্ভাসিত হয়। তিনি সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, ভাববিশেষের প্রাবল্যে নরের ন্যায়ই কখন কখন তাঁহাকে আত্মবিস্মৃতবৎ প্রতীয়মান হয় এবং সেই সময়েই অবসর পাইয়া সময়োপ-যোগী ঐশ্বর্য্য তখন প্রকাশমান হইয়া উঠে। দৃষ্টতঃ তাহাতে সেই লীলা-পুরুষোত্তমের অজ্ঞাতেই যেন অনেক কাষ হইয়া যায়। এই জন্যই পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"লীলাবেশে নাহি থাকে নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥"

যে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে হরিনাম শুনিয়া শ্রোতা উন্মত্ত ও ঐ নাম উচ্চারণমাত্রে না জানি কি শক্তিতে তড়িদ্বেগে যেন বিভোর হইয়া পড়িত, স্থূল দ্রব্যের ন্যায় যিনি প্রেমভক্তি যাকে তাকে, যখন তখন

বিলাইতেন, তাঁহার গয়া গমনের পূর্ব্বে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। সত্যবটে, তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে, তথা শ্রীহট্টে গমন করেন, তখন পদ্মাতীরে হরিনামের তরঙ্গ তুলেন; সত্যবটে, তখন তিনি হরিনামের নৌকা সাজাইয়া অন্ধ আতুর পার করিয়াছিলেন। সত্য বটে,—

"কথো দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেরে গমন।
যাহা যায় তাহা লওয়ায় নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"—চৈঃ চঃ।

কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া সে ভাব সঙ্গোপন করিয়াছিলেন। আবার গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে তাঁহার যে ভাবোদয় হয়, উহা তাঁহাকে একেবারে অকূলে লইয়া গিয়াছিল, তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই; তিনি আর সে ভাব পুনঃ পুনঃ চেষ্টাতেও গোপন করিতে পারেন নাই। সেই অপরূপ ভুবনমোহন সোণার পুরুষের—

* * *
"বিষ্ণুপদ হ'ল যবে নয়নপথ পুণ্য,
ঢলিয়া পড়িল প্রেমে।
যে পদ পরশে অহল্যার বিমোচন,
জাহ্নবী যে পদে জাতা;
শিব শুক নারদাদি লুব্ধ যেই পদে,
যে পদ ধেয়ায় ধাতা।
সেই পুণ্য পদে ভক্তি, নহে অদ্ভুত;
কিন্তু কি যে অলৌকিক!
বহিল নয়নজল—মন্দাকিনী ধারা,
আপ্লাবিত চতুর্দ্দিক!
বিস্মিত মানব-নেত্র, হেরিল সম্মুখে
কি মূর্ত্তি মহিমাময়।"
( লেখক কৃত শান্তিলতা কাব্য।)

বিস্মিত-নেত্রে পাণ্ডাগণ আরো দেখিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদত্ত পিণ্ড—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!—বিষ্ণুপদে পতিত হইতেছে না! যেন কি একমন্ত্র শক্তিকৌশলে অলক্ষিতে আসিয়া গৌরাঙ্গচরণে নিপতিত হইতেছে! পিণ্ড যেন পরোক্ষ হইতে—স্বাভাবিক রীতিতেই—প্রত্যক্ষে আকর্ষিত হইতেছে!! চৈতন্যসঙ্গীতা গ্রন্থে যথা:—

"পদচিহ্ন স্থানে পিণ্ড করিলেন দান।
তাহা নাহি রহে পিণ্ড—দেখি বিদ্যমান,
আসিয়া পড়িল পিণ্ড গৌরাঙ্গ চরণে;
চমৎকার দেখি, সবে।"

কিন্তু কেবল তাহাই নহে,—এইরূপে যখন পিণ্ডদান সিদ্ধ হইল—সুসার্থক

হইল, তখন আর এক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল; কাহারও কাহারও চক্ষে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত হইল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, যেন জগন্নাথ মিশ্র তৈজস দেহে উপস্থিত হইয়া পুত্রদত্ত পিণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন! গৌরপার্ষদ মুরারি গুপ্ত ইহা লিখিয়াছেন, যথা :—

"......চকার পিণ্ডং পিতৃকর্ম্ম পূর্ব্বকম্।
শ্রীমজ্জগন্নাথ পুরন্দরাখ্যঃ
প্রত্যক্ষীভূয় জগৃহে মুদান্বিতঃ।"

দ্রষ্টাদের তখন সেইকথা মনে হইল, ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্রের প্রদত্ত পিণ্ড দশরথ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর আনন্দে তাঁহাদের হৃদয় ভরিয়া গেল, নয়নে প্রেমজল বহিতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন, ইনি অন্য কেহ নহেন—স্বয়ং শ্রীরাম। তাঁহারা গৌরাঙ্গচরণে প্রণত হইলেন এবং চিরতরে তাঁহারা মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গেলেন। শ্রীমুরারিগুপ্ত লিখিয়াছেন :—

যথা রামেণ হি দত্তপিণ্ডং
গৃহীত আগম্য তদীয় পিত্রা।
এবং হি সর্ব্বত্র হরেশ্চরিত্রং
তথাপি দুষ্প্রাপ্যতমং যদেতৎ॥"

কিন্তু এত যে কাণ্ড হইতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গের সে জ্ঞান নাই; তিনি বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে অতলস্পর্শ ভক্তিসাগরে নিপতিত হইয়াছেন—ভাবোর্ম্মি তাঁহাকে কোন্ অজানা রাজ্যে লইয়া গিয়াছে, তিনি তাহা জানিতেই পারেন নাই। এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল।

এই অবস্থায় সঙ্গিগণ তাঁহাকে কোনপ্রকারে লইয়া নবদ্বীপে আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার এ ভাব ভাঙ্গিল না—উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। এই জন্যই বলিতেছিলাম যে, গয়াগমনের পর হইতেই পতিত জীব তাঁহাকে পাইয়াছে। গয়াগমনের পরেই তিনি পতিতের জন্য ক্রন্দন করিয়াছিলেন; গয়াগমনের পরেই তিনি পতিতের পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং গয়াধামেই প্রত্তপ্ত নরগণ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

# শ্রীল ঠাকুর কবিচন্দ্র ভট্ট *

বৈষ্ণব-গ্রন্থ সমূহে "কবিচন্দ্র" নামীয় ৪।৫ জন ভক্তের উল্লেখ আছে। উক্ত "কবিচন্দ্র" শব্দটী কতিপয় ভক্ত কবির উপাধি হইলেও আবার জনৈক ভক্তের নামও যে কবিচন্দ্র ছিল বৈষ্ণব সাহিত্য অনুসন্ধানে তাহাও বেশ স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায়। (১)

সাহিত্য পরিষদ মন্দিরের প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির তালিকা পুস্তকে কেবল "কবিচন্দ্রের" রচিত বা ভণিতাযুক্ত অর্দ্ধশতেরও অধিক প্রাচীন বাংলা পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে হয়তো ঐ নাম সংশ্লিষ্ট আরও কত পুঁথির সংবাদ পাওয়া যাইবে। কিন্তু আবিষ্কৃত গ্রন্থগুলির কোনখানিতেই গ্রন্থকারের বিশেষ কিছু পরিচয় নাই। তবে সকল গুলিই ভক্তি-গ্রন্থ। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ যে কবিচন্দ্র উপাধিধারী একজন ভক্তের তাহা

---

* এই প্রবন্ধটী সংশোধনের জন্য প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ঐতিহাসিক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়কে প্রেরণ করিলে, তিনি ১৮ই ফাল্গুন ১৩৩০ বঙ্গাব্দ তারিখের কৃপাপত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"* * প্রাপ্ত মাত্রেই আপনার প্রবন্ধটী পাঠ করিলাম। আপনি কত যে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধটী দেখিলেই বুঝা যায়। কবিচন্দ্র ঠাকুর সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, এতাধিক বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। এবং তদর্থে আপনার প্রবন্ধটী অতি মূল্যবান ও উপাদেয় হইয়াছে সন্দেহ নাই।

"এক সময়ে আমিও এইরূপই পার্ষদপরিচয় জন্য অনুসন্ধান করিতে ভাল বাসিতাম, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে তাহারই অনেকটা স্থান লাভ করিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক করিয়াছিল। ইদানীং একমাত্র আপনিই ঠিক সেই প্রণালীতে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ইহাতে আমি যে কত আনন্দ লাভ করি, তাহা আর কি বলিব? রোগে, শোকে আমি শক্তি সামর্থ্য হীন, তাই পারিয়া উঠি না, তদবস্থায় আপনিই তাহা পূরণ করিতেছেন। "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকে" আপনার অনুসন্ধিৎসার পরিচয় সর্ব্বদাই পাইতেছি ও আনন্দলাভ করিতেছি।" দীন---শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

(১) পূর্ব্বে শাক্ত এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গ্রন্থকারগণের কবীন্দ্র, কবিচন্দ্র, কবিরাজ, কবিবল্লভ, কবিরঞ্জন, কবিকঙ্কন, কবিশেখর প্রভৃতি উপাধির ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনে হয় না; অধিকন্তু শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয়-সম্প্রদায়েরই বহু "কবিচন্দ্র" নামীয় ভক্তগণের দ্বারা যে উক্ত গ্রন্থ সকল লিখিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, ইহা একেবারে সুনিশ্চিত। (১)

এস্থলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লিখিত কবিচন্দ্রগণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে চারিজন "কবিচন্দ্র" উপাধি বিশিষ্ট ভক্তের বিবরণ দৃষ্ট হয়। যথা;—

১। রামদাস কবিচন্দ্র, ২। যদুনাথ কবিচন্দ্র, ৩। বনমালী কবিচন্দ্র এবং ৪র্থ সংখ্যক "কবিচন্দ্র" নামক ভক্ত। ইঁহাকে অনেকে 'কবিচন্দ্র ঠাকুর বা 'ঠাকুর কবিচন্দ্র' এবং 'কবিচন্দ্র ভট্ট' নামে অভিহিত করিয়াছেন। (২)

(১) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩০৪ বঙ্গাব্দ ৪র্থ সংখ্যায় পুথির তালিকায়—

(ক) কণ্বমুনির পারণাগ্রন্থে "শঙ্কর কবিচন্দ্র" ভণিতা আছে।

(খ) কোকিল সংবাদ গ্রন্থে "দ্বিজ কবিচন্দ্র" আছে।

(গ) মহাভারত গদাপর্ব্বের অনুবাদে, 'চক্রবর্ত্তী কবিচন্দ্র' আছে।

(ঘ) অধিকন্তু ভাগবতামৃত গ্রন্থে আছে,—

"চক্রবর্ত্তী মুনিরাম, অশেষ গুণের ধাম,
তস্য পুত্র কবিচন্দ্রে গায়।"

(ঙ) মহাভারত দ্রোণ পর্ব্বে আছে,

"শ্রীযুক্ত গোপাল সিংহ নৃপতির আদেশে।
সংক্ষেপে ভারত কথা কবিচন্দ্রে ভাগে॥"

এই গোপাল সিংহ বনবিষ্ণুপুরের রাজা বা বীরহাম্বিরের বংশধর বলিয়া মনে করিবার অনেক কারণ আছে।

(চ) আর একখানি গ্রন্থে আছে,---

"কবিচন্দ্র বীজভনে ভাবি রমাপতি।
মেদ্রর দক্ষিণে যর পাণ্ড্যায় বসতি॥"

এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য মেদ্রর ও পাণ্ড্য কোথায়?

(২) হইতে পারে ৪র্থ সংখ্যক ঠাকুর কবিচন্দ্রের অন্য কোন নাম ছিল এবং "কবিচন্দ্র" ইঁহারও উপাধি ছিল,

( কবি, চন্দ্র-ঠাকুর, বা কবি, চন্দ্র-ভট্ট নামও হইতে পারে )

কিন্তু তাহা হইলেও ইনি "কবিচন্দ্র" আখ্যাতে এমত প্রসিদ্ধ ছিলেন যে, সাধারণে ইঁহার আর স্বতন্ত্র নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। "কবিচন্দ্র" বলিলেই একমাত্র এই ঠাকুর কবিচন্দ্রকেই বুঝাইত। বর্ত্তমানে "বিদ্যাসাগর" বলিলে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বুঝায়, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বা অন্য কোন বিদ্যাসাগর উপাধিধারী পণ্ডিতকে বুঝায় না, তদ্রূপ।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত "বৈষ্ণব-বন্দনায়" ( অতুল প্রভুর সং ৬ পৃঃ)

"জগন্নাথ কবিচন্দ্র, প্রেম রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয় ॥"

ইত্যাদি লিখিত আছে। এখানে পয়ারের ভাবে "জগন্নাথ" এবং "কবিচন্দ্র" নাম দুইজন ভক্তকে বুঝায় না, জগন্নাথেরই উপাধি "কবিচন্দ্র" বুঝায়। যদি তাহা হয় তবে আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত চারিজন "কবিচন্দ্রের" স্থানে পাঁচ জন হইতেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় লিপিকারের ভ্রম বশতঃই "যদুনাথ কবিচন্দ্র" স্থানে "জগন্নাথ কবিচন্দ্র" লিখিত হইয়াছে। একথা মনে করিবারও বিশেষ কারণ আছে। "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" প্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এবং "বৈষ্ণব-বন্দনাকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি। বিশেষতঃ "শ্রীচৈতন্য ভাগবতের" অংশগুলিই অবিকলভাবে "বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এজন্য উহাকে আর ভিন্ন গ্রন্থ বলা যায় না। "শ্রীচৈতন্য ভাগবতের" উপরোক্ত পয়ারে কিন্তু "জগন্নাথ" নাম নাই" "যদুনাথই" লিখিত আছে। যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্তলীলা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ( অতুল প্রভুর সংস্করণ ৪৭৪ পৃষ্ঠা )

"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয় ॥"

আরও শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্য খণ্ডে ১ম অঃ ১৫ পৃঃ উক্ত যদুনাথ কবিচন্দ্রের এইরূপ সংক্ষেপে পরিচয়ও পাওয়া যায়,—

* * *

"এক মহা ভাগ্যবান আছে বিপ্রবরে ॥
রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম এক গ্রাম ॥
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণ পদ মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব,-যদুনাথ কবিচন্দ্র ॥"

ইহার দ্বারা জানা গেল, যদুনাথ কবিচন্দ্র শ্রীহট্ট বাসী, এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বন্ধুবর শ্রীল রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্রত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র। ( বলা বাহুল্য উপরি উক্ত "জীব" শ্রীল জীব গোস্বামী নহেন। ) অমুদ্রিত "বৃহৎ বৈষ্ণব-চরিত অভিধানে" জানা যায় যদুনাথ কবিচন্দ্রের পূর্ব্বে

( এক মতে ) শ্রীহট্ট জেলার বুরঙ্গ গ্রামে ( এবং অন্য মতে ) শ্রীহট্টের ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে নিবাস ছিল, তথা হইতে কুলীন গ্রামে শ্রীপাট হয়। ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক। উক্ত গ্রন্থে যদুনাথ ও যদুনন্দন নামে ১৩ জন ভক্তের উল্লেখ আছে। (১)

এইবার আমরা যে যে স্থানে "কবিচন্দ্রের" নাম পাইয়াছি তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

১। শ্রীল বৃন্দাবন দাস কৃত "বৈষ্ণব বন্দনায়" ;—

( ইনি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হইতে ভিন্ন বৈষ্ণব বন্দনাকার। ) তিন জন কবিচন্দ্রের বন্দনা বা নাম আছে। যথা ;—

*প্রথম, ( ক ) রামদাস কবিচন্দ্র, লেখক বিজয়ানন্দ। ইহার পর, ( খ ) বন্দিব বালক রামদাস, কবিচন্দ্র।*

এখানে উপরের রামদাস কবিচন্দ্র এবং বালক রামদাস দুই জন ভিন্ন ভক্ত। (২)

শেষে আছে ( গ ) যদু কবিচন্দ্র বন্দ সুখের সাগর।

(২) দৈবকী নন্দন কৃত "বৈষ্ণব বন্দনাতেও" তিনজন কবিচন্দ্রের ( অর্থাৎ রামদাস কবিচন্দ্র, যদুনাথ কবিচন্দ্র ও কবিচন্দ্র ঠাকুরের ) নাম পাওয়া যায়, (৩) যথা ,—

(১) তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, বুরঙ্গা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রপিতামহের স্থান, তদীয় পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্র ঢাকা দক্ষিণ বাসী হন, এই স্থানেই জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। রত্নগর্ভ আচার্য্যের জন্মস্থান ও জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান একই স্থান, কাজেই রত্নগর্ভ যে ঢাকা-দক্ষিণ নিবাসী ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(২) প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ঐতিহাসিক শ্রীল অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধে আছে ,—

"বটতলার ছাপার গ্রন্থে ( বৈষ্ণববন্দনায় ) আছে

"কবিচন্দ্র, মুকুন্দ, বন্দি বালক রামনাথ।"

কিন্তু হস্ত লিখিত ( কোন কোন ) গ্রন্থে আছে "কবিচন্দ্র, মুকুন্দ বন্দ বালক যার সাথ।" এখানে হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথির পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নিতাইগণ সব প্রেম পাগল, আর বালকদের ভাল বাসিতেন এবং মিশিতেন ও অধিক।" [ বিষ্ণুপ্রিয়া ৩৪৪ পৃষ্ঠা ১৭বর্ষ ৮ম সং ৪১২ গৌঃ অঃ ভাদ্র ]

(৩) রামদাস কবিচন্দ্র সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থে কেবল নাম ভিন্ন আর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "বৃহৎ বৈষ্ণব চরিতাভিধানে" ১২জন রামদাস নামে ভক্তের উল্লেখ

(ক) পরমানন্দ গুপ্তবন্দ, সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র, মুকুন্দ, বালক রাম সাথ॥

পরে (খ) বন্দ রামদাস কবিচন্দ্র মহাশয়।

শেষে (গ) সর্ব্ব সুখ বন্দ যদু কবিচন্দ্র। লিখিত আছে।

(৩) শ্রীনরহরি দাস বিরচিত "স্বপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনায়" অন্য কোন কবিচন্দ্রের নাম নাই, কেবল ঠাকুর কবিচন্দ্রেরই নাম আছে। যথা :—

"গোবিন্দ, গরুড়, কবিচন্দ্র, কাশীশ্বর"
মো অধমে কর নিজ দাসের কিঙ্কর॥"

( ৪ ) "নরোত্তম বিলাস" গ্রন্থেও কেবল ঠাকুর কবিচন্দ্রের নাম আছে। যথা ;—

কবিচন্দ্র, কীর্ত্তনীয়া ষষ্টিবর আদি।

( ৫ ) সর্ব্ব সিদ্ধান্তসার শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে ৪জন কবিচন্দ্রেরই নাম আছে, অধিকন্তু কে কোন্ প্রভুর গণ বা শাখা তাহাও জানা যায় যথা :—

শ্রীচৈতন্য শাখাতে—( আদি ১০ পঃ )

(ক) কবিচন্দ্র, আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্টিবর।

(খ) রামদাস কবিচন্দ্র, শ্রীগোপালদাস।

শ্রীনিত্যানন্দ শাখাতে—( আদি ১১ পঃ )

(গ) মহা ভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।

শ্রীঅদ্বৈত শাখাতে—( আদি ১২ পঃ )

(ঘ) বনমালী কবিচন্দ্র, আর বৈদ্যনাথ।

তাহা হইলে আমাদের বর্ণিত কবিচন্দ্র ঠাকুর ও রামদাস কবি চন্দ্র ২জনে শ্রীচৈতন্য শাখা বা তাঁহার পারিষদ, যদুনাথ কবিচন্দ্র শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ; এবং বনমালী কবিচন্দ্র শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শাখা বা পারিষদ হইতেছেন।

---

আছে। তন্মধ্যে কবি বল্লভ উপাধি বিশিষ্ট জনৈক রামদাস আছেন, 'কর্ণানন্দ' মতে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে তাঁহার শ্রীপাট।

বনমালী কবিচন্দ্র সম্বন্ধেও ঐরূপ নাম ভিন্ন অন্য কোন সংবাদ নাই। উক্ত অভিধানে ৩জন বনমালী নামক ভক্তের উল্লেখ আছে। ( শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং দেবকী নন্দন কৃত বৈষ্ণব বন্দনা ভিন্ন আর কোথাও ইহার নাম পাই নাই। )

(৬) দৈবকীনন্দন কৃত সংস্কৃত সংক্ষিপ্ত "বৈষ্ণব অভিধানেও" উক্ত চারি জনের নাম দৃষ্ট হয়। যথা—( অতুল প্রভুর সংস্করণে )।

(ক) কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ শ্রীরাম সেন বল্লবঃ।

(খ) (গ) কবিচন্দ্রো রামদাস বনমালী হলাযুধঃ॥

এখানে রামদাস ও বনমালী দুই জনেরই কবিচন্দ্র আখ্যা বুঝাইতেছে। পরে ;—

(ঘ) যদুনাথ কবিচন্দ্র পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয়ঃ॥ আছে।

(৭) শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দাস বাবাজী কৃত "শ্রীবৈষ্ণব স্মরণীয় চিত্রাবলীতেও—

(ক) কবিচন্দ্র ঠাকুর (খ) বনমালী কবিচন্দ্র (গ) যদুনাথ কবিচন্দ্র (ঘ) রামদাস কবিচন্দ্র। এই চারি জনের নাম আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্য তিন জনের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক্ষণে ঠাকুর কবিচন্দ্র সম্বন্ধে যে যৎসামান্য পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

(৮) অনন্ত সংহিতাতে উক্ত ঠাকুর কবিচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় ৬৪ জন মহান্তের মধ্যে একজন মহান্ত বলিয়া লিখিত আছে। যথা :—

অনন্ত সংহিতা ( সপ্তপঞ্চাশোত্তম অঃ) শব্দকল্পদ্রুমধৃত বচনে,—

সিংহানন্দো লোকনাথঃ কবিচন্দ্রস্ততঃ পরম্।
শ্রীনাথো রামনাথশ্চ চত্বারঃ সনকাদয়॥

* * * *

এতে গোপ্যো ব্রজে খ্যাত হৃদয়ানন্দ এব চ।
ত্রিয়াশ্চতুঃ ষষ্টিরেতে ধর্ম্ম সংস্থাপনে কলৌ॥

(৯) বৃহৎ ভক্তিতত্ত্ব সার ( ২য় খণ্ডে ধৃত ১৭২ পৃঃ ) "ভোগমালা" বিবরণে ৬৪ জন মহান্তের কাহার কোথায় স্থান বা আসন, তাহার নির্ণয়ে দুইজন কবিচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। প্রথম কবিচন্দ্র ঠাকুর, দ্বিতীয় কবিচন্দ্র আচার্য্য। এই দ্বিতীয় কবিচন্দ্র আচার্য্য যে শ্রীচরিতামৃতের লিখিত চারিজন কবিচন্দ্র ব্যতিরেকে অন্য কোন কবিচন্দ্র হইবেন তাহা আদৌ মনে হয় না, অধিকন্তু আচার্য্য উপাধি দৃষ্টে পূর্ব্বোক্ত শ্রীচৈতন্য ভাগবতের শ্রীল রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শাখার যদুনাথ কবিচন্দ্র বলিয়াই মনে হয়। তাহা হইলে ৬৪ মহান্তের অন্তর্গত দুইজন কবিচন্দ্র হইলেন।

উক্ত গ্রন্থে ঠাকুর কবিচন্দ্রের আসন শ্রীল গোবিন্দ ঘোষের অষ্ট পরিকর

মধ্যে এবং আচার্য্য কবিচন্দ্রের আসন শ্রীল বাসুদেব ঘোষের অষ্ট পরিকর মধ্যে নির্ণিত আছে। যথা :—

( ক ) যিনি শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, তিনি ব্রজলীলায় অষ্ট সখীর অন্যতমা শ্রীমতী রঙ্গদেবী। ইহার অষ্ট পরিকরের বা যুথের নাম।

| গৌরলীলায় যে যে পার্ষদ, | ব্রজলীলায় যে যে সখী |
|---|---|
| ১। কাশীমিশ্র | কলকণ্ঠী। |
| ২। শিখি মাহাতি | শশিকলা। |
| ৩। কালিদাস | কমলা। |
| ৪। শ্রীমান ঠাকুর | মধুরা। |
| ৫। কবিচন্দ্র ঠাকুর | ইন্দিরা। |
| ৬। হিরণ্যগর্ভ | কন্দর্পসুন্দরী। |
| ৭। জগন্নাথ সেন | কামলতিকা। |
| ৮। দ্বিজ পীতাম্বর | প্রেমমঞ্জুরী। |

( খ ) শ্রীগৌরপার্ষদ বাসুদেব ঘোষ ব্রজলীলায় সুদেবী সখী। ইহার অষ্ট যুথ এই,—(১)

| গৌর লীলায় নাম— | ব্রজলীলায় নাম— |
|---|---|
| ১। রাঘব পণ্ডিত | ১। কাবেরী (?) |
| ২। মুরারি চৈতন্য দাস | ২। সুচারু কবরী। |
| ৩। মকরধ্বজ | ৩। সুকেশি। |
| ৪। কংসারী সেন | ৪। মুঞ্জকেশী। |
| ৫। জীব পণ্ডিত | ৫। হারহীরা। |
| ৬। মুকুন্দ কবিরাজ | ৬। মহাহীরা। |
| ৭। ছোট হরিদাস | ৭। হারকণ্ঠী। |
| ৮। কবিচন্দ্র | ৮। মনোহরা। |

(১) বৈষ্ণব আচার দর্পণে (২য় ৩৬৩পৃঃ) বাসুদেব ঘোষ বা সুদেবীর পূর্ব্ব লীলার পরিচয়ে আছে -

রঙ্গদেবী ও সুদেবী দুই সহোদরা ভগ্নী। উভয়ের বর্ণ ও আকার একরূপই এজন্ত অনেক সময়ে সুদেবীকে রঙ্গদেবী বলিয়া ভ্রম হয়। আরও সুদেবীর বর্ণ পীত স্বর্ণবর্ণ নবীন বয়স, যাবট গ্রামে বাস, বসন্ত সুখদা কুঞ্জে দ্বিতিকলহান্তরিতা

(১০) বৈষ্ণব আচার দর্পণের ৬৪ মহান্তের বর্ণনে একজন কবিচন্দ্রের নাম আছে ( ১ম ভাগ ৩৬৪ পৃঃ ) যথা :—

(ক) "ইন্দিরা বলিয়া সখী পূর্ব্বে যেহ হন।
কবিচন্দ্র ঠাকুর এবে জানিহ কারণ॥"

আবার ঐ গ্রন্থে অপর কবিচন্দ্রকে সুদেবীর যুথে ৩২ জন উপমহান্ত মধ্যে ধরা হইয়াছে। যথা :—( ৩৪২ পৃঃ )

(খ) "মনোহরা সখী কবিচন্দ্র মহামতী।
চৈতন্যের শাখা যার আকনায় স্থিতি॥"

(১১) শ্রীচৈতন্য সঙ্গীতা গ্রন্থে ( দ্বিজ ভগীরথ বন্ধু কৃত ৩২ পৃঃ ) ৬৪ মহান্তের বর্ণনে দুই জনেরই নাম আছে। যথা—

(ক) চতুঃষষ্টি ব্রজাঙ্গনা চৌষট্টি মহান্ত।
করিব সবার নাম পূর্ব্বা চ (?) পরন্ত॥

*                *                *                *

গুণ চুড়া প্রবোধানন্দ সরস্বতী।
বরাঙ্গণা কবিচন্দ্র ভট্ট মহামতী॥

ইহার পরে পুনরায় আছে ;—

(খ) "শ্রীমধুকেন্দ্রিয়া কবিচন্দ্রাচার্য্য হয়।"

"মধুরেন্দ্রিয়া" ( মধুরা ও ইন্দিরা ) শব্দের স্থানে লিপিকারের ভ্রমে "মধুকেন্দ্রিয়া" যে হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। অধিকন্তু আচার্য্য শব্দ থাকায় ইনি পূর্ব্বোক্ত রত্নগর্ভাচার্য্যের পুত্র বলিয়াই মনে হয়।

(১২) ক্ষীরচোরা শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দির হইতে শ্রীল বিনোদ চৈতন্য বাবাজী কৃত "চিড়াদধি মহোৎসবের মানচিত্রে" ৬৪ জন মহান্তের আসনে এইরূপ আছে ;—

(ক) ৭ম শ্রীগোবিন্দ ঘোষের পার্ষদগণের পঙ্কত পূর্ব্বাভিমুখে ইহার মধ্যে কাশীমিশ্র ও দ্বিজপীতাম্বর প্রভৃতি অষ্ট জনের মধ্যে পাঁচ সংখ্যক কবিচন্দ্র ঠাকুরের আসন। আবার—

ভাব, কাম প্রধরা, হরিবর্ণ বায়ুকোণে জল সেবায় রতি। বক্রেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। ভাসুরের নাম ভৈরব। ইত্যাদি ( এগুলি ভক্তগণের উচ্চ সাধন রাজ্যের স্মরণ মননের বিষয় " আমরা ইহা বুঝিবার সম্পূর্ণ অনধিকারী।)

(খ) ৮নং শ্রীবাসুদেব ঘোষের পার্ষদগণের পক্ষত পূর্ব্বাভিমুখে ইহার মধ্যে শ্রীরাম পণ্ডিত প্রভৃতি অষ্ট জনের অষ্ট সংখ্যা শ্রীকবিচন্দ্র আচার্য্যের আসন আছে।

(১৩) বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ৪২৮ গৌঃ অঃ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ;—( ভাবার্থ )

শ্রীপাট পাণিহাটীর ( শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক "দণ্ড মহোৎসব" হইতেই মালসাভোগ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। ভক্তগণের যথাযোগ্য স্থানে আসন ও ভোজ্য দ্রব্য না রাখিলে অপরাধ হয়, এইজন্য প্রাচীন পুঁথি হইতে উক্ত পত্রিকায় ভক্তগণের যে স্থান নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা এই ;—

(ক) ৬৪ মহান্ত মধ্যে রামানন্দ বসুর পার্ষদগণের বামপার্শ্বে গোবিন্দ ঘোষের অষ্ট পার্ষদ, তন্মধ্যে কবিচন্দ্র ঠাকুরের স্থান।

(খ) আবার, ঠিক ইহারই বাম ভাগে বাসুদেব ঘোষের অষ্ট পার্ষদের স্থান ও তন্মধ্যে কবিচন্দ্র আচার্য্যের স্থান লিখিত আছে।

(১৪) শ্রীযুক্ত ললিতদাস ঘোষের "গৌরগণোদ্দেশ" প্রবন্ধে ( বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার ) ( রঙ্গদেবী ) গোবিন্দ ঘোষের গণে কন্দর্প কবিচন্দ্র ঠাকুর এবং ( সুদেবী ) বাসুদেব ঘোষের গণে মনোহরা কবিচন্দ্র আচার্য্য লিখিত আছে।

অন্যত্রে আছে ;—"মনোহরা কবিচন্দ্র শ্রীপাট আকনা।"

(১৫) শ্রীল ব্রজনাথ দাসের "ভোগ চিত্রে" ৬৪ মহান্তের মধ্যে ঠাকুর কবিচন্দ্রের ( ইন্দিরা সখীর ) নাম আছে, কিন্তু ঐ ৬৪ মহান্তের মনোহরা সখীকে কবিচন্দ্র না লিখিয়া ভ্রমক্রমে "কবিকঙ্কণ" চক্রবর্ত্তী লিখিত হইয়াছে।

বিশেষ কথা শ্রীগৌর পার্ষদগণের শ্রীবৃন্দাবন লীলার স্বরূপ নির্ণয় বিষয়ে সকল গ্রন্থে একমত দেখা যায় না এজন্য ঠাকুর কবিচন্দ্রেরও ব্রজের অংশ লইয়া মতানৈক্য আছে। যথা,—

(ক) বৈষ্ণব আচার দর্পণ মতে—কবিচন্দ্র ঠাকুর ও কবিচন্দ্র আচার্য্য যথাক্রমে ব্রজের ইন্দিরা ও মনোহরা সখী। (১)

(খ) শ্রীচৈতন্য সঙ্গীতা মতে কবিচন্দ্র ঠাকুর বরাঙ্গনা সখী। (২)

---

(১) আবার ঐ বৈষ্ণব আচার দর্পণের একস্থানে ( ৩৪২পৃঃ ) ইন্দিরা সখীকে জীব পণ্ডিত বলা হইয়াছে। যথা..."ইন্দিরা যে সখী জীব পণ্ডিত সম্প্রতি॥"

(২) শ্রীচৈতন্য সংগীতা মতে বরাঙ্গনা কবিচন্দ্র কিন্তু বৈষ্ণব আচার দর্পণের এক মতে ( ৩৬১পৃঃ ) বরাঙ্গনা সখী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। যথা ;—

(গ) পুনশ্চঃ বৈষ্ণব আচার দর্পণ গ্রন্থেঃ—ভিন্ন মতে কবিচন্দ্রকে ব্রহ্মার পুত্র সনন্দ বলিয়া লিখিত আছে। যথা :—

সনক, সনৎকুমার, সনন্দ, সনাতন।
চারি সহোদর কহি ব্রহ্মার নন্দন ॥
সনক জানিবে এবে যেই লোকনাথ।
সনন্দ জানিবে কবিচন্দ্র হৈয়া সাথ ॥
সনৎকুমার রামদাস মহাশয়।
সনাতন শ্রীনাথ এবে কহিলু নিশ্চয় ॥

(ঘ) অনন্ত সংহিতাতে যে ঐ মত অর্থাৎ কবিচন্দ্র ঠাকুর ব্রহ্মার পুত্র সনন্দ, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

(ঙ) কিন্তু গৌর গণোদ্দেশ মতে তাহা নহে। যথা ;—১০৭ শ্লোকে ;—

"কাশীনাথো লোকনাথঃ শ্রীনাথো রামনাথকঃ।
চত্বারোঽমী জ্ঞানিভক্তাঃ সনকাদ্যা ন সংশয় ॥"

(চ) ভক্তমাল গ্রন্থে ইহার ঠিক অনুবাদ আছে ;—

সনকাদি চতুঃসন চারি নামে খ্যাত।
কাশীনাথ, রামনাথ, শ্রীনাথ, লোকনাথ ॥

তাহা হইলে কবিচন্দ্র স্থানে এখানে কাশীনাথ হইতেছেন।

(ছ) গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায় ( ১৭১ শ্লোকে ) মনোহরা সখীই শ্রীগৌর লীলায় কবিচন্দ্র নাম ধরিয়াছেন বলিয়া লিখিত আছে, যথা—

---

বরাঙ্গনা বলিনাম ছিল পূর্ব্বকালে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নাম কহিতালে ॥

আবার ঐ গ্রন্থের অন্তত্রে ( ৩৪০পৃঃ ) বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে মধুরেক্ষণা সখী বলা হইয়াছে যথা ;-

মধুরেক্ষণা বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
বাস নবদ্বীপে চৈতন্যের শাখা বর্য্য ॥

ইত্যাদি বহুই অনৈক্য মত দেখা যায়।

আবার শ্রীচৈতন্য পার্ষদগণের স্বরূপ বিচারে কাহার কাহারও একাধিক ব্রজ পরিকরের ভাব লক্ষিত হয়, তদবস্থায় বলভদ্রে বরাঙ্গনা ও মধুরেক্ষণা উভয়েরই সাযুজ্য থাকা অসম্ভব নহে। উদাহরণ বহু আছে, যথা---হরিদাস ব্রহ্মা এবং প্রহ্লাদ, রামানন্দ বিশাখা এবং অর্জ্জুন ইত্যাদি।

বলভদ্রাখ্যাকো ভট্টাচার্য্যঃ শ্রীমধুরেক্ষণা।
শ্রীনাথ মিশ্রশ্চিত্রাঙ্গী কবিচন্দ্রো মনোহরাঃ॥

(গ) ভক্তমাল গ্রন্থেও ঐ কথা ;—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমধুরেক্ষণা।
চিত্রাঙ্গী শ্রীনাথ মিশ্র শিষ্ট মহামনা॥
কবিচন্দ্র যেঁহ তেঁহ মনোহরা সখী॥

এখানে গৌরগণোদ্দেশ ও ভক্তমালের কেবল "কবিচন্দ্র" শব্দের দ্বারা ঠাকুর কবিচন্দ্রকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের লিখিত ইন্দিরা কবি-চন্দ্রের উল্লেখ না থাকায় কারণ সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশকার শ্রীল কবিকর্ণপূরের লিখিত মন্তব্যের অনুবাদ পাঠ করিলেই জানা যায় ,—

* * * *

*সহস্র সহস্র গোপী চৈতন্য পার্ষদ।*
অসংখ্য গণন করিবারে না পারিয়া।
কিঞ্চিৎ কহিল নিজ পবিত্র লাগিয়া॥

এক্ষণে ইন্দিরা, মনোহরা, বরাঙ্গনা, সনন্দ এই চারি আখ্যা পূর্ব্বোক্ত চারিজন কবিচন্দ্রের হইতেও পারে কিন্তু ইহার সঠিক মীমাংসা করা লীলা-রাজ্যে প্রবিষ্ট ভক্ত ভিন্ন মাদৃশ অধম অযোগ্য ব্যক্তির ক্ষমতা বা অধিকার নাই। তবে এস্থলে গৌরভক্তগণের শ্রীবৃন্দাবন লীলার স্বরূপ নির্ণায়ক কবিকর্ণপুর কৃত প্রাচীন (১৪৯৮ শকে রচিত) গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

তাহা হইলে সমুদয় উদ্ধৃত অংশগুলির দ্বারা ঠাকুর কবিচন্দ্র সম্বন্ধে জানা গেল ;—

(ক) শ্রীগৌরলীলায় কবিচন্দ্র উপাধি বিশিষ্ট ভক্ত চারিজন ছিলেন। তন্মধ্যে তিন জনের কেবলমাত্র উপাধিই ছিল কবিচন্দ্র। নাম পৃথক পৃথক ছিল, আর অবশিষ্ট একজনের নাম ছিল কবিচন্দ্র, তার উপাধি ছিল ঠাকুর ও ভট্ট; এবং ঐ কবিচন্দ্র ঠাকুর শ্রীচৈতন্য দেবের শাখা বা শিষ্য। এবং ৬৪ জন মহান্তের একজন মহান্ত। (৬৪ মহান্তের মধ্যে ঠাকুর কবিচন্দ্র এবং আচার্য্য কবিচন্দ্র এই দুই জনের মধ্যে ইনি প্রথমোক্ত ঠাকুর কবিচন্দ্র)

(খ) শ্রীবৃন্দাবন লীলায় (গণোদ্দেশ মতে) ইনি মনোহরা সখী, এবং

সুন্দবী বা শ্রীল বাসুদেব ঘোষের যূথ। ৬৪ মহান্ত মধ্যে ঐ যূথের অষ্ট সংখ্যায় ইহার স্থান বা আসন।

(গ) বৈষ্ণব আচার দর্পণ ও অন্যান্য গ্রন্থ মতে আকনা গ্রামে ইহার শ্রীপাট। (১)

মনোহরা সখী কবিচন্দ্র মহামতী।
চৈতন্যের শাখা যাঁর আকনায় বসতি॥

(ঘ) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য সংগীতায় "কবিচন্দ্র ভট্ট মহামতী" পয়ারের দ্বারা ইনি ভট্ট বা ভাট্ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

সীতানাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত ( ১৩১৮ সালে ৬৩৭ নং শ্যামবাজার হইতে ) শ্রীচৈতন্য সংগীতা গ্রন্থে এ বিষয়ে স্পষ্ট ভাবে ভাট্ শব্দ আছে। যথা,—

"বরাঙ্গনা কবিচন্দ্র ভাট্ মহামতী।"

শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকায়ও ( ১৩৩০। বৈশাখ ২১৯ পৃঃ ) শ্রীল কবিচন্দ্র ঠাকুর শ্রীচৈতন্য দেবের শাখা এবং তিনি ভাট্ বা ভট্ট ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি লিখিত আছে। ইহার দ্বারা তাঁহার বংশ পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া গেল। (*)

---

(১) বৈষ্ণব ঐতিহাসিক ভক্তবর স্বর্গীয় হারাধন দত্ত মহোদয়ের লিখিত প্রবন্ধে বর্দ্ধমানের চতুর্দ্দিকে যে সমুদয় পদকর্ত্তা বা গ্রন্থকার গৌরভক্তের বাস ছিল তাহার তালিকায় লেখা আছে—

"আকিনায় পদকর্ত্তা শ্রীকবিচন্দ্র ছিলেন।"

( বিষ্ণুপ্রিয়া ৭বঃ ৯সং ৪১৩পৃঃ )

আমরা অকিনা ও আকনা এক মনে করি। ললিতদাস ঘোষের প্রবন্ধেও আছে, পূর্ব্বেও উদ্ধৃত করিয়াছি

"মনহরা কবিচন্দ্র শ্রীপাট আকনা"।

* (ক) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রিয়তম ভক্ত প্রহ্লাদাবতার সুবিখ্যাত ব্রহ্মহরিদাস বা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে কেহ কেহ ভট্ট ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ও জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের মুখবন্ধে ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন। ভট্ট ব্রাহ্মণ গণের একটী আখ্যা "ব্রহ্মভট্ট।" কিন্তু ব্রহ্ম হরিদাসের ব্রহ্ম আখ্যার ভিন্নরূপ বিবরণ বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে।

(ঙ) ঠাকুর কবিচন্দ্র ভট্ট গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন, তাহার উপর হারাধন দত্তের প্রবন্ধ দ্বারা তিনি যে পদকর্ত্তা ছিলেন তাহাও জানা গেল।

(চ) তাহার পরে ইহার আবির্ভাব কাল নির্ণয়েরও একটী সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

শ্রীপাট খেতুরি গ্রামে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বিরাট মহোৎসবে তৎকালীয় প্রাচীন সমুদয় ভক্ত মহান্তগণেরই আবাহন হইয়াছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থ মতে ঐ মহামহোৎসব ১৫০৪ শকাব্দে সমাধা হয়। উক্ত উৎসবে কবিচন্দ্র ঠাকুরেরও উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ;—
নরোত্তম বিলাসে ;—

---

শ্রীচৈতন্য সঙ্গীতী গ্রন্থে ৬৪ মহান্তের বর্ণনে অনেক ভট্ট ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ভক্তের নাম আছে যথা—

"বঙ্গবাটী শ্রীজগদীশ্বর ভট্ট রায়।"

ইনি যশোড়ার জগদীশ পণ্ডিত নহেন।

খ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে শ্রীল বাঞ্ছারামভট্ট নামক জনৈক ভট্ট ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ভক্তের বিষয় জানা যায়। ইনি অগ্রদ্বীপের শ্রীশ্রীগোপীনাথ বন্দনা প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচয়িতা॥

গ। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত কর্ণাট রাজার রাজ মন্ত্রী ভক্তপ্রবর শ্রীল মল্ল ভট্টের কথোপকথন হয় উক্ত মল্লভট্টও ভট্ট ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব।

ঘ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ বিবাহের সময়ে যে ভাগ্যবান ভাট্ ব্রাহ্মণ প্রভুর কুল পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে তাঁহার নাম শ্রীল বেতাল সিংহ বলিয়া জানা যায়।

ঙ। যাঁহাকে হিন্দি সাহিত্য গগনের সূর্য্য স্বরূপ বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে যিনি একাধারে বঙ্গের ভক্ত জয়দেব ও বিল্বমঙ্গল যাঁহার সুমধুর সঙ্গীত লহরীতে ভারত-বর্ষ মোহিত সেই স্বামী সুরদাস ভট্ট ভট্টব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাকেও প্রকারান্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। কারণ ইনি বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠল নাথের অষ্ট ছাপের একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত। বল্লভাচার্য্য যে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে মস্তক বিক্রীত করিয়াছিলেন তাহা বৈষ্ণব গ্রন্থে বিশেষ ভাবেই জানা যায়।

চ। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট ভক্তের নাম পাওয়া যায় তাঁহারা ভট্ট ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন। ইঁহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমানে মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করেন এবং গুরু ব্যবসায়ী।

এইরূপ অন্বেষণ করিলে বিস্তর ভট্ট ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ভক্তের পরিচয় জানা যাইতে পারে।

কবিচন্দ্র, কীর্ত্তনীয়া ষষ্টিবর আদি।
ভুঞ্জে এক বাসায় সে শোভা নিরবধি॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্ম ১৪০৭ শকে এবং তিরোভাব ১৪৫৫ শকে। ৬৪ মহান্তের সকলেই যে মহাপ্রভুর সমসাময়িক তাহা সুনিশ্চিত। এজন্য অনুমান হয় ঠাকুর কবিচন্দ্র ভট্ট দীর্ঘজীবী ছিলেন, তবে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া ধারণা হয়। (১)

এই যৎসামান্য পরিচয় ভিন্ন ঠাকুর কবিচন্দ্র ভট্টের আর কোন পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই।

তবে ইনি যে ধর্ম্ম-রাজ্যের কত উচ্চ স্তরে ছিলেন তাহা "ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের ৬৪ মহান্তের একজন" এই একমাত্র বর্ণনাতেই বেশ বুঝা যায়। আর কোন বিশেষণের আবশ্যক হয় না।

এই সব মহাত্মাদের জীবনী না পাইবার একটী বিশেষ কারণ বৈষ্ণব গ্রন্থে জানা যায়;—অভিমানশূন্য তৃণাদপি সুনীচ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ নিজেদের কাহিনী বিবৃত করাকে আদৌ ভালবাসিতেন না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থ রচিত হইবার সময়ে বহু ভক্ত কাহিনী এমন কি নিজেদের নাম পর্য্যন্ত

(১) পূর্ব্বোক্ত আকনা গ্রাম হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর মহকুমায় ই, আই, আর শ্রীরামপুর ষ্টেসনের নিকটেই। (আর কোথাও কবিচন্দ্র ঠাকুরের শ্রীপাট আকনা গ্রাম আছে বলিয়া জানা যায় না।)

বর্ত্তমানে উহাকে বল্লবপুর আকনা গ্রাম বলে। গ্রামটী গঙ্গার উপরেই। শ্রীরামপুর জলের কল হওয়ায় উহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। অনেক বাস উঠিয়া গিয়াছে। এই স্থানে একটী প্রাচীন ভগ্ন মন্দির গর্ভমেণ্ট হইতে রক্ষিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। উহাই বল্লবপুরের শ্রীল রুদ্র পণ্ডিতের শ্রীবিগ্রহ রাধাবল্লবজীর পুরাতন মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই স্থানের চতুর্দ্দিকেই গৌরভক্তগণের শ্রীপাট। যথাঃ---বল্লবপুর শ্রীল রুদ্র পণ্ডিত ও শঙ্করারণ্য, মুকুন্দ প্রভৃতির। চাতরায় শ্রীল কাশীশ্বরের। মাহেশে দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল শ্রীল কমলাকর পিপলায়ের পাট। আবার গঙ্গাদেবীর ঠিক পর পারেই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলাক্ষেত্র শ্রীপাট খড়দহ, ইহার দক্ষিণে প্রসিদ্ধ শ্রীপাট পানিহাটী গ্রামে রাম পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীপাট এবং ইহার চতুর্দ্দিকে দাস গদাধর, গোবিন্দ দত্ত, মধু পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীপাট দৃষ্ট হয়।

বিশেষতঃ আকনা গ্রামের অতি নিকটে রিষড়া গ্রামে অদ্যাপিও কয়েক ঘর ভট্ট ব্রাহ্মণের বাস আছে। উহারা ভক্তবরের বংশধর কিনা তাহা অনুসন্ধানে জানা যাইতে পারে।

তদ্গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করিতে গ্রন্থকারকে নিষেধ করিয়া ছিলেন। নাম, যশঃ, প্রতিষ্ঠার উপর ইহাদের এতই ভয় বা ঘৃণা ছিল। এই সব কারণেই যে কত মহা মহা ভক্তের জীবনী আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই।

এক্ষণে বৈষ্ণব ঐতিহাসিক বা ভক্ত-চরিত লেখকগণের নিকট বিশেষতঃ যদি কবিচন্দ্র ভট্টের কেহ বংশধর থাকেন তবে আমাদের অনুরোধ কৃপা করিয়া, তাঁহার বংশাবলী, ও প্রচলিত কিম্বদন্তি এবং তাঁহার স্মৃতি চিহ্নাদি বা শ্রীবিগ্রহাদির বিবরণ'গুলি জ্ঞাত করাইলে বা কোন বৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশ করিলে আমরা আনন্দ ও আগ্রহের সহিত আমাদের সংগৃহীত শ্রীগৌড় মণ্ডলের ইতিবৃত্ত বা বৃহৎ বৈষ্ণব অভিধানে মুদ্রিত করিব।

"প্রবাসী" পত্রিকায় ১৩৩০ পৌষ সংখ্যায় ৪০০ পৃঃ একটী প্রবন্ধ মধ্যে শ্রীল কবিচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহাদির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল আমাদের মনে হয় উহা ঠাকুর কবিচন্দ্র ভট্টের নহে। ৬৪ মহান্তের আচার্য্য কবিচ'ন্দ্রর বা অন্য কোন কবিচন্দ্র ভক্তের বিবরণ হইবে। বর্ণনাটী এই ;—

১৫৩৫ খৃঃঅব্দে ৬৪ মহান্তের অন্যতম শ্রীল কবিচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় নবদ্বীপের সন্নিকটে স্বদীয় শ্রীপাটে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

কালক্রমে তাঁহার বংশধরগণ দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণের অত্যাচার হইতে ঐ বিগ্রহ রক্ষা করিবার জন্য নৌকা-পথে পলায়ন করিয়া রাজসাহী জেলার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পাবনা জেলার তপ্‌সেবাড়ী নামক গ্রামে কিছু কাল বাস করেন।

অতঃপর নাটোর রাজ-দরবার হইতে পাবনাজেলার অন্তর্গত স্থল গ্রামে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি লাভ করিয়া ঐ গ্রামে আসিয়া বিগ্রহ সহ স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। সেও প্রায় ২৫০ বৎসরের কথা।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ পাকড়াসী মহাশয় ঐ শ্রীবিগ্রহের জন্য একটী বৃহৎ পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রকট অবস্থায় নির্ম্মিত উক্ত শ্রীমূর্ত্তি প্রধান প্রধান বৈষ্ণব মাত্রেই দেখিতে আসেন। দোল পূর্ণিমার দিনে ঐ স্থানে মেলা হয়। ৬।৭ হাজার লোক সমাগম হইয়া থাকে।" ইত্যাদি। ঐ সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের ফটো চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬৪ মহান্তের মধ্যে প্রথম কবিচন্দ্র ভট্ট ব্যতিরেকে দ্বিতীয় উপাধি উক্ত

কবিচন্দ্র ঠাকুরের বিবরণ জানিবার জন্য আমরা স্থল গ্রামের হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভায় সম্পাদক ভক্তবর শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন কবিভূষণ মহাশয়কে পত্র দিয়া ছিলাম তাহাতে তিনি এবং উক্ত কবিচন্দ্র ঠাকুরের বংশধর শ্রীল প্রফুল্লচন্দ্র অধিকারী কাব্যতীর্থ মহাশয় আমাদের ( ২রা চৈত্র ১৩৩০ ) তারিখের পত্র দ্বারা যাহা জ্ঞাপন করেন তাহাতে জানিতে পারি—

"এই দ্বিতীয় কবিচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় বঙ্গজ কায়স্থ। ইঁহার বংশধরগণ শ্রীগদাধর প্রভুর পরিবার; এবং ইঁহার শ্রীপাট কালনাতে ছিল। ইঁহার পৌত্র লক্ষীকান্ত ঠাকুর পাবনা জেলার তপ্‌সেবাড়ী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পরে ২।৩ পুরুষের পর বংশধর শ্যামদাস ঠাকুর পাবনা জেলার অন্তর্গত সহজাতপুর থানার এলাকাধীন গোহাই বাড়ী ( স্থল ) গ্রামে আসিয়া বাস করেন, সেই অবধি কবিচন্দ্র ঠাকুরের বংশধরগণ উক্ত গ্রামেরই অধিবাসী হইয়া আসিতেছেন। নাটোরের মহারাজার প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি ইঁহাদের আছে। বর্ত্তমান শ্রীপাটে প্রাচীন কোন কাগজ-পত্রাদি নাই। পুনঃ পুনঃ গৃহ-দাহে সমুদয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতেই ইহারা শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন যে, উক্ত কবিচন্দ্র ঠাকুর ৬৪ মহান্তের একজন। বংশধরগণের উপাধি "অধিকারী।" কবিচন্দ্র ঠাকুর হইতে লক্ষীকান্ত ঠাকুরের পর তিনপুরুষের নাম অজ্ঞাত, তৎপরে শ্যামদাস ঠাকুর হইতে নিম্নে আট পুরুষের বংশ তালিকা ইহাদের আছে এবং এই বংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়া ১৮ খণ্ডে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে একটী ধারা দিতেছি ;—

শ্রীকবিচন্দ্র ঠাকুর ( বঙ্গজ কায়স্থ )
|
মাধব ঠাকুর
|
লক্ষীকান্ত ঠাকুর
|
তিন পুরুষ অজ্ঞাত,
|
শ্যামদাস ঠাকুর
|
বিষ্ণু — কৃষ্ণ

বিষ্ণু
|
কানুরাম
|
রাধাকান্ত — শ্রীকৃষ্ণ — হরেকৃষ্ণ — বনমালী

কৃষ্ণ
|
যদু
|
ঈশ্বর

পূর্ব্বে বলিয়াছি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় পুঁথির তালিকায় ৫০।৬০ খানি "কবিচন্দ্র" ভণিতাযুক্ত পুঁথির বিবরণ আছে। উহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়েরও অনেক গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

পরম মাননীয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় নিম্নলিখিত কবিচন্দ্র ভণিতাযুক্ত গ্রন্থ গুলিকে বৈষ্ণব গ্রন্থের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। (শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক ১২ বর্ষ দশম ও দ্বাদশ সংখ্যা ৫১১ পৃঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ তালিকায়)

| | গ্রন্থের নাম | ভণিতা | পয়ার সংখ্যা | নকলের তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১। | অক্রুরাগমন | কবিচন্দ্র | ১৫০ | |
| ২। | অজামিল উপাখ্যান | ঐ | | ১০৮৭ সাল নিমাইচন্দ্র পাল দ্বারা |
| ৩। | একাদশী ব্রত পালন | ঐ | | ১০৮৭ সাল ৭ই পৌষ |
| ৪। | কোকিল সংবাদ | ঐ | | ১২৬৬। ২২ জ্যৈষ্ঠ |
| ৫। | কৃষ্ণ স্বর্গারোহণ | ঐ | ১২৫ | ১০৮৫। ১৮ বৈশাখ |
| ৬। | দশম পুরাণ | ঐ | ৫০০ | |
| ৭। | দিবারাস | ঐ | ১৮০ | |
| ৮। | নন্দ বিদায় | ঐ | ১৪১ | |
| ৯। | রাধিকা মঙ্গল | ঐ | ২৩০ | ১০৯৭ ও ১২৭৮ সালে |
| ১০। | রাসলীলা | ঐ | ৫০ | ১২১৬ সালে |

ইহা ভিন্ন আরও কয়খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ বলিয়া আমাদের মনে হয়;—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১১। | রাধাকৃষ্ণ চৌতাসা | ঐ | | |
| ১২। | উদ্ধব সংবাদ | ঐ | ৪০০ | ১১০২। ২৫ চৈত্র |
| ১৩। | ধ্রুব চরিত | ঐ | ২১১ | ১ ৬৬ |
| ১৪। | প্রহ্লাদ চরিত্র | ঐ | ৪০০ | ১০৭১ সাল |

এই গ্রন্থগুলিও যে একজন কবিচন্দ্রের লিখিত তাহাও নহে তবে ইহার মধ্যে ঠাকুর কবিচন্দ্র ভট্টের রচিত গ্রন্থ যে আছে তাহা নিশ্চিত, তবে কোন গুলি তাহা নির্ণয়ের উপায় নাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যয়েব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যোঃ বৈষ্ণবেভ্যোঃ নমোনমঃ॥

বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট, সাহিত্যরত্ন, বিদ্যানিধি।

# আবাহন

এস—এস মা!

আমি অনন্ত দুঃখতাপে জর্জ্জরিত, শত নিরাশায় নিপীড়িত, দুর্গতিনাশিনি এস মা! প্রাণে হাহাকার, হৃদয় অন্ধকার, শরীর অবসন্ন, অন্তর্য্যামিনি এস মা!

সাধক সাধনা-বলে, ভক্ত ভক্তি বলে, জোর করিয়া তোমার প্রসাদ পায়। আমরা জানি, আমাদের সে শক্তি নাই ভক্তি নাই। আমরা জানি, শুধু দয়াময়ী আনন্দ ময়ী মা; অসহায় সন্তানের মর্ম্মভেদী ক্ষীণ আবাহন কি তোমার কর্ণকুহরে পৌঁছিবে না? অসহায় সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ যে অধিক মা! আজ ভারতের অগণ্য অসহায় সন্তান বড়ই আশায় ডাকিতেছে, এস এস মা! তোমার সাধের ভারতে এস মা! তোমার লীলাস্থলীতে দুর্গতিহারিণী, স্নেহ মমতাময়ী মাতৃ মূর্ত্তিতে দেখা দে মা! তুমি যে মা অগতির গতি। তুমি দীনের মা, তুমি ভক্তের মা, তুমি রাজার মা, তুমি আমার মা, তুমি সকলের মা; তাই ব্রহ্মার স্তবে তোমাকে বরাভয়দায়িনী অভয় মূর্ত্তিতে দেখা দিতে হইয়াছিল, সুরথ রাজার ভক্ত্যাতিশয্যে তোমাকে সুখের কৈলাস ছাড়িয়া অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, আর সুদূর সাগর পারে স্বয়ং রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র অনন্যগতি হইয়া, যখন নিজের চক্ষু উপহার দিতে উদ্যত হইলেন, তখন তুমিত তোমার তনয়ের কাছে একবার না এসে থাকিতে পারিলে মা। আমার সে পূজার শক্তি নাই, হৃদয়ে সে ভক্তি নাই, প্রাণে সে নিষ্ঠা নাই, ব্রহ্মার সে বেদ গানের আবাহন, সুরথের সে সর্ব্বাঙ্গীন পূজা, রামচন্দ্রের সে নীলোৎপল উপহার, কিছু নাই, আছে কেবল অনন্ত নিরাশ ও প্রাণফাটা হাহাকার। আমাদের সে ভক্তি সে একাগ্রতা, তুলসী, জবা, বিল্বদল, মন্ত্রতন্ত্র গঙ্গাজল, ভজন পূজন না থাকিলেও তুমি ত মা তোমার অধম তনয়ের মনের কথা, প্রাণের ব্যথা শুনে না এসে থাকিতে পারিবে না। তবে কেন এত দেরি করিস্ মা! আর মা জগত্তারিণি! তুমি বিনা তোমার তনয়ের প্রতি এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত মায়া, এত যত্ন আর কে করিতে পারে মা!

শাস্ত্রে শুনিয়াছি, তুমি দুর্গতিহরা, বরাভয়হরা, ভক্ত মনোহরা, বিশ্বব্যাপিনী,

ত্রিলোকপালিনী, কৈলাসেশ্বরী। তুমি সত্বগুণে সৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মাণী, রজোগুণে পালনকর্ত্রী বিষ্ণুর অঙ্কলক্ষ্মী নারায়ণী এবং তমোগুণে ভোলানাথের গৃহিণী মহেশ্বরী। তুমি ভবসাগর পারাবারের তরণী, আবার তুমি ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী পরমা দেবী। কিন্তু মা এসব কথায় ত' আমার মনের সাধ মিটে না, প্রাণের জ্বালা জুড়ায় না। আমি যে, মা তোমার অবোধ অধম সন্তান, ও সব শাস্ত্রের কথা কিছুই বুঝিতে পারি না মা! আদি অন্তের কথা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণাতীত ও কল্পনাতীত। ও সব বাহ্য শব্দ সম্পদের আড়ম্বরে আমার উত্তপ্ত মরুভূমি সদৃশ হৃদয়-মাঝে কি শান্তি দিবে মা! মাগো! আমরা যে, সব সংসার-যন্ত্রে নিষ্পেষিত, অনাহারেক্লিষ্ট, দুঃখদৈন্যে নিপীড়িত। তাই মা আত্মতত্ত্ববিধায়িনী, স্নেহমমতাময়ী, পরব্রহ্মরূপিণী জগজ্জননী, তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি এস—এস মা!

পিয়ে যাঁর ক্ষীরধারা, হৃদে বল পাই মোরা,
কোথা সে আনন্দময়ী জননী আমার।

এস এস একবার। এ তাপিত হৃদয়ে অজস্রধারে স্নেহবারি সিঞ্চনে সঞ্জীবিত করিতে একবার এস মা! তুমি বিনা সন্তানের মনের কথা প্রাণের ব্যথা আর কে বুঝিতে পারে মা। তুমি বিনা এ সংসার সমুদ্র হইতে আর কে উদ্ধার করিবে মা। বিপদবারিণী, দুর্গতিহারিণী, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ঙ্করী একবার সন্তানের দিকে মুখ তুলে চাও মা! জগৎ সমক্ষে তোমার মা নামের মহিমা, পতিতোদ্ধারিণী নামের গরিমা দেখাও মা।

ভারত যে তোমার সাধনার পীঠ। সমগ্র ভারতবাসী যে, তোমার বড় আদরের ধন। তাই তোমার পতিত অধম তনয়গণ তোমাকে প্রাণের ব্যথা, মনের সাধ জানাবার জন্য বারবার "আয় মা, আয় মা" বলে কাতর কণ্ঠে ডাকিতেছে। তুমি ভিন্ন যে মা তাদের অন্য গতি নাই, তুমি যে মা তাদের দুঃখহরা, জগৎজোড়া মা। তাই এই শুভদিনে শুভক্ষণে মঙ্গল ঘট পেতে, ভক্তি অর্ঘ্য লয়ে, আশাপূর্ণ হৃদয়ে তারা তোর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। মাগো! তোমার অদর্শনে সমগ্র ভারতবাসী চিন্তায়, দুঃখে, শোকে, মোহে ও ক্ষোভে অবসন্ন প্রায়। মা শান্তি বিধাত্রী, সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিধায়িনি, কলুষ কল্মষনাশিনি, পরমব্রহ্মজ্ঞানদায়িনি, আনন্দময়ী, একবার আয় মা! মাগো! শুধু তুমি আসিলেই সব আসিবে, নিরাশা সাগরে সাধের কমল ফুটিবে, আবার কমলার আবির্ভাব হইবে, আমার বীণাধারিণী বাণীর দেখা পাইব, সিদ্ধিদাতা

গণপতি আসিবেন, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিধরও আসিবেন। নিরাশায় নিপীড়িত হইয়া কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি। মা! তুমি ভোগকালে ভবানী-মূর্ত্তিতে, পুরুষাকারে-বিষ্ণু মূর্ত্তিতে, কোপপ্রকাশে কালী-মূর্ত্তিতে ও সমর-বিজয়ে দুর্গামূর্ত্তিতে তোমার সাধের লীলাভূমিতে বিরাজ করিয়া থাক। কিন্তু মা, এবার তুমি তোমার সন্তানকে ত্যাগের পূর্ণমূর্ত্তি মাতৃরূপে দেখা দিতে একবার এস মা!

ঋদ্ধি সিদ্ধি ল'য়ে মা সঙ্গে, এস মা বঙ্গজননী।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী

# শক্তি সংগঠন

মানবের পৃথক পৃথক যে শক্তি, তাহার সমবেত শক্তির শুভেচ্ছাই ধর্ম্ম শক্তি। এই শক্তি হিন্দুধর্ম্মের "জনগণ" নানা মত, নানা পথ এবং নানা প্রকার সামাজিক বিঘ্নে অবরুদ্ধ রাখিয়াছেন। হিন্দুর যে বৈশিষ্ট্য, হিন্দুর যে বিজয় সম্পদ, তাহা এই সব বিভাগীয় কারণে সমগ্র ধর্ম্মজগত দেখিতে পায় নাই। তাই আজ আমার ধর্ম্মকে কেহ অপমান করিলে, আমার দেবতাকে কেহ লাঞ্ছিত করিলে আমার প্রাণে তেমন ভাবে বাজে না।—যে দেশে ধর্ম্মের জন্য দলে দলে লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করাকে গৌরব মনে করিত, সে দেশে ধর্ম্মকাজে কেহ এখন প্রাণ দিলে একটা অসম্ভব কাণ্ড বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিলে ধর্ম্ম রক্ষার শক্তি আপনা হইতেই আসে এবং শক্তি থাকিলে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিবার ব্যাকুলতা কোথা হইতে আসিবে কেহ টেরও পায়না। বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগের ধর্ম্ম,—ত্যাগের ভিতর দিয়া তাহাকে চাহিলে যেমন সহজে বৈষ্ণবের ছবি আপনা হইতেই ফুটিয়া বাহির হয়, ভোগের মধ্য হইতে চাহিলে তেমনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবার কথা মাত্র ক্ষমতা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।

সকলেই বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, আমরা ভগবানের নিকট কি চাই। সব ত্যাগ করিয়া তোমাকে চাই, এই ভাব,—না তোমায় ডাকিতেছি আমার অর্থ হোক, ধন হোক, আয়ু হোক, যশঃ হোক, প্রতিষ্ঠা হোক এই

চাই। আমার মনে হয় শেষের দাবীগুলিই প্রায় লোকের কাম্য। বৈষ্ণবের পক্ষে যে গুলি অতি অবশ্য পরিবর্জ্জনীয়;—সেই গুলিকে লইয়াই আমরা এমন ভাবে পতিত হইয়াছি। তাই 'বৈরাগী' এই মহাশব্দের উপর আজ কাল এমন অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাবে মানুষের আসিয়াছে। কেন, বৈরাগ্য যোগ কি এমনিই হতাদরে বাজারের বদ্ আড্ডায় বিকাইবে?

সেই প্রেমের প্রয়োজন, যে প্রেমে ত্যাগ থাকে, যে ত্যাগে সোণারূপাকে তুচ্ছ করিয়া তুলিয়া পরশ পাথর পাইবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তোলে।

"মীরা কহে বিনা প্রেমসে, নাহি মিলে নন্দলালা।"

"বৈরাগী" শব্দটাকে যেখানে সেখানে এমন ভাবে অপমানিত হইতে দেখিতেছি,—যাহার জন্য আজ প্রকাশ্য ভাবে এই বিস্তীর্ণ বৈষ্ণব সমাজের অপমানকারীদের প্রতিবাদ করে কয়েক বৎসর কেবল সামাজিক প্রশ্নেরই মীমাংসা চাহিতেছি। সকলেই চুপ করিয়া থাকিয়া সামাজিকতা ধ্বংসের পথ যদি সংস্কার না করেন, তবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম থাকিবেনা, হিন্দু জাতি থাকিবে বলিয়া আমি কেন শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ স্বামী পর্য্যন্তও বিশ্বাস করেন না। যে সমস্ত মহাপ্রাণ বৈষ্ণবগণ চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন,—সকলের নিকটেই আমার বিনীত প্রার্থনা, তাহারা সমাজের দিকে বিশেষ ভাবে মনযোগী হউন;— সমাজ এবং ধর্ম্ম একই জিনিষ, একথা পূর্ব্বেই বিশেষ ভাবে বলিয়াছি। সমাজকে অন্ধ করিয়া ব্যভিচারের পথ প্রশস্ত রাখিয়া আমরা যতই ধর্ম্ম পথ প্রশস্ত করিতে যাই না কেন, পতন সুনিশ্চিত। আমার বক্তব্য বিষয় কোন মহাত্মাদের বুঝিতে বাকী নাই, লীলা বা ধাম লইয়া আমার কোন মতদ্বৈধ নাই—শুধু ধর্ম্ম সংস্কারের সঙ্গে তীর্থ সংস্কারের জন্য আমার এত চিৎকার। মানুষ আমি, হে বৈষ্ণবকুলতিলক তুমি যদি আমাকে মানুষ করিয়া গঠন করিতে না পার, তুমি যদি আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ সহজ ও লালসা শূন্য করিয়া দিতে না পার তবে কিসের তোমার পূজা, কিসের তোমার ধর্ম্ম, কিসের তোমার সাধনা। তুমি ঠিক পথ ধরিয়া আজ কুলতিলক হইয়াছ, অথচ পথ ভুল করিয়া তোমার দেশের দশজন কুপথে যাইতেছে, অথচ তোমার সমাজের কর্ত্তা হইয়া তাহার কোনই প্রতিকার করিতেছনা। একবার ভাবিয়া দেখিও এ পাপ কি তোমাকে কিছুই স্পর্শ করিবেনা? সমাজের ভাল করিবার দায়িত্ব কি ভগবান তোমাকে দেন নাই? সাধ্য কি তুমি ব্রজে বসিয়া সাধনা কর। আইস এইখানে, যেখানে পাপে পরিপূর্ণ নারকীয় বিভীষিকায় মানুষ হাঁহাকারে ডুবিতেছে,

নিজের রক্ত নিজে পান করিতেছে। এই মত লাঞ্ছিত পথভ্রষ্ট হতভাগ্য জীবনকে হাতধরিয়া পথে আন তারপর তীর্থ, লীলা, ধাম,—তখন এ সবের জন্য মানুষ এক নতুন ভাবে আপনিই জাগিয়া উঠিবে, আপনিই আনন্দময় বৈষ্ণব জীবন লাভ করিবার অধিকারী হইবে।

আমার বিশ্বাস বৈষ্ণব মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ এ সব বিষয় একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলে যথেষ্ট উপকার হইবে, এবং তাঁহাদের মিলিত শক্তি দ্বারা একটা নবউদ্ভাসিত প্রণালীতে অবশ্যই সমাজের হিত হইয়া প্রকৃত বৈষ্ণব মূর্ত্তি বাংলা দেশের হৃদয় হইতে আচম্বিতে জাগিয়া উঠিবে। মানুষ তখন মনে প্রাণে প্রকৃতই অহিংস হইবে। তখন ধর্ম্ম জগতে, রাজনীতিক্ষেত্রে, সমাজনীতিক্ষেত্রে কোন পথেই বাঙ্গালীর সঙ্গে কাহারও সংঘর্ষ হইবেনা।

আমার বক্তব্য পরে অন্য অন্য প্রসঙ্গে ক্রমে বলিতে চেষ্টা করিব, ভরসা করি বাঙ্গলায় ধর্ম্মের নামে যে ব্যাভিচার চলিতেছে তাহা দূর করিবার জন্য সমস্ত কাগজেই একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার একটা পথ করিবেন। নহিলে এমন দিন অবশ্যই আসিবে—ধর্ম্মের নামে পীড়ন অসহ্য হইলে তীর্থে তীর্থে, আখড়ায় আখড়ায়, মন্দিরে মন্দিরে প্রবল সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবে। সেই দিনের পূর্ব্বেই আমরা দেখিতে চাই আমরা সত্যপথের পথিক, ধর্ম্ম-সংস্কার করিবার আমরা উপযুক্ত। এসব শুনিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে, লেখক একজন ধর্ম্ম সংস্কারক, তাহা নহে,—আমি একজন বৈষ্ণবের দাসানুদাস। বৈষ্ণব সমাজে আমার জন্য একটু মাত্র স্থান আছে একথা বলিবারও আমি অধিকারী নহি,—আমার কথা, আমাদের মত অজ্ঞান, আমাদের মত পথভ্রষ্ট হৃদয় হীনের জন্য বৈষ্ণব সমাজ কি কোন পথ করিয়া দিবেন না? আমাদের পাপ, আমাদের জঘন্যতা দেখিয়া নমস্য বৈষ্ণবগণ সমাজে যদি নীরব সাধক হয়েন তবে দেশের উপায় কি হইবে? তাহা হইলে শ্রীমহাপ্রভুরওত চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন। আমাদের অভাব বৈষ্ণবগণের চরণে নিয়তই নিবেদন করিব—ইহাতে ভরসা আছে একদিন শ্রীরামগণ আমাদের উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিবেনই করিবেন।

শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

# অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম

## ( ৬ )

আমরা পূর্ব্বেই মহারাজ প্রতাপরুদ্রের চরিত্র আলোচনা করিবার অভিলাষ জানাইয়াছি। সুতরাং এই স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। আরও আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে গমন করিলে তাঁহার মহিমা ক্রমে ক্রমে সহস্র করোজ্জ্বল রবির ন্যায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আর মহারাজ তাঁহার সে অপূর্ব্ব খ্যাতি শ্রবণ করিয়া তাহাতে চিত্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিলে মহারাজ সার্ব্বভৌমকে কটকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া বলিয়া ছিলেন—ভট্টাচার্য্য! একজন পরম সাধু নাকি নীলাচলে আগমন করিয়াছেন, অনেকে এমন কি তাঁহাকে স্বয়ং জগন্নাথ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। তিনি তোমাকে কৃপা করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। এসব কথা সত্য কিনা শুনিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি। এখন মহারাজের গৌরাঙ্গ প্রীতি আমরা অনুমান করিতে পারি। আর তিনি সার্ব্বভৌমের নিকট হইতে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে তাঁহার মতের অনুকূল বিশ্বাস শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্যকে ধরিয়া বসিলেন যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন করাইয়া দেন।

মহারাজা, সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ উভয়কেই অনুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিতে পারেন। কিন্তু প্রভু লোকশিক্ষার জন্য অত্যন্ত কঠিন হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, সন্ন্যাসীর স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর সঙ্গ বিষের ন্যায় পরিত্যাজ্য, প্রভুর নিকট রাজার প্রার্থনা জানাইলে তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত করিয়া দিতেন। কিন্তু মহারাজের শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহোৎকণ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি তাঁহার ব্যাকুলতা উভয়কেই জানাইতেছেন। এবং তাঁহারাও আবার তাহা মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিতেছেন। মহাপ্রভু একদিন বাগ্‌ভঙ্গী দ্বারা জানাইলেন যে, রামরায় তোমার ন্যায় কৃষ্ণভক্তের উপর যখন মহারাজের এইরূপ প্রীতি জন্মিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাঁহাকে কৃপা করিবেন। এই কথায় প্রভু প্রকারান্তরে রাজাকে অঙ্গীকার করিলেন। সার্ব্বভৌম একদিন রাজাকে সান্ত্বনা দিবার সময় এই কথার উল্লেখ করিয়াই বলিয়াছিলেন—

"রায় রামানন্দ আজি তোমার প্রেমগুণ।
প্রভু আগে কহিল তাহে ফিরিয়াছে মন॥"

রামানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তিনি ব্যাকুল হইয়াই আসিয়াছিলেন সুতরাং শ্রীজগন্নাথ দর্শন না করিয়া প্রথমেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে দর্শন করিয়াছিলেন। প্রভু ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন ইহা তোমার করা উচিত হয় নাই। ইহাতে শ্রীল রায় মহাশয় একটি বেশ সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন,—

"রায় কহে—চরণ রথ, হৃদয় সারথী।
যাহা লঞা যায় তথা যায় জীবরথী॥
আমি কি করিব মন ইহা লঞা আইল।
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈল॥"

অর্থাৎ সংক্ষেপে তিনি এই কথা বলিলেন যে, তোমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অবধি আমার আর স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই—আমার মন আমাকে একেবারে তোমার চরণান্তিকে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে, জগন্নাথ দর্শন করা আগে যে কর্ত্তব্য—সে চিন্তা আমার মনে উঠিতেই দেয় নাই। প্রভু এ কথায় অবশ্য মনে মনে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, যাও আর সময়ক্ষেপ করিয়া কাজ নাই। শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হও।

মহারাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য ক্রমশঃ অধিকতর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। মধ্যে প্রভু ভক্তগণের নিকট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা যদি পুনঃ পুনঃ রাজার সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করে তাহা হইলে তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। পরে তাঁহার কঠিন চিত্ত অনেকটা নরম হইয়াছিল। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং রামানন্দ প্রভৃতি সকলেই ভক্তিমাখা যুক্তির দ্বারা মহাপ্রভুর একখানি বহির্ব্বাস রাজার জন্য মাগিয়া লইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর রামানন্দ—

"রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহার নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥"

অবশ্য রামানন্দ একদিন বিশেষ জেদ করিয়াই ধরিয়া বলিল যে, প্রভু আপনাকে কৃপা করিয়া রাজাকে দর্শন দিতেই হইবে। ইহাতে—

"প্রভু কহে রামানন্দ কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইঞা ?
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুইকুল নাশ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥
রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয় ? তুমি নহ পরতন্ত্র ?"

স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলুন আর যাহাই বলুন প্রভু কিন্তু সম্মত হইলেন না। ওদিকে রাজার উৎকণ্ঠার সীমা নাই, তিনি একখানি পত্র লিখিয়া প্রভুর মনোভাব জানিতে চাহিয়াছেন। ইহাতে সার্ব্বভৌম বড়ই ব্যস্ত হইলেন তিনি সাহস করিয়া প্রভুর সম্মুখে গিয়া বসিলেন—কিন্তু তাঁহার "নিবেদনটী" জানাইতে যেন সার্ব্বভৌম কুণ্ঠিত হইতেছেন। তাই প্রভু বলিলেন,—

"—কহ তুমি নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হইলে করিব অযোগ্য হইলে নয় ॥"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি একখানি পত্র দিয়াছেন। যাহাতে তুমি তাঁহাকে দর্শন দাও, এই জন্য বিস্তর অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা রাজার কাতরতা আর দেখিতে পারিব না, প্রভু ইহাতে কিন্তু গলিলেন না, তিনি কর্ণে হস্ত দিয়া শিহরিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য, তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি হইয়াও কি বলিতেছ ? আমি ভিক্ষুকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, রাজসঙ্গ আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।" প্রভু জানিতেন এই রাজা পরম ভক্ত এবং জগন্নাথের সেবক তথাপি তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ভক্তগণ কি করিবেন, প্রভু যখন একদিন বলিয়াছেন তাঁহারা যদি রাজার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলেন, তাহা হইলে তিনি পুরুষোত্তম ত্যাগ করিয়া যাইবেন তখন তাঁহারা এ প্রসঙ্গ হইতে বিরত হইলেন।

রাজার নিকট হইতে আবার পত্র আসিল তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার রাজকার্য্য বিষের মত লাগিতেছে, প্রভু যদি একান্তই তাঁহাকে স্বীকার না করেন তাহা হইলে তিনি কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া যোগী হইয়া বাহির হইয়া পড়িবেন। এই পত্র পড়িয়া ভক্তগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বলা হইল তিনি যদি আর-

একবার কৃপা করিয়া মহাপ্রভুর মন দ্রব করাইবার চেষ্টা করিতে পারেন তবেই হয়। নিত্যানন্দের কিন্তু সাহসে কুলাইল না। তখন ভট্টাচার্য্য বলিলেন আর এক কাজ করা যাউক, সকলে মিলিয়া প্রভুকে রাজার প্রশংসা শুনাইগে। ইহাতে সকলের মত হইল। সকলে একত্রে প্রভুর নিকটে গেলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

প্রভু বুঝিলেন তাঁহাদের কিছু বলিবার আছে তিনি মুখ উঠাইয়া শুনিতে চাহিলেন। নিতাই বলিতে গেলেন, কিন্তু তিনি একটু তোতলা, তাহাতে কথাটা আবার তেমন ভাল নয় সুতরাং আরও তাহার যেন আট্‌কাইয়া গেল। প্রভু বলিলেন তোমাদের যাহা বলিবার আছে বল আমি শুনিতেছি। ইহাতে নিতাইএর সাহস হইল, তিনি বলিলেন তোমাকে না বলিলেও নয়, কিন্তু বলিতেও সাহস হইতেছে না। কথাটা আর কিছু নহে, রাজা আবার পত্র লিখিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, তুমি যদি তাহাকে দর্শন না দেও তাহা হইলে তিনি কাণে কড়ি পরিয়া উদাসীন হইবেন, রাজ্য আর তাঁহাকে একটুও সুখ দিতেছে না। তাঁহার সাধ যে, তোমার নিকট আসিয়া প্রাণ ভরিয়া একবার তোমাকে দেখিবেন। রাজার কথায় আমার অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

প্রভু ইহাতে কতকটা রুক্ষ এবং ব্যঙ্গভাবে বলিলেন,—

"তোমা সবার ইচ্ছা এই আমাকে লইঞা।
রাজারে মিলহ ইহ কটকেতে গিয়া॥
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন।
লোকে রহু দামোদর করিবে ভৎর্সন।
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে॥

দামোদর পণ্ডিত বড়ই রুক্ষ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি পরম উদাসীন, প্রভুর একান্ত ভক্ত আবার একটুকু ত্রুটী হইলেও তিনি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। তাই বোধ করি প্রভু তাঁহাকে একটু ঠোক্‌না দিয়াই এ কথাটা বলিলেন। ইহাতে দামোদর বলিলেন,—

"———তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥

আমি কোন ক্ষুদ্র জীব তোমায় বিধি দিব ?
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব ॥"

চতুর প্রভুর চতুরালি অতিক্রম করিয়া দামোদর এবার উত্তর দিলেন। বলিলেন প্রভু তুমি ভাল কথা বলিলে, সকলকার কথা কাটাইতেছ এখন এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করিতেছ? বলিতেছ কিনা আমি যদি বিধি দিই তবেই প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দিবে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের উপর এখন আমার কথা বড় বোধ হইল। তোমার ঠাকুরালি বুঝিবার আমার আর বাকি নাই। সময় হইলে, কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না, তুমি নিজেই প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলিত হইবে, আমরা সবই দেখিতে পাইব। কারণটীও ত আমার জানিতে বাকি নাই, যে হেতু—

"রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহ করাবে তাঁরে তোমার পরশ ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম পরতন্ত্র ॥" ( চরিতামৃত)

কাজেই দামোদরের নিকট প্রভুর বাক্চাতুরি আর খাটিল না। তখন রাম রায় বলিলেন, প্রভু আপনি ত সাক্ষাৎ ঈশ্বর, আপনার আবার বিধি-নিষেধের ভয় কি? প্রভু কিন্তু এ কথা স্বীকার করিলেন না, তিনি বলিলেন—

"——আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায় ॥"

"রামানন্দ! আমি সন্ন্যাসী, আমার দোষ দেখিলেও লোকে অপবাদ দিবে। সন্ন্যাস জীবনে সমস্ত বিধি-নিষেধই বিশেষ করিয়া মানিতে হয়। কারণ শুভ্র বস্ত্রে একবিন্দু কালী পড়িলে তাহাও যে লুকাইতে পারা যায় না।" প্রভু মনুষ্যের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। তাই তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, আমি আশ্রম বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে লোকে কি বলিবে।

রামানন্দ বলিলেন, প্রভু সমস্তই ত বুঝিলাম, কিন্তু রাজা যে তোমার দর্শন না পাইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন বলিয়াছেন।"

প্রভু ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ যুক্তিপূর্ণ অনুরোধে আর চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলেন না। ভক্তবৎসল প্রভুর চিত্ত ক্রমশঃ বিগলিত হইয়া আসিতেছিল। তাই তিনি এবার বলিলেন,—"শাস্ত্রে রাজদর্শন নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু তিনি যখন ভক্তিমান ও গুণী তখন তাঁহাকে দর্শন দিতে বাধা নাই। তথাচ তিনি যখন "রাজা" তখন তাঁহার পরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্রকে আন।

"প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু স্পর্শে কেহ না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্ব গুণবান্।
তাঁহারে মলিন করে এক "রাজা" নাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে তুমি মিলাহ মোরে তাঁহার তনয়।
"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শাস্ত্র বাণী।
*পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥"* (চরিতামৃত)

শাস্ত্রে যখন বলিতেছেন "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" তখন তিনি পুত্রের সহিত আমার মিলনে যেন নিজেরই দর্শন লাভ হইয়াছে মনে করেন।

এই সংবাদ রামানন্দ রাজাকে প্রদান করিলে তিনি বলিলেন "প্রভুর আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়, তিনি যেমন করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহাই করিবেন।"

রাজা স্বীয় পুত্রকে আনিয়া রামানন্দের হস্তে অর্পণ করিয়া ভাবিলেন 'আমি পুত্র হইতে শ্রীভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হইলাম। আমার পুত্রটীও ধন্য! কিন্তু হায়! কি দুর্ভাগ্য আমি শ্রীচৈতন্য দেবের বদনকমল দর্শনের সৌভাগ্য পাইলাম না। তাঁহার আক্ষেপ চন্দ্রোদয় নাটকে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

না দিবেন অভাগার প্রতি শ্রীচৈতন্য দরশন,
হা হা ধিক্ রাজত্ব ইহা হইতে সুনীচত্ব
পৃথিবীতে আর আছে কতি।
দর্শন না করি যারে হেন নীচ অধমেরে
মহাপ্রভু করে দরশন।

রামানন্দ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনি দুঃখিত হইবেন না, আমি বুঝিতেছি, প্রভুর আপনার প্রতি পূর্ণরূপেই কৃপা হইবে, আর সেই কৃপার আরম্ভ অদ্য হইতে।" রাজা একথায় আশ্বস্ত হইলেন।

রামানন্দ রসিকচূড়ামণি, তিনি দেখিলেন রাজকুমারের নব যৌবনারম্ভ, বর্ণ শ্যাম। তিনি তাঁহাকে শ্যামসুন্দরের বেশে সজ্জিত করিলেন। তাঁহাকে পীতাম্বর পরাইয়া যথাযোগ্য আভরণ দিয়া সাজাইয়া দিলেন। পায়ে মঞ্জীর ধ্বনি হইতেছে, রাজপুত্র মন্থর গতিতে শ্রীচৈতন্য প্রভুর সহিত মিলিত হইতে চলিলেন। নবযুবতীর পতি-সন্দর্শনে গমন কালীন চিত্তের ন্যায় তাঁহার চিত্তোদ্বেগ জন্মিয়া ছিল।

মহাপ্রভু রাজকুমারকে দেখিয়া প্রেমানন্দে বিবশ, তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন,—

"এই মহা ভাগবত,—যাঁহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্র নন্দন স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে।
কৃতার্থ হইলাম আমি ইঁহার দর্শনে॥"

কিন্তু প্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া রাজকুমার কি করিলেন?

"প্রভু স্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ পুলক বিশেষ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে রোদন।"

রাজকুমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি করিয়া বিহ্বল ভাবে নৃত্য করিতেছেন। প্রভু তাঁহাকে সযত্নে শান্ত করিয়া বলিলেন—"তুমি ভাগবতোত্তম। তুমি এখানে প্রত্যহ আসিও।" তখন তিনি প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইলে প্রভু আবার উঠাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া রাজকুমার পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা দেখিলেন পুত্র চলিয়া আসিতে পারিতেছেন না, আনন্দে টলমল করিতেছেন, নয়ন দিয়া ধারা বহিতেছে—এক কথায় তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইয়া গিয়াছে। বিষয়ী পুত্র গিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া রাজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি এরূপ অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদ ত আর কখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। প্রভু রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন এক্ষণে রাজা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম

ধনে ধনী স্বীয় পুত্রকে স্পর্শ করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেন। আর এই দিন হইতে প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রেম হ্রাস না পাইয়া অধিকতররূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

# বিজয়া

কোন্ দেশের মাটীতে দেবতা হয়? দেবতা বিসর্জ্জিত হয়? বিসর্জ্জনে এত আনন্দ, সেই আনন্দের এত আবেগ এবং সেই আবেগ এত বিমল, মর্ম্মস্পর্শী, উল্লাসময় ও কলুষ সম্পর্কশূন্য।

কবে কোন্ বিস্মৃতপ্রায় অতীতকালে সুদূর সাগর পারে সীতা উদ্ধারের প্রধান ও সর্ব্বশেষ অন্তরায় দশানন-বিনাশের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের পূজাতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের হস্তে দুরন্ত রাবণের সংহার হইল। স্বর্গে মর্ত্তে বিজয়োৎসব হইল। আর এখনও বর্ষে বর্ষে সেই শুভদিনের, সেই পুণ্যস্মৃতি স্মরণে তাহার অমর অভিনয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, আমরা কিসের উদ্ধারের জন্য, কোন্ দুরন্ত রিপুর বিনাশ সাধন করিয়াছি। আমাদের ত কেবলি বিসর্জ্জন, ধন, মান, যশ, ধর্ম্ম, শান্তি, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি একে একে ত সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমাদের প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে ভক্তি নাই, শরীরে বল নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, মনে একাগ্রতা নাই, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সকলি বিসর্জ্জিত হইয়াছে। বিসর্জ্জন ধারাবাহিক, অনন্ত সাধারণ, অনন্ত। তবুও আমাদের বিজয়োৎসব। তাই আজ বলিতে ইচ্ছা হয় বিশাল বর্ত্তমান ভারতে শক্তিহীনের শক্তিপূজার অভিনয়ের ন্যায় ইহাও কি একটি বিরাট উপহাস?

তবুও বলিব আমাদেরই আজ বিজয়োৎসব। ভারতের চিরারাধ্যা, বিশ্বের দুর্গতি নাশিনী দুর্গে তোমায় বিজয়োৎসবও বলিতে পারি। রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব কত কাল হইল হইয়াছে। তাহার পর কত জাতির উত্থান পতন হইয়া

গিয়াছে। এখনও দেখিতেছি আমি আছি, আর দেখিতেছি তুমি আছ। প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি, দেশ-ব্যাপিয়া প্রচারিত হইতেছে, তোমার বিজয়োৎসব। আজ আমি বুঝিয়াছি, আমি সেই পুণ্যক্ষেত্র ভারতের সর্ব্ব-প্রধান ও প্রথম শক্তি সেবক আদর্শ মনুষ্যের বংশধর। আর দেখিতেছি, তোমার অসুর নাশিনী, অভয়দায়িনী মাতৃমূর্ত্তি। যুগে যুগে তোমার লীলা বিকাশ, আজ স্মৃতিপটে জাগিয়েছে। দুর্দ্দান্ত দৈত্যদলনী মূর্ত্তিতে তোমার লীলা প্রকাশ। বারে বারে স্বর্গে মর্ত্তে যখনই গর্ব্বোদ্ধত দানবের প্রাধান্য হইয়াছে, তখনই তুমি নানামূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের মঙ্গল বিধান করিয়াছ। তোমার নিত্যবিধান যথাসময়ে হইবেই হইবে। আজ সেই সনাতন নিয়মে, জগতে তোমার লীলা প্রকাশের একটি শুভদিন। এই শুভদিনে সাধনা-সিদ্ধির শুভসংবাদ বহন করিতেছে। তাই এ ঘোর দুর্দ্দিনেও সকল বিসর্জ্জন দিয়াও আমরা ভুলিনাই যে, আজ তোমার বিজয়োৎসব। এখনও আমি আছি, আর তুমি আছ, তোমার অসুরনাশিনী লীলা আছে। আমার মনে হয়, সেই নিয়তি বশেই বুঝি তোমায় আবাহন করিয়া আঁধার চণ্ডী-মণ্ডপ আলো করিয়া বসাইলাম। তিনদিন মাত্র সেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে তোমার চিণ্ময়ী শক্তির পূজা করিলাম। তবে আবার গঙ্গাগর্ভে, সেই সুবর্ণপ্রতিমা, সেই চিরারাধ্যধন, সেই মহাশক্তির বিসর্জ্জন করি কেন? সেই বিসর্জ্জনেই ত আমাদের পূর্ণ বিজয়োৎসব। অতি মূর্খ বা অতি উন্মত্তেও আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়বস্তুকে সানন্দে ভাসাইয়া দেয় না। আর তোমার ভারতে ভারতের চিরারাধ্যা তোমার প্রতিমা, তোমার সেবকগণ জলে ডুবাইয়া সানন্দে পরস্পরে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হয়, ইহা কিরূপ বিচিত্র বিধান। সাধনার ধন, সঞ্চিত শক্তি আপনাপন হৃদয়ে রাখিয়াই তাহারা তৃপ্ত নহে। তাহা কর্ম্মস্রোতে ভাসাইতে হয়, তাই কি বিসর্জ্জন? বাঙ্গালী আপনার ভ্রাতার নিকট সহানুভূতি পাইবার জন্য ছুটিয়া যায়, তাই কি বিজয়ার কোলাকুলি। জগতে সকলেই যে তোমার সন্তান, সকলেই যে ভাই ভাই। সংসারের বিচিত্র বিধানে আমরা পরস্পরে বিরোধ বিভ্রমে-বিবাদ বিসংবাদে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু আজ হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলনের শুভদিন। কে আছ দুঃস্থ, মর্ম্মপীড়িত—এস আমরা সকলে আজ শত্রু মিত্র, বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া বক্ষে বক্ষে আলিঙ্গনে পরম শান্তি, পরম তৃপ্তি অনুভব করি।

আজ এই শুভদিনে বিকৃত পণ্ডিতের ভ্রমের কথা আর তুলিব না।

পূজাকরিয়া যাহাদের সাধ মিটে নাই, তাহাদের অতৃপ্ত অবসাদের কারণ নাই। নবীন আশায়, নবোদ্যমে, বর্ষব্যাপী চেষ্টায় ও সাধনায় পুনরায় তাহারা তোমার পূজার আয়োজন করিতে থাকিবে। স্নেহের ধন, যত্নের ধনকে স্নেহ যত্ন করিয়া কবে, কার প্রাণ ভরিয়াছে? এই অতৃপ্তিই পূজার প্রধান উপকরণ। প্রাণের ব্যথা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাহারা পুনরায় এই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিল। তুমি আবার আসিবে, আবার তাহারা তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। আবার দেখিবে, আমরা আছি, তুমি আছ, আর তোমার স্নেহমমতাময়ী মাতৃমূর্ত্তি আছে, তোমার অসংখ্য সন্তান আছে। শত্রুমিত্র ভুলিয়া প্রাণ ভরিয়া পরস্পরের আলিঙ্গনে তোমার পূজার পবিত্র পরিণাম আছে।

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী

---

# আলোচনা

বিগত ভাদ্রমাসের ভক্তি গ্রাহকগণকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াই ভক্তি-সম্পাদক মহাশয় দারুণ কলেরা রোগাক্রান্ত হন। কাজেই কয়েকদিন পর্য্যন্ত ভক্তিকার্য্যালয়ের যাবতীয় কার্য্য বিভাগই বন্ধছিল, শেষে সম্পাদক মহাশয়ের অবস্থা কিঞ্চিৎ সুবিধা হইলে নূতন লোকদ্বারা কোনও প্রকারে বাকী পত্রিকাগুলি গ্রাহকগণকে পাঠান হয়। অনেক গ্রাহকই যথাসময় পত্রিকা না পাইয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন, পৃথক ভাবে সকলকে উত্তর দেওয়া কষ্টসাধ্য, তাই ভক্তিতে বিলম্বের কারণ জানান হইল। এখনও সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইতে পারেন নাই। তাই বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার লিখিত প্রার্থনা প্রভৃতি দেওয়া গেল না। বর্ত্তমান সংখ্যা আশ্বিন মাসের প্রথমেই বাহির হইবার কথাছিল কিন্তু নানাবিধ বাধা বিপত্তিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল।

* * * *

বিগত আষাঢ়মাস হইতে গ্রাহকগণের নিকট নূতন বৎসরের ভক্তির

জন্ম জানাইয়া, বিশেষতঃ শ্রাবণমাসে ভক্তির সহিত পৃথক নোটীশ দিয়া ১লা ভাদ্রের পর হইতে গ্রাহকগণের নিকট ভিঃ পিঃ করিতে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু সংবাদ দিবার যথেষ্ট অবসর থাকা সত্বেও পূর্ব্বে আমাদিগকে কোন সংবাদ না দিয়া বা ভক্তির বার্ষিকমূল্য না পাঠাইয়া কেহ কেহ ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়াছেন। এরূপভাবে অনর্থক আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়া যে তাঁহাদিগের কি লাভ লইল বুঝিলাম না। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে উৎসাহ পাইবার জন্যই আমরা সকলের নিকট "ভক্তি" ডালি লইয়া উপস্থিত, জানিনা এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়া মঙ্গলময় আমাদিগকে কিরূপ উৎসাহ দিতে চান। যাহাই হউক, তিনি মঙ্গলময় তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ভক্তি না লউন তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সেই সংবাদটী পূর্ব্বে দিলে আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না।

* * * *

অনেক সময় ডাক পিয়নের দোষে ভিঃ পিঃ ফেরৎ আইসে, হয়ত ডাক-পিয়ন একবার যাইয়া মালিকের দেখা না পাইয়া আর যায় না বা কোন সংবাদ দেয়না। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ বাস্তবিক ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিবার জন্য দোষী নয়। কিন্তু আমরা কি করিয়া তাহা বুঝিব। তাই আমরা যে সকল গ্রাহকের নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়াছে তাঁহাদিগের নিকট ২য় ও ৩য় সংখ্যা পুনরায় পাঠাইলাম। যাঁহারা নিতান্তই গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন আর যাঁহারা যথার্থই ভক্তির প্রচারে উৎসাহদাতা তাঁহারা এই সংখ্যা পাইয়া আমাদিগকে জানাইলে আমরা ১ম সংখ্যা পুনরায় পাঠাইব। আর পিয়নের দোষে যদি ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিয়া থাকে তাহাও দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইলে আমরা প্রতি-কারের ব্যবস্থা করিব।

* * * *

বিগত ভাদ্র হইতে পৃথক পত্রাঙ্কে গ্রন্থপ্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, ভক্তির কলেবরও ১ফর্ম্মা বৃদ্ধ হইয়াছে অথচ মূল্য বাড়ে নাই। ছাপাখানার অবস্থা যাঁহারা জানেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে এই কলেবর বৃদ্ধিতে কতব্যয় বাহুল্য। আমরা কেবলমাত্র গ্রাহকগণের ভরসাতেই এই ব্যয়বাহুল্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে যদি গ্রাহকগণ আমাদিগকে উৎসাহদানে কৃপণতা করেন তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। মাসিক পত্রিকা হিসাবে ভক্তি ক্ষুদ্র হইতে পারে কিন্তু যে উদ্দেশ্য লইয়া ভক্তি আজ তেইশ বৎসর ভাগ্যবান ভক্তের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন সে উদ্দেশ্য যে কখনই ক্ষুদ্র নয় তাহা নিশ্চয়। যদি উৎসাহ অভাবে ভক্তি নিজ উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে আমাদিগের লজ্জার বিষয় বড় কম-নয়। যাহাহউক আমরা পুনর্ব্বার ভক্তি পাঠাইলাম, আপাকরি নিজ নিজ ভক্তির বার্ষিক সাহায্যে ১৷৷৹ দেড়টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

*  *  *  *

সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতার দরুণ সকল গ্রাহককে ভাদ্র মাসের ভক্তি ভিঃ পিঃ করা হয় নাই, যাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃ হয় নাই অথচ মূল্য মনিঅর্ডারেও পাঠান নাই আশা করি তাঁহারা এই সংখ্যা পাইয়া নিজ নিজ দেয় ভক্তির মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। ভিঃ পিঃ করিলে গ্রাহকগণের ।/• আনা বেশী খরচ হয় মনিঅর্ডার করিলে ৵• আনাতেই হয়। সেই কারণেই মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি। আমরা পুনরায় জানাইয়া রাখি যাঁহাদের মূল্য বাকী থাকিবে তাঁহাদিগকে আগামী মাসের পত্রিকা ভিঃ পিঃ করিব।

*  *  *  *

কলিকাতা গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতে দ্বাদশ গোপালের শ্রীপাটের বিবরণ সংগ্রহের জন্য এক শত টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়া ছিল। পানিহাটী নিবাসী বৈষ্ণব কবি শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় বহু পরিশ্রমে প্রত্যেক শ্রীপাটে গমন পূর্ব্বক তথাকার ফটো চিত্র, নক্সা ও বংশ তালিকা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া "শ্রীশ্রী দ্বাদশগোপাল" নামে সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করিয়া বৈষ্ণব সাম্মিলনীর ঘোষিত পুরস্কারের অধিকারী হন।

সম্প্রতি বৈষ্ণব সম্মিলনী নিজব্যয়ে উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে প্রদান করিয়াছেন। চিত্রগুলি মুদ্রিত হইলেই উক্তগ্রন্থ ভক্তগণের শ্রীকরে অর্পণ করা চলিবে। আমরা পুস্তক খানি দেখিয়াছি। যথার্থই ভট্ট মহাশয়ের গ্রন্থ খানির বিষয়-সংগ্রহের জন্য পরিশ্রমের কথা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

বৈষ্ণব ইতিহাস অনুসন্ধানে শ্রীযুক্ত ভট্ট মহাশয় বরাবরই বিশেষ উদ্যোগী। সাহিত্য পরিষদ হইতে দুই তিন বার ইনি পুরস্কৃত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বাংলাদেশের যাবতীয় গৌরতীর্থের অনুসন্ধানে রত আছেন। শীঘ্রই দ্বাদশগোপলের ন্যায় ৬৪ মহান্ত ৬ চক্রবর্ত্তী ৮ কবিরাজ প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। ইহাঁরই লিখিত "বৃহৎ বৈষ্ণব চরিত অভিধান" নামক এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ হইতেছিল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকা বর্ত্তমানে চলিতেছে কি না তাহা আমরা জানিনা। কারণ বহুকাল শ্রীপত্রিকার সাক্ষাৎ পাই নাই। ভট্ট মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থ খানি অতিবৃহৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশ হইলে কতদিনে যে সম্পূর্ণ হইবে তাহা বলা যায়না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্য অনেক অর্থশালী লোক আছেন কোন মহানুভব যদি সম্প্রদায়ের উন্নতি কল্পে ভট্ট মহাশয়ের গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া দেন তাহা হইলে বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ মঙ্গল হয় বলিয়াই আমাদের ধারণা। এ বিষয় বিশেষ বিবরণ ভক্তি সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অথবা গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট, পানিহাটী, ২৪ পরগণা, এই ঠিকানায় জানিতে পারেন।

*  *  *

বিগত ১৮ই শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্নে "ঢাকা ফরিদাবাদ হরিসভায়" এক

বিশেষ অধিবেশন হয়। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থনিচয়কে উপেক্ষা করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বহির্ভূত লেখকগণের লেখা হইতে অসদুক্তি সমূহ তাঁহার কতিপয় পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদ গোস্বামীগণের পরমপূত নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদ কল্পে এই সভা আহূত হয়। ঢাকা, ফরিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, নবাবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামচাঁদ বসাক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। "সেবা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ তত্ত্বভূষণ মহাশয় "সাহিত্যিকের হস্তে মহাপ্রভুর চিত্র" শীর্ষক এক সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, বিবিধ যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দীনেশ বাবুর অন্যায় উক্তি ও উদ্ধৃত অংশসমূহের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করেন। উপসংহারে যোগেন্দ্র বাবু বলেন "দীনেশ বাবু শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব জগতের মহামান্য গ্রন্থসমূহ উপেক্ষা করিয়া, নগণ্য গোবিন্দ কর্ম্মকারের কড়চা প্রভৃতি অবলম্বনে শ্রীমহাপ্রভু সম্বন্ধে একান্ত অসঙ্গত ও অলীক কতকগুলি কথা তাঁহার নিজের পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন এবং ঐ সমুদয় পুস্তক আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ সমুদয় অযথার্থ অন্যায় কল্পনা জনসাধারণে এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকাদিতে প্রকাশিত হওয়ায়, বৈষ্ণব জগতের এবং স্থলতঃ বিশুদ্ধ ধর্ম্মজগতের বিশেষ অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। দীনেশ বাবু বিকৃত সহজিয়া ধর্ম্মমতের অতি হেয় "বিবর্ত্তবিলাস" পুস্তক হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছয় গোস্বামীর পরমপূত চরিত্র সম্বন্ধে অতি জঘন্য মিথ্যা বাক্যাবলী তাঁহার "Typical selections" নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যস্বরূপে নির্ব্বাচিত সুবৃহৎ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সমগ্র পুস্তককে কলঙ্কিত করিয়াছেন।

যোগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় সভাস্থ সমুদয় ব্যক্তিগণ এক বাক্যে দীনেশ বাবুর অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করেন। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়, প্রস্তাবটী এই :—

"সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রভৃতি পুস্তকে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও প্রাচীন গোস্বামীবর্গের সম্বন্ধে যে সমুদয় অন্যায় উক্তি প্রকাশিত করিয়াছেন এই সভা অত্যন্ত ঘৃণার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন এবং সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে ইহার প্রতিকার কল্পে দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন।"

গত ২০এ শ্রাবণ মঙ্গলবার সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ঢাকা নবাবপুর "শ্রীচৈতন্য সভায়" এক বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতেও যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

শ্রীনিতাইচাঁদ গোস্বামী

# ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

[ ২৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ৩৩১ সাল ]

## প্রার্থনা।

আনন্দময়! অন্ধের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া জীবনের অমূল্য সময় আর কত নষ্ট করিব? সুখ সুখ করিয়া নিরন্তর ছুটাছুটি করিতেছি, কিন্তু সুখ পাওয়া ত দূরের কথা, কিসে সুখ, কোথায় সুখ, তাহার সন্ধানও মিলিল না। মোহবশে সুখ পাইব বলিয়া যাহাই করিতে যাই পরিণামে তাহাই দুঃখ ও ভয়ানক ভয়ের কারণ হইয়া পড়ে। ভালবাসিয়া সুখী হইব মনে করিয়া সংসারে অনেককে ভালবাসিলাম কিন্তু আশা ত কৈ মিটিল না, অভাব ত কৈ পূরণ হইল না, অধিকন্তু ভাবনা ও ভয় ক্রমান্বয় বাড়িতেই লাগিল। ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া তোমার অসীম লীলাখেলার তত্ত্ব বুঝিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা, কিন্তু তাই বলিয়া আমি কি এমনিই থাকিব? অনন্তলীলাবিলাসী! কি ভাবে কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে তুমি জীবগণের সহিত এরূপ লীলা খেলা করিতেছ তাহা তুমিই জান।

শ্রীগুরু-কৃপাবলে তাঁহারই উপদেশ দ্বারা বেশ বুঝিতেছি, এ জগতে ভোগ্য বস্তু এবং ভোক্তা, দৃশ্য এবং দ্রষ্টা সকলই ভয়সঙ্কুল, কেবল তোমার শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ই নির্ভয় এবং মঙ্গলালয়। অন্য কিছুতেই অবিচ্ছিন্ন সুখ পাইবার আশা নাই। তোমার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া সদ্গুরুর কৃপায় যে আমিত্বকে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছে সে-ই যথার্থ ভয় ও দুঃখসাগর পার হইয়া আনন্দ কাননের সুখ-শান্তি লাভে ধন্য হইতে পারিয়াছে। যাঁহারা

তোমার ভক্ত, সর্ব্বান্তঃকরণে সকল কর্ম্মফল যে তোমাতে অর্পণ করিতে পারিয়াছে এমন কৃতকৃতার্থ ভক্তের সঙ্গ মিলাইয়া দাও। তাঁহাদের সঙ্গগুণে আমি সকল তাপ, সকল চিন্তা, সকল অভাবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরম মঙ্গলময় তোমার লীলাগুণ গানে আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকি।

অভাবের তাড়না আর হৃদয়ে জাগাইও না। রোগ, শোক, জরা মৃত্যুর ভয়ে তোমার ভক্তের হৃদয় কখনও চঞ্চল হয় না, আমাকেও কৃপা করিয়া সেই ভক্তের সঙ্গসুখ লাভে কৃতার্থ করিয়া দাও। তুমি দয়াল, জগৎ তোমার দয়া পাইবে আর আমিই কি বঞ্চিত থাকিব? একদিনের জন্যও কি শান্তিময়—আনন্দময়—প্রেমময় তোমার মোহন-মূরতিখানি হৃদয়ে জাগিবে না? কৃপা কর, তোমার কৃপায় হৃদয়ের অভাব যাইয়া ভাব আসুক, ভোগ প্রবৃত্তি যাইয়া ভজনে আসক্তি জন্মাক। আমি যে কটা দিন ভবে থাকিব তোমার ভজন-পূজন করিয়া পরমানন্দে কাটাইয়া দি। অধমতারণ! পতিত-পাবন! অধম পতিতকে কৃপা কর। বল নাথ—

"এ যাতনা কতকাল দহিবে আমারে আর।
কতকাল রব ভবে বহিব দুঃখের ভার॥
তোমারে ভুলিয়া মোর দুর্দ্দশা হয়েছে সার।
যা' হবার হ'য়ে গেছে উপায় নাহিক তার॥
পাপী ব'লে অবহেলা ক'রনা আমারে আর।
নিজগুণে দয়া ক'রে মুছে দাও আঁখি ধার॥"

—•—

# শ্রীমতীর বিলাপ।

( পরিব্রাজক "শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবা" লিখিত )

আমারি করম মন্দ সখিরে
আমারি করম মন্দ।
মাধব চির করুণাসিন্ধু
তাহাতে নাহিক সন্দ॥
বিধি নির্দ্দেশে প্রাপ্ত হইয়া
অগুরু চন্দন গন্ধ।

নাসিকা রন্ধ্র করিলাম আমি
মানের বসনে বন্ধ ॥
সুখের সুপথ ছাড়িয়া হাটিনু
কুপথে হইয়া অন্ধ।
দুঃখের গরতে (১) পড়িনু যখন
তখন ভাঙ্গিল ধন্দ ॥
সুখের সুদিন ফুরাইল মোর
করিয়া কেবল দ্বন্দ্ব।
"ভুলুয়া" সুধায় সুদিন কে পায়
হেলিয়া (২) গোকুলানন্দ ॥

# প্রেমরসময় গোরাচাঁদ।

আমার গৌরাঙ্গরায় রসিকশেখর।
অগাধ রূপের খনি নব নটবর ॥
নব রস রঙ্গিয়া প্রেম বিনোদিয়া।
পিরীতি রসের সার প্রাণমোহনিয়া ॥
মদন মোহন গোরা নবদ্বীপ ইন্দু।
নবদ্বীপচন্দ্র, নব যুবতীর বন্ধু ॥
নদীয়ার পথে, পরিকর সাথে,
হাস্য পরিহাস রঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া
হেলে পরে রঙ্গে ঢঙ্গে ॥
নয়ানের শর, ক'রে জর জর,
অবলা পরাণ হরে।
পিরীতি সরসে, অঙ্গের বাতাসে,
লালসা সতত বাড়ে ॥
রমণী মোহন, হৃদয় রঞ্জন,
কিবা সে রসের ঠাম।

(১) গরতে—গর্তে। (২) হেলিয়া—হেলা করিয়া।

কহিতে না পারি, কহিলে খাঁকারি,
খাইনু সরম মান ॥
কি আর করিব, সকলি সহিব,
আমার বঁধুয়া গোরা।
নিধনের ধন, অন্ধের নয়ন,
পরশ রতন হারা ॥
যথায় থাকিব, হৃদয়ে রাখিব,
নয়নে থুইব সদা।
জীবনে মরনে, জনমে জনমে,
পুরাব সকল সাধা ॥
প্রেম ফাঁসি দিয়া, গৌরা বিনোদিয়া,
চরণে করিল দাসী।
আমি যে অবলা, হই কুলবালা,
লোকেতে করিবে হাসি ॥
মন্ত্র মহৌষধি, কিম্বা কোন সিদ্ধি,
আমারে করিল সই।
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
গোরা সহ বিলসই ॥
সব গেনু ভুলি, গৌর গৌর বুলি,
রসনায় সদা ঝরে।
আকাশে বাতাসে, গৌরময় ভাসে,
গৌরাঙ্গ হেরি যে কোরে ॥
গৌর প্রাণপতি, গৌর মোর গতি,
ধরম করম গোরা।
জপ তপ ধ্যান, প্রেম ভক্তি জ্ঞান,
গৌর হেরি বিশ্বভরা ॥
বৃক্ষে ফলে ফুলে, অনলে অনিলে,
পর্ব্বতে সাগরে রঙ্গে।
বসন্ত শিশিরে, চুম্বি বারে বারে,
খেলিছে সঙ্গিয়া সঙ্গে ॥

গৌর, বিশ্বম্ভর ত্রিভঙ্গ সুন্দর,
অধরে মুরলী বায়।
তরুলতা যত, প্রাণী হরষিত,
জাহ্নবী উজান যায়॥
জগত মজান, বাঁশীর সুতান,
রহিয়া রহিয়া উঠে।
অম্বরে অম্বরে, দিগদিগান্তরে,
বায়ুতে মিশিয়া ছোটে॥
পুরুষ যোষিত, জঙ্গমাদি কীট,
আকর্ষিল সর্ব্ব বিশ্ব।
বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ, কর আত্মসাথ,
যোগেন্দ্রের সরবস্ব॥

দীন—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন রায়

# শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী।

( ৫ )

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই অতীব চিত্ত-বিনোদন নৃত্যের বর্ণনা বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক মূলগ্রন্থ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

কখনও বা প্রভু দক্ষিণ দিকে স্বরূপের, বামদিকে বক্রেশ্বরের হস্ত ধরিয়া, দ্রুত পদে নৃত্য করিয়া, হাসিতে হাসিতে, একবার জগন্নাথের দিকে চাহিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন, আবার ঐরূপ নৃত্য করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, পশ্চাতে হটিয়া হাসিতেছেন। আবার প্রভু কখন বক্রেশ্বর ও স্বরূপকে ত্যাগ করিয়া, যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, অমনি কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া মুখ চুম্বন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, ক্রমে বৃন্দাবনের দিকে যাইতেছেন, আর প্রভু যতই বৃন্দাবনের নিকট যাইতেছেন, ততই আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন।

"প্রভুর হৃদয়ানন্দ সিন্ধু উথলিল
উন্মাদ ঝঞ্ঝার বায়ু তৎক্ষণে উঠিল।" ( চরিতামৃত )

"কাজেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোক-সমুদ্র আনন্দে পাগল হইল। এখন, রাধা ও কৃষ্ণে যে প্রেম-ভাব, ইহা লোকে হৃদয়ে কতক অনুভব করিতে পারে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ এবং শ্রীমতী নারী। কিন্তু এই যে প্রভু প্রেমে জর্জ্জরিভূত হইয়া স্বরূপ কি বক্রেশ্বরকে চুম্বন করিতেছেন, ইহা কি জাতীয় প্রেম, বহিরঙ্গ লোকে তাহা কিরূপে অনুভব করিবে? এই যে প্রভু মুখ চুম্বন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লোকের কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বোধ হইতেছে না, বরং লোকে উহা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইতেছে। তাই শাস্ত্র বলেন, গোপীপ্রেমে কাম গন্ধ নাই। অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ থাকিতে কৃষ্ণ প্রেম উদয় হয় না। অথবা কৃষ্ণ প্রেম উদয় হইলে হৃদরোগ কি কামরোগ দূরীভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম উদয় হইলে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ জ্ঞান লোপ হয়, অথচ স্ত্রী ও পুরুষে যে মধুর প্রেম উহা পরিবর্দ্ধিত হয়। এক শ্রীভগবান পুরুষ, আর সমুদায় প্রকৃতি, পরিণামে জীব মাত্রই গোপ-গোপী রূপে শ্রীভগবানের সহিত, মিলিত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের বক্রেশ্বরকে চুম্বন দ্বারা, শ্রীভগবানের জীবের সহিত এবং জীবের জীবের সহিত ও জীবের শ্রীভগবানের সহিত কত গাঢ় সম্বন্ধ, তাহা কতক অনুভব করা যাইতে পারে। যাঁহারা পরকীয়া প্রেমের কথা শুনিলে ক্লেশ পায়েন, তাঁহারা দেখিবেন যে, এই প্রেমে স্ত্রী পুরুষ জ্ঞান নাই।"—( অমিয় নিমাই চরিত )

"জগন্নাথ সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক নীলাচলবাসী যতজন॥
প্রভু নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণ প্রেমে উথলিল হৃদয় সভার॥
প্রেমে নাচেগায় লোক করে কোলাহল।
প্রভু নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেই শ্রীক্ষেত্রের রথের এত উৎসব। আর সে উৎসবের ক্ষীণ সাদৃশ এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রথের সম্মুখে প্রভু যে "বেড়া সঙ্কীর্ত্তন" সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেরূপ অদ্ভুত উৎসব কখনও জীবের নয়ন গোচর হয় নাই। ঐ সঙ্কীর্ত্তনে প্রভু ভক্তগণকে একত্র করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করিয়া দিতেন। ঐ অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তনেই বক্রেশ্বর নাচিতে নাচিতে প্রভুর চরণ ধরিয়া বলিয়াছিলেন—"হে চন্দ্রমুখ! আমার নৃত্যকালে গান করিবার জন্য দশ সহস্র গন্ধর্ব্ব নিযুক্ত করুন, তবেই আমার নৃত্য-সুখ হইবে।" ঐ সঙ্কীর্ত্তনের সম্প্রদায় বিভাগ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায় ১৩শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।—

"চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মার্দ্দঙ্গিক হৈল অষ্ট জন॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া
চারি সম্প্রদায়ে দিল গায়ন বাণ্টিয়া॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান।
আর পঞ্চ জন দিল তার পালিগান॥
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈতেরে তাঁহা নাচিতে আজ্ঞাদিল।
শ্রীবাস-প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান শুভানন্দ।
শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাহা গায়।
মুকুন্দ প্রধান কৈল তৃতীয় সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বল্লভ সেন আর দুইজন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আরসম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসু আর দুই সহোদর।
নৃত্য করে তাঁহা সুখে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
কুলীন গ্রামী এক কীর্ত্তন সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুরাচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাচে আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায়ে হয় অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায় বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥

* * *

এই ত কহিল প্রভুর মহা সংকীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল কীর্ত্তন।
ইহা যেই শুনে সেই গৌর চন্দ্রপায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেম ভক্তি হয়॥"

বক্রেশ্বর প্রমুখ ভক্তগণ-সহবাসে প্রভু এইরূপ নব নব রসের উদ্ভাবন করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদ করাইতে লাগিলেন। গৌড়ীয় গৃহীভক্তগণের শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহ জনিত দুঃখ এখন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে; যেহেতু তাঁহারা প্রতিবৎসর রথের সময় প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। কিন্তু তত্রাপি গৌরমণ্ডল ভূমিতে এমন অনেক ভক্ত বাস করেন যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে আসিতে পারেন নাই। শচীমাতা ও প্রভুর ঘরনি বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী ইঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহারা গৌরাঙ্গ বিহনে পাগলিনী হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন। আসুন কৃপাময় পাঠক, আমরা গৌরভক্ত প্রেমদাসের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া তৎকালীন নবদ্বীপবাসীর শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহ স্মরণ করি।

"নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাঁহা সবাকারে, কাঁদিয়া সুধায়, যত নবদ্বীপ বাসী॥

তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, যাহার নাম, তারে কি ভেটিয়াছ। ধ্রু ॥
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তনুখানি গোরা।
হরে কৃষ্ণ নাম, বলয়ে সঘনে, নয়নে গলয়ে ধারা ॥
কখন হাসন, কখন রোদন, কখন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা, শিমুলের কাঁটা, ঐছন সোনার গায় ॥
তারা বোলে আহা, দেখিয়াছি তাহা থাকেন সমুদ্রকূলে।
তেঁহ জগন্নাথ, আপনে সাক্ষাত, তাঁরে কে মানুষ বলে ॥
যেরূপ যেগুণ, যে নাট কীর্ত্তন, যে প্রেম বিকার দেখি।
হেন লয় মনে, তাঁহার চরণে, সদাই অন্তর রাখি ॥
গিয়া নীলাচল, ভাগ্যে সে ফলিল, দেখিনু চরণ তাঁর।
প্রেমদাস গায়, সেই গোরারায়, প্রাণ ইহা সবাকার॥"

সুদূরবর্ত্তী ভক্তগণের এই যে দিবানিশি আকুল ক্রন্দন, অতি বৃদ্ধা শচীমাতার এই যে উৎকট পুত্র বিরহ, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার এই যে উদ্ভ্রান্ত গৌরানুরাগ ইহা প্রতিক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গের কোমল অন্তঃকরণে জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছিল। তাই এক বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণ বিদায় লইয়া গমন করিলে পর তিনি শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপ ভূমি দর্শন করিবার জন্ম ব্যাকুল হইলেন।' প্রভু, বিজয়া দশমী দিবসে নীলাচল ভূমি ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলেন। এই সময়ে বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি তাঁহার নিয়ত সঙ্গী ভক্তগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

"প্রভুসঙ্গে পুরীগোসাঞি স্বরূপ দামোদর। গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর ॥
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর ॥ রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ প্রধান কহিল সবার কে করে গণন ॥"

এই সমস্ত শত শত ভক্তের সহিত শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনানন্দে দেশবাসীকে উন্মত্ত করিয়া প্রভু শনৈঃ শনৈঃ গৌড়ভূমি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা হালিসহর ( কুমারহট্ট ) গ্রামে আসিয়া বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে উঠিলেন। এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসী শ্রীভগবানকে দর্শন করিবার জন্ম আকুল হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকে এরূপ মহতী জনতার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তাদৃশ লোক-সংঘট্টের বার্ত্তা সৃষ্টির প্রাক্‌কাল হইতেও বোধ করি আর কুত্রাপি

শ্রবণ করা যায় নাই। এইরূপ লোক সংঘট্টের মধ্যে অবস্থান করা দুরূহ বিবেচনা করিয়া বক্রেশ্বর প্রমুখ ভক্তগণ প্রভুকে লইয়া গোপনে কুমারহট্ট ত্যাগ করিয়া কুলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

"আসি বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক সঙ্ঘট্ট হইলা॥
পঞ্চ দিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইল কুলিয়াগ্রাম॥"

কুলিয়ায় মাধব দাসের বাটীতে প্রভু উঠিয়াছিলেন। ইহা নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী কিন্তু এখানেও প্রভু স্থির হইতে পারেন নাই।

"কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈলা দরশন॥"

পরশমণি শ্রীগৌরাঙ্গ, চুম্বকের লৌহ আকর্ষণের ন্যায় ভক্তগণের হৃদয় ধরিয়া টানিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর রবে ব্রজের আভীর বালাগণ যেরূপ পাগলিনী পারা হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন লালসে ভক্তগণও সেইরূপই দশদিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে যিনি ব্যাসদেব রূপে অভিহিত সেই বৃন্দাবন দাস স্বয়ং বলিতেছেন,—

"কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন।
কেবল বর্ণিতে পারে সহস্র বদন॥"

এই স্থানে প্রভু যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারই একটী বর্ত্তমানে আমাদের বক্ষ্যমান প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত।

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা

# অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম।

## ( ৭ )

একবার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিবেন—প্রভুর ইহা অনেক দিনের বাসনা। কিন্তু এতদিন নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়াই তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথার

ভক্তগণ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ডাকাইয়া বলিলেন—"প্রভু অল্প দিন হইল দক্ষিণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আমি এখন পর্য্যন্ত যদিও তাহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি নাই, তথাচ তিনি যে এখানে অবস্থান করিতেছেন ইহাতেও আমার যথেষ্ট আনন্দ। কিন্তু তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়া গেলে আমি কোন ক্রমেই তিষ্ঠিতে পারিব না, এমন কি আমার প্রাণ ধারণ করাও অসম্ভব হইবে। তাঁহাকে ব্যতিত আমার এ ঐশ্বর্য্য সুখকর নহে। আপনারা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা হইতে বিরত করুন।

অবশ্য এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের চেষ্টা ছিল, এক্ষণে রাজার অনুনয়ে তাঁহারা এক যুক্তি স্থির করিলেন. কারণ প্রভুকে বাধা দেওয়া সম্ভব নহে। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা উত্তরে বিনীত ভাবে বলিলেন—প্রভু, আপনি ত যাইবেনই, আমাদের বাধা দিবার সাধ্য কি, তবে সম্মুখে রথ যাত্রা আসিতেছে আপনি না থাকিলে আমরা একটুও আনন্দ পাইব না। রথের উৎসব শেষ হইলে পর আপনি যাইবেন।

প্রভু সম্মত হইলেন, রথ যাত্রা সম্পন্ন হইলে আবার তাঁহারা বাধা দিলেন, বলিলেন প্রভু আপনিত যাইবেনই তবে সম্মুখে দারুণ বর্ষা, এ সময় আপনাকে ছাড়িয়া দিলে আমরা প্রাণে বড়ই ক্লেশ পাইব। পথে বনে জঙ্গলে কোথায় ভিজিতেছেন ভাবিয়া আমরা দুঃখিত থাকিব। কার্ত্তিক মাসে যাইবেন। তাহার পর কার্ত্তিক মাসে আবার তাঁহারা আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—প্রভু, এই দারুণ শীতে আপনি নগ্ন দেহে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইবেন ইহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না। শীতান্তে শুভ বসন্তে আপনি শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, এখন আমরা প্রাণ ধরিয়া আপনাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না।

প্রভু আর কি করিবেন, তিনি ত ভক্তবৎসল. তিনি ভক্তের বাক্য এড়াইয়া যাইতে পারিলেন না। এইরূপে যখন দুইবৎসর কাটিয়া গেল, তখন প্রভু বলিলেন—এই বার তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি শ্রীবৃন্দাবন ভূমি দর্শন করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি। তোমরা বাধা দিয়া দুই বৎসর কাটাইয়া দিলে, এখন সুখে অনুমতি দাও, তোমাদের অনুমতি ব্যতিত

আমি যাইতে পারিতেছিনা। আমি গৌড়ের পথে জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া যাইব মনে করিয়াছি।—

"গৌড়দেশে হয় মোর দুই আশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥"

ইহাতে আর তাঁহারা বাধা দিতে সাহস করিলেন না। তবে একান্ত বিনীত ভাবে বলিলেন—প্রভু, সম্মুখে বর্ষা, এই কয়টা মাস কাটাইয়া বিজয়া দশমীর দিন যাত্রা করিবেন। আমরা আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি আর বাধা দিব না। প্রভু ইহাতে স্বীকৃত হইলেন।

ক্রমে এই কয় মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। বিজয়া দশমী আসিতেছে, প্রভু চলিয়া যাইবেন। রামরায়ের মুখ আঁধার হইয়া যাইতেছে। কিন্তু আর উপায় নাই। রামানন্দের ন্যায় রাজা প্রতাপরুদ্রের এবং সার্ব্বভৌমেরও প্রাণ শুখাইয়া গিয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রভাতে জগন্নাথের আজ্ঞা লইয়া প্রভু যাত্রা করিলেন। প্রভুর অন্যান্য ভক্তগণের সহিত উড়িয়া ভক্তগণও প্রভুর অনুগমন করিলেন।

"অনন্তর নীলাচল লীলাকে বিদূরিত করতঃ ব্রজগমনরূপ লীলাই তাঁহার অভিপ্রেত হইল সুতরাং তন্নিমিত্তই মহাপ্রভু সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হইয়া সমস্ত ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন বিলাসে চঞ্চল মনা হইলেন। তথা অনুগামী ভক্তগণও যাহাতে সেই চঞ্চল মনা গৌরচন্দ্রকে ধরিতে পারা যায় তাদৃশ ভ্রমর গণের লীলা সমূহের ন্যায় বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন।" কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা তিনি একাকী যাইবেন। তিনি সকলকেই যাইতে নিষেধ করিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত, যাঁহারা তাঁহার নিষেধ মানিলেন না তাঁহারাই কেবল তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ দোলায় চড়িয়া ভবানীপুর নামক স্থানে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

পর দিবস মহাপ্রভু ভুবনেশ্বর পৌছিলেন। সঙ্গে রামানন্দ প্রভৃতি তখনও বহুতর ভক্ত রহিয়াছেন। প্রভু বলিতেছেন—"রামানন্দ, আর কেন, ফিরিয়া যাও, যদি কথা শুন, তবে পুনরায় আমি ফিরিয়া আসিব।" রামরায় তখন বিনীত ভাবে বলিতেছেন—প্রভু! আমি আপনার দাসানুদাস, আমার

সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে আপনার সঙ্গে লউন। প্রভু আর কি করিবেন, হাসিয়া অগ্রসর হইলেন।

ভুবনেশ্বরে রামানন্দ পূর্ব্ব হইতেই নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই গৃহে প্রভু, পরমানন্দপুরী ও রামানন্দ তিনজনে সুখে কৃষ্ণ-কথায় নিশি অতিবাহিত করিলেন।

তাহার পর তাঁহারা কটকে আসিলেন। এখানে গোপাল আছেন। প্রভু গোপাল দর্শন করিয়া রামানন্দের মনোহর বাসাবাড়ীর উদ্যানে এক সুবৃহৎ বকুল বৃক্ষ মূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এ দিকে রামানন্দ প্রতাপরুদ্রের নিকট গমন করিয়া বলিলেন যে, মহাপ্রভু ভোজন সমাপনান্তে এ অধমের উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছেন, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। প্রতাপরুদ্র শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি ব্যাকুলভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে রথের সময় প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সাহস করিয়া প্রভুর চরণে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। ভক্তের দৈন্য দেখিয়া ভক্তবৎসল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না তিনি প্রতাপ-রুদ্রকে উঠাইয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর নয়ন জলে প্রতাপরুদ্রের মস্তক সিঞ্চিত হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহা এইরূপ বর্ণিত আছে।—

"শুনিয়া আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল।
ধৌত করি পুলকাঙ্গ বহে অশ্রুজল॥
তার ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভুর কৃপাশ্রুতে তার দেহ হৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজারে বসাইল।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে শান্ত কৈল॥
ঐ যে তাঁহার কৃপা কৈল গৌর ধাম।
"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা" জগতে হৈল নাম॥

কটকের নিকটবর্ত্তী মহানদীর এক অংশ চিত্রোৎপলা নদী তটে (যে ঘাট পার হইয়া প্রভু বঙ্গদেশে গমন করিয়াছিলেন) এক স্মৃতিস্তম্ভ রোপন করেন। উহা বহুকাল পর্য্যন্ত মহাতীর্থ রূপে বিরাজিত ছিল। প্রতাপরুদ্র আদেশ দিয়াছিলেন, প্রভু ঐ ঘাটে স্নান করিয়া বঙ্গদেশে গমন করিয়াছেন, ঐ ঘাটে এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ কর এবং আমি যতদিন বাঁচিব ঐ মহাতীর্থ স্থানে স্নান করিব।

নদী পার হইয়া প্রভু চতুর্দ্বার নামক স্থানে আসিলেন, রাজার আদেশে রামানন্দ ঐ স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া সেবার বন্দোবস্ত করাইয়া রাখিয়া ছিলেন। পরদিন প্রভু যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ যাজপুরে আসিলেন। সঙ্গে তখনও বহুতর ভক্ত রহিয়াছেন। যথা,—রামরায়, হরিচন্দন, মঙ্গরাজ, ইহারা রাজার প্রেরিত। ইহা ছাড়া, স্বরূপ দামোদর, পুরী গোসাঞি, গোবিন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, হরিদাস ঠাকুর, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, গোপীনাথ আচার্য্য, দামোদর, রামাই, নন্দাই, প্রভৃতি বহুতর ভক্ত রহিয়াছেন।

যাজপুরে আসিয়া প্রভু হরিচন্দন ও মঙ্গরাজকে বিদায় দিলেন। রামরায় প্রভুর নিষেধ শুনিলেন না বলিলেন—প্রভু, তোমার সঙ্গে আসিয়া অতুলানন্দ ভোগ করিতেছি, আমাকে তোমার সঙ্গ সুখ হইতে বঞ্চিত করিও না। প্রভু বলিলেন, "তবে আরও কতকদূর চল, তোমার মুখে অমৃতের প্রস্রবন স্বরূপিণী কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিব।"

"এই মত চলি প্রভু রেমুণা আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দরায়ে বিদায় দিলা॥
ভূমিতে পড়িয়া রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করেন ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় কহন।
বলিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥"

রামানন্দ চেতন পাইয়া অতি কষ্টে নীলাচলে ফিরিয়া গেলেন। তিনি গৌর-গোবিন্দের চরণে মনোনিবিষ্ট করিয়া রহিলেন, বিষয় কর্ম্ম আর তাঁহার ভাল লাগিল না।

রামরায়কে বিদায় দিয়া মহাপ্রভু ক্রমশঃ গৌরদেশে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু এবারও তাঁহার নবদ্বীপ বা শ্রীবৃন্দাবন গমন ঘটিয়া উঠিল না। তিনি কানাই নাটশালা গ্রাম হইতে সনাতনের উপদেশ বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নীলাচল ফিরিয়া আসিয়া রামানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। কিছুকাল পরে এখান হইতে লোক সংঘট্টের ভয়ে রাত্রে গোপনে বনপথ ধরিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। রামানন্দ ও স্বরূপ অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণকে প্রভুর সমভিব্যাহারে দিয়াছিলেন।

প্রভুকে বিদায় দিয়া রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ জীবন্মৃত অবস্থায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন। অনেকদিন পরে সংবাদ আসিল, প্রভু ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন ভক্তগণের অবস্থা কিরূপ হইল শুনুন।

"শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলে যৈছে ইন্দ্রিয় উঠিলা॥"

প্রভুর আগমনে রামানন্দের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ সহবাসে মধুমাখা কৃষ্ণকথা আলাপনে দিবাযামিনী সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

# শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ।

## ( দ্বিতীয় ভাগ )

বন্দো নবদ্বীপচন্দ্র "দাদা" বলি খ্যাতি।
চরণ দাস বাবাজীর প্রিয়পাত্র অতি॥
("বৈষ্ণববন্দনা" হরিদাস গোস্বামীকৃত)

## ( শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের সহিত নবদ্বীপ দাদার প্রথম মিলন )

"শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামে—রাজেন বাবুর (শ্রীবাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের নাম, তখনও তিনি বাবু বেশেই ছিলেন) বাসার নিকটবর্ত্তী শ্রীনৃসিংহ দেবের আখড়ায় একটী যুবা পুরুষ; দেশস্থ কয়েকজন লোক সঙ্গে সস্ত্রীক শ্রীধামদর্শনে আসিয়াছেন। এই নবাগত যুবকের নাম শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস। তিনি শ্রীধামে

* "চরিতসুধা" গ্রন্থে শ্রীল নবদ্বীপদাদার যে সমুদয় কাহিনী বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে, এইবার আমরা সেগুলি একত্র করিয়া উদ্ধৃত করিব। এবিষয়ের অনুমতির জন্য পরম পূজনীয়া শ্রীমতী ললিতা দাসী দিদিঠাকুরাণীকে অনুরোধ করিলে তিনি আনন্দের সহিত উদ্ধৃত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়া আমাদিগকে বিশেষ ভাবে উপকৃত করিয়াছেন।

শ্রীদাদার পূর্ব্বাশ্রমের কাহিনী, আমাদের পরিচিত জনৈক ভদ্রলোক অবগত আছেন বলিয়া আমরা শ্রবণ করিয়াছি। অন্যান্য স্থানেরও সংগ্রহ করিতেছি; দাদার কৃপা হইলে ক্রমে ক্রমে সে সমুদয়ই ভক্তিতে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে পারিব বলিয়া আশাকরি।

বিশেষ আনন্দের সংবাদ "চরিতসুধা" গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ হইতেছে দেখিলাম। এইবার বিদেশীগণও চরিত সুধার আস্বাদ করিতে পারিবেন।

আসিবার ২।৩ দিন পরে একটী বৈষ্ণবী নবদ্বীপ বাবুকে একটী সুসমাচার দিলেন। তিনি বলিলেন,—"বাবা ঐ বাড়ীতে একটী বাবু আসিয়াছেন, তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন না বা কাহারও বাড়ীতে যান না; সর্ব্বদাই একখানি গ্রন্থ পাঠ করেন, আর দিবা নিশি অঝোর নয়নে ঝুরেন। তুমি যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর তবে চল।" নবদ্বীপবাবু ভক্তিমান নবীন যুবক ও অনুরাগী ভক্ত। তিনি ইহা শুনিয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন—"মা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখাইয়া আমাকে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখুন। এই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে, শীঘ্র চলুন।" মাতাজী নবদ্বীপবাবুর কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে ঐ বাড়ীটী দেখাইয়া দিলেন।

নবদ্বীপবাবু সেখানে যাইবামাত্রই আনন্দে বিহ্বল হইলেন। নবানুরাগের অদৃষ্ট চিত্র সেই মহাপুরুষকে দেখিবামাত্র চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় দুই জনে প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উভয়ের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। উভয়ের নয়নদ্বয়েই প্রেমাশ্রুর উৎস ফুটিয়া উঠিল। গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে উভয়েই বদ্ধ হইলেন। প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া উভয়েই ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এক একবার ভূমিতে পড়িতেছেন, আবার "জয় নিতাই" বলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। পরম গম্ভীর রাজেনবাবু আজ চপল চূড়ামণি। কতক্ষণ পরে হাতে তালি দিয়া উভয়ে কীর্ত্তন করিতে করিতে আলুথালু বেশে পথে বাহির হইলেন।

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে, সে-ই আমার প্রাণ রে॥"

এই ধুয়া ধরিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে উভয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু-দর্শনে ছুটিলেন। বেলা দুই প্রহর অতীত হইলে তাঁহারা পরিক্রমা করিয়া পরিশ্রান্ত ভাবে ধূলিধূসরিত অঙ্গে বাসায় ফিরিলেন। স্নানান্তে রাজেনবাবু স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলেন ও নবদ্বীপ বাবুকে প্রসাদ দিলেন। তাহার পরে আবার দুই জনেই শ্রীগ্রন্থ লইয়া পাঠে বসিলেন। পাঠারম্ভ মাত্রেই উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ ছুটিল। উভয়ের অঙ্গে অশ্রু-কম্প পুলকের উদ্গম হইল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এক একটী পয়ার পাঠ কালীন উভয়ে উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া প্রেমানন্দে কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিলেন, আবার কখন বা হাসিতে হাসিতে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া

পড়িতে লাগিলেন। গৃহে হাসি কান্নার প্রবাহ ছুটিল। উভয়ের এক প্রাণ, ভিন্ন ভিন্ন দেহ মাত্র। কি অপূর্ব্ব মিলন! কি শুভ দর্শন! একদিনের পরিচয়েই উভয়ে চিরজীবনের মত বন্ধু হইলেন।

নবদ্বীপবাবু সেদিন রাত্রিতে গৃহে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি সঙ্গী দিগের সহিত দেশে চলিয়া যাও, আমি আর বাড়ী যাইব না।" তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন;—"হাতে এত বড় চাকুরী, এত বড় সম্মান, কাহাকেও কিছু বলা নাই কহা নাই, একি কথা বলেন? আমরা কিরূপে ইহাঁকে (তাঁহার স্ত্রীকে) দেশে লইয়া যাই।" শেষে সকলে মিলিয়া নবদ্বীপবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করায় তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা রাজেন বাবুর নিকট এক সপ্তাহের বিদায় লইয়া দেশে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার মন-প্রাণ সকলই রাজেন বাবুর নিকট পড়িয়া রহিল। বিদায় কালীন করুণ দৃশ্য কেহ দেখিল না। নবদ্বীপ বাবু এই কার্য্যটী গোপনে গোপনেই সমাধা করিলেন।

নবদ্বীপ বাবুকে বিদায় দিয়া রাজেনবাবু আবার পূর্ব্ববৎ গম্ভীর হইলেন। তাঁহার মুখকান্তি ম্লান, অন্তরে বিষম দুঃখ! কোন একটী মূল্যবান বস্তু যেন তাঁহার হস্ত হইতে কেহ কাড়িয়া লইয়াছে। * * *

নবদ্বীপবাবু তাঁহার চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা মত সাত দিনের পরই নবদ্বীপে রাজেন বাবুর সহিত মিলিলেন। রাজেনবাবু তাঁহার হারানিধি পাইয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। উভয়ের মনে আবার পূর্ব্ববৎ আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। উভয়েই প্রেমানন্দে মগ্ন হইলেন। * * রাজেন বাবুকে গুরু-বুদ্ধিতে দর্শন করিতে গিয়াও কেহ তাঁহার সহিত দাদা ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি নবদ্বীপ বাবুর দাদা হইয়া উঠিলেন।

সেই হইতেই উভয়ের মিলন। সেই হইতেই নাম-প্রেম প্রচারের আরম্ভ। নদী আজ সাগর সঙ্গমে মিলিত হইয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিল।

## ( রথযাত্রা উৎসবে বাবাজী মহাশয় ও মর্ম্মসখা নবদ্বীপ দাদা! )

৺পুরীধামে রথযাত্রা উৎসবে শ্রীবাবাজী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে মহামত্ত হইয়া উঠিলেন। সাত্ত্বিক বিকারে তাঁহার দেহ জর জর হইল।—"গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে মুখে ফেণ উঠিতেছে—উৎকট বিরহোৎকণ্ঠা

ভরে ভূমিতে মুখ ঘর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভক্তগণ কাঁদিতে কাঁদিতে হস্ত দ্বারা নিবৃত্ত করিতেছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইলে পর বহু সন্তর্পণে অর্দ্ধ বাহ্যদশা লাভ করিয়া পার্শ্বস্থ প্রিয় সহচর নবদ্বীপ দাসের কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন ;—

কে মোর মরমী বটে কারে কব দুঃখ।
না হেরে গৌরাঙ্গচাঁদে বিদরয়ে বুক॥
কাহা স্বরূপ রামরায় কাহা নিত্যানন্দ।
কাহা শ্রীবাস গদাধর শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥
কাহা রূপ সনাতন মুরারী মুকুন্দ।
কাহা হরিদাস কাহা সেন শিবানন্দ॥
এই না রথের আগে লয়ে ভক্তগণ।
ভাবাবেশে গোরা কত করেন নর্ত্তন॥
সেই জগন্নাথ সেই রথের সাজনী।
কোথা লুকাইল মোর গোরা গুণমণি।
অনলে পশিমু কিংবা ভখিমু গরলে।
গৌরাঙ্গ বিরহে প্রাণ ত্যজিমু সলিলে॥
রসভরে গোরাচাঁদ দেখিনু নাচিতে।
হারাইনু হারানিধি দেখিতে দেখিতে॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়ে।
কি দিয়া গড়ল বিধি পাষাণ করিয়ে॥

আবার নীলাচলবাসী ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন,—

ওগো নীলাচলবাসী করি নিবেদন।
একবার দেখাও মোর পরাণ রতন॥
এবার পাইলে দেখা গোরা দ্বিজমণি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণি॥
কাঁহা করো কাঁহা যাও কহত আমারে।
না হেরি গৌরাঙ্গ চাঁদে পরাণ বিদরে॥

এই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তখন ভাবের ভাবুক কৌশলী নবদ্বীপ দাসের মনে হঠাৎ একটী ভাবের উদয় হইল, তিনি আবেশ ভরে বলিয়া উঠিলেন—

ঐ যে নাচিছে গোরা ভক্তগণ সাথে।
চলগো দেখিব মোরা রথের পশ্চাতে॥

এই কথা শুনিবামাত্র বাবাজী মহাশয় প্রেমানন্দে অধীর ভাবে নবদ্বীপ দাসকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক দৃঢ় প্রেম আলিঙ্গন দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন। ভাইরে ;—

কি ধন আমার আছে কিবা দিব তোরে।
গোরা-বিনিময়ে আজ কিনিলি আমারে॥

এই বলিয়া দুইজনে দ্রুত গতিতে রথের পশ্চাতে চলিলেন। তথায় যাইয়া কি দেখিলেন—তাহা উহাঁরাই জানেন। তখন প্রেমানন্দে দুইবাহু

তুলিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে রথ প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় যেমন রথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন অমনি রথ চলিতে আরম্ভ করিল। তখন পুনরায় কীর্ত্তন ধরিলেন—

আবেশে গৌরাঙ্গহরি স্বরূপেরে বলে।
কত না রূপেরছটা দেখ গো সকলে॥
আসিছেন প্রাণ বঁধু রথেতে চড়িয়া।
দেখনা চাহিয়া রূপ দেখনা চাহিয়া॥

কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
নটবর নাগর ত্রিভঙ্গিম বাঁকা॥
অরুণ কমল আঁখি ঢ়ুলি ঢ়ুলি চলে।
হেরিয়া মোহনরূপ পরাণ উছলে॥

( এইরূপে নর্ম্মসখা নবদ্বীপ দাদা অনেক সময়েই শ্রীলবাবাজী মহাশয়ের ভাব পুষ্টি করিতেন। )

## ( রেমুনা তীর্থে শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দিরে একদিন )

"আরতীর পর বাবাজী মহাশয় আনন্দে মাতিয়া শ্রীমন্দির প্রাঙ্গনে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সে স্থান লোকে লোকারণ্য হইল। সংকীর্ত্তনও জমাট বাঁধিল। কিছুক্ষণ কীর্ত্তনের পর অপূর্ব্ব রসের তরঙ্গ উঠিল। বাবাজী মহাশয় পদ ধরিলেন ;—

রসপুষ্টি হেতু সখী দু'দল হইল।
কেহ "রাধে জয়" কেহ "শ্যাম জয়" দিল॥
ললিতা বিশাখা দোঁহে দুই দলপতি।
দুহুঁ গুণ গাওত সখীর সংহতি॥

এই বলিয়া বাবাজী মহাশয় "শ্যাম জয় জয় রাধে" ধুয়া ধরিলেন। কাজেই ইঁহার প্রিয় নর্ম্ম সহচর নবদ্বীপ দাস প্রতিপক্ষ হইয়া "রাই জয় জয় রাধে রাধে।" গাহিতে লাগিলেন। দুইটী দল হইল, উপস্থিত ভক্তবৃন্দের অনেকেই নবদ্বীপ দাসের পক্ষ লইলেন। অতি অল্প সংখ্যক লোকই বাবাজী মহাশয়ের দলে যোগ দিলেন। সকলেই যেন আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন। দুই দলের লোক, এই আনন্দ উৎসবে পরস্পর পরস্পরকে পরাস্ত করিবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। এই আনন্দ কীর্ত্তনে লঘু গুরু ভেদাভেদ নাই। উভয় দলেরই জিগীষা প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। হঠাৎ শ্রীরাধা রাণীর পক্ষাবলম্বী

ললিতার আনুগত্যাভিমানী, প্রেমিক প্রবর নবদ্বীপ দাস নিজ পদে রাধারাণীর প্রাধান্য বর্ণনা আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

শুনগো বিশাখা, রাই রসবতী, বৃন্দাবন পাটরাণী।

বাবাজী মহাশয় তখনই প্রেমোন্মত্তভাবে উত্তর দিলেন ;—

শ্যামরূপ লাগি, দিবস রজনী, ভিখারিণী মোরা জানি॥

নবদ্বীপ—শ্যাম সোহাগিনী, রাধিকা রঙ্গিনী, রমণী মুকুটমণি।

বাবাজী—শ্যাম সুনাগর, নব নটবর, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি॥

নবদ্বীপ—সর্ব্বগুণ যুতা, বৃষভানুসুতা, রাই রাস-রসেশ্বরী।

বাবাজী—শোনগো ললিতা, রাস থাকে কোথা, বিনে শ্যাম বংশীধারী॥

নবদ্বীপ—নাই কি স্মরণ, সে দিনের কথা, মানিনী যবহুঁ ধনী।

চরণে পড়িয়া কত না সাধিল, তোর শ্যাম গুণমণি॥

বাবাজী—শোন্‌গো ললিতা, কি লাজের কথা, রমণী হইয়া নিজে।

অকারণ মানে, কত কাঁদাইল, রসিক নাগর রাজে॥

নবদ্বীপ—রমণী সমাজে, আবির কুঙ্কুম, পাশা জলকেলি আদি।

সে সব সময়ে, নাগর শেখর, হারিলেও নিরবধি॥

বাবাজী—শুনগো সজনী, হাম ভালে জানি, একেলা নাগর রায়।

শতেক রমণী, রাইয়ের সঙ্গিনী, কি আর পৌরুষ তায়॥

নবদ্বীপ—ব্রজ রমণী, গণ শিরোমণি, শ্যামকণ্ঠ হেমমণি।

শ্যাম জলধরে, নব সৌদামিনী, মহাভাব স্বরূপিণী॥

এইরূপে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রেমরস কলহ চলিতে লাগিল। কেহই পরাজয় মানিবার নহেন। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইতে চলিল, তবুও কেহ এই প্রেম-কীর্ত্তন হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না, হঠাৎ বাবাজী মহাশয় সমতাসূচক পদ ধরিলেন ;—

কানন দেবতী, আসি বৃন্দা তথি, বলে সহচরীগণে।

সম রাই কানু, কেহ নহে ঊনু, দুহু দুহু রূপে গুণে॥

বৃন্দাদেবী বাণী, শুনিয়া তখনি, সকলে একত্র হইল।

জয় রাধা রাধারমণ বলিয়া প্রেমে উনমত ভেল॥

তখন আর দলাদলি নাই সকলেরই মুখে কেবল "জয় রাধা রাধারমণ" এই এক বুলি। উপস্থিত সকলেই সেই উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনের ভাব-তরঙ্গে একেবারে ডুবিলেন। সে আনন্দ, সে প্রেম-বিহ্বল ভাব, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য,

ভাষায় বর্ণন করা যায় না। বলা বাহুল্য এ সমুদয় পদই উঁহাদের স্বরচিত। কীর্ত্তনের সময়ে উভয়েরই মুখে মুখে এরূপ কবিত্বপূর্ণ পদ বাহির হইত। কিন্তু সেরূপভাবে লিখিয়া রাখিবার কোন ব্যবস্থা না থাকাতে কত অমূল্য নিধি যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্ত্বা নাই।

## ( শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব )

এইরূপ ভাবে শ্রীনবদ্বীপ ধামে মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে হোরি-লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপ দাদা ও শ্রীবাবাজী মহাশয়ে কীর্ত্তন হইয়াছিল। নবদ্বীপদাদা শ্রীমতী ললিতা সখীর আবেশে গাহিলেন ,—

আমরি কি লাজের কথা শোন্ বিশাখা' ধনি।
নিতুই নিতুই খেলায় হারে নাগর শিরোমণি।

রসপুষ্টির মানসে যদি কেহ কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন, তবে তাঁহার প্রতিপক্ষ হওয়াই বাবাজী মহাশয়ের চিরন্তন স্বভাব। তাই—আজ বাবাজী মহাশয় বিশাখার পক্ষাবলম্বনে গাহিলেন ;—

নাই কি মনে ও ললিতে সেই সেদিনের কথা।
কুসুম চুরি কি ঝকমারি হ'য়ে ছিল তথা ॥
নবদ্বীপ—দিবানিশি রাইয়ের লাগি পাগল পারা শ্যাম।
গোঠে মাঠে বাঁশরীতে জপে রাধা নাম ॥
বাবাজী—ভট্ট মুখে নাম শুনে কে কাঁদে দিবানিশি।
শয়নে স্বপনে মনে ভাবে কালশশী॥
নবদ্বীপ—( হাঁগো ) রাই দেখিতে কদম্বতলায় কে করেছে থানা।
বাবাজী—সে যে রাইকে দেখা দিবার তরে করে আনাগোনা ॥
নবদ্বীপ—পাশা খেলায় কুণ্ডতীরে কে হারিল বল।
বাবাজী— একা নাগর পেয়ে সবাই করেছিলি ছল ॥
নবদ্বীপ—নাই কি মনে মানের দিনে কে ধরিল পায়।
বাবাজী— অধীর হ'য়ে তার পরে কে দূতীরে পাঠায় ॥
নবদ্বীপ— রাজকুমার কে নারীর দ্বারে করিল কোটালী।
বাবাজী—রাজকুমারীর মুক্তা চুরি সব কি পাশরিলি ॥
নবদ্বীপ—রাজার নন্দন বনে বনে কে ধেনু চরায়।
বাবাজী—( বল ) রাজনন্দিনী কোন রমণী দধি বিকে খায়।
নবদ্বীপ—নারীর বেশে যাবক লয়ে কে পরাণ পায়।
বাবাজী—রাজার মেয়ে কাহার তরে কাননে বেড়ায় ॥
নবদ্বীপ—সেজে বালা, গেঁথে মালা কে দিল গলায়।
বাবাজী—পর রমণী পরের ঘরে কে রাঁধিতে যায় ॥

নবদ্বীপ—( মোদের ) রাসেশ্বরীর পদতলে কে লিখিল নাম।
বাবাজী—( হাঁগা ) বাঁশী শুনে চিত্রপটে কে সঁপিল প্রাণ॥
নবদ্বীপ—মিছে গরব করিস্ না গো ও বিশাখা সখি।
শ্যাম মনোমোহিনী রাই সুধামুখী॥
বাবাজী—শোন্ ললিতা মরম কথা দুহুঁ রাই কানু।
রূপে গুণে কুলে মানে কেহ নহে উনু॥
শ্যামের বামে শ্যামসোহাগী দেখতে যেমন ভালো।
মেঘের কোলে সৌদামিনী জগৎ করে আলো॥
রাইয়ের গুণে শ্যামের আদর শ্যামের গুণে রাই।
ছাড়া ছাড়ি শ্যাম গৌরীর ঠিক আদর নাই॥
( আয় গো সখী ) শ্যাম সনে একাসনে বসাইয়া রাই।
প্রাণ খুলে সবে মিলে দুহুঁ গুণ গাই॥
কালোর কোলে কিবা শোভা কনক বরণী।
নবজলধরে যেন থির সৌদামিনী॥

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

# তিনটী প্রশ্ন

প্রথম প্রশ্ন :—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম - ১৪০৭ শক ফাল্গুনী পূর্ণিমা চন্দ্র-গ্রহণ। এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ফাল্গুন মাসের কোন তারিখ ও কি বার তাহা লইয়াই মতভেদ দেখিতে পাই। এ বিষয়ে সঠিক মীমাংসার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা—তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব জগতের একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।

( ক ) একখানি গ্রন্থে দেখিয়াছিলাম ;—প্রভুর জন্ম ১৪০৭শক ১৯এ ফাল্গুন শুক্রবার।

( খ ) আর একখানিতে দেখিয়াছিলাম—১৮ই ফাল্গুন শনিবার।

( গ ) শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক ১৩২৯ সাল ভাদ্র-আশ্বিন ২৩২ পৃষ্ঠায়। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত মহাশয়ের যে সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে আছে—

বাং ২৩এ ফাল্গুন শনিবার ১৪০৭ শক। ইংরাজি জুলিয়ান কেলেণ্ডার মতে (যাহা এখনও রুষিয়াতে প্রচলিত আছে) ইং ১৮ই ফেব্রুয়ারী—১৪৮৬ খৃঃ অঃ। গ্রেগরিয়ান কেলেণ্ডার মতে (যাহা বর্ত্তমানে প্রচলিত) ইং ২৭এ ফেব্রুয়ারী ১৭৮৬ খৃঃ অঃ।

মহম্মদী সন হিজরী—৮৯০—২রা শফর—

(ঘ) রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ইংরাজি ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খৃঃ অঃ।

(ঙ) কিন্তু "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় ১০ বর্ষ ২খণ্ড ৩সং ৩'৪ পৃষ্ঠায় ইং ১৯এ মার্চ্চ ১৪৮৬ খৃঃ অঃ।

(চ) প্রবাসী পত্রে ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৭২ পৃষ্ঠায় আছে বাং ২৫এ ফাল্গুন ১৪০৭ শক—ইং ১৯এ ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খৃঃ অঃ।

তাহা হইলে মতভেদে শুক্র এবং শনিবার হইতেছে এবং তারিখ ভিন্ন ভিন্ন মতে ১৮ই, ১৯এ ও ২৫এ ফাল্গুন হইতেছে। ইংরাজি তারিখেও মতভেদ হইল ১৮ই ১৯এ ও ২৭এ ফেব্রুয়ারী এবং ১৯ মার্চ্চ। (এটি সম্পূর্ণ ভুল বলিয়াই মনে হয়)

তারিখ সম্বন্ধে "শ্রীচৈতন্য সঙ্গীতা" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে আছে—(একখানি যে খুব প্রাচীন তাহা নহে)।

ফাল্গুনের দ্বাবিংশতি, পৌর্ণমাসী শুভ তিথি, তারা পুর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্র। অর্থাৎ ২২এ ফাল্গুন প্রভুর জন্ম।

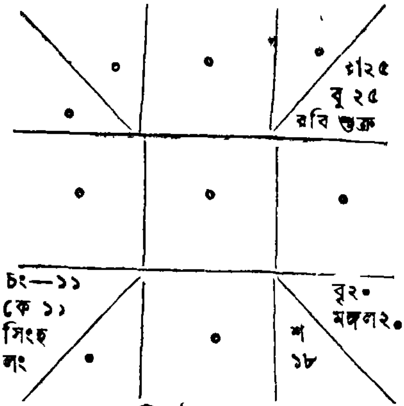
শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামীকৃত নবদ্বীপ লীলা গ্রন্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত একটী শ্লোক উদ্ধৃত আছে, তাহাতে—"ফাল্গুনে মাসি স ক্রান্তে ত্রয়বিংশতি বাসরে।" আছে ইহাতে ২৩এ ফাল্গুনই সম্ভব। শ্রীচৈতন্য সঙ্গীতা অপেক্ষা এই প্রমানই বেশী প্রামান্য। কিন্তু ঐ প্রমানের সম্বন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকের লেখক মহাশয় বলেন—(২৩৪ পৃঃ)—

"প্রভুপাদ হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে, তিনি উদ্ধৃত অংশ স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন ঘোষ কৃত "গৌরচন্দ্রিকা" (?) গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত অংশের মূল কোথায়, তাহা জানা নাই।"

যাহা হউক একণে ফাল্গুন মাসের কোন তারিখ ও কি বার তাহা সঠিক নির্ণয় জন্য পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট সবিনয় প্রার্থনা রহিল।

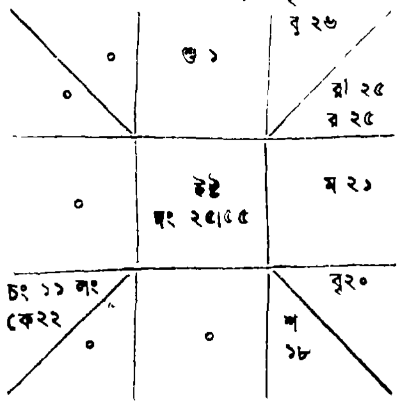
দ্বিতীয় প্রশ্ন :—রাশি চক্রে দেখিতে পাই—

ভারতবর্ষ—( ১৩২২ শ্রাবণ ৩২৮ পৃঃ ) আছে ,—



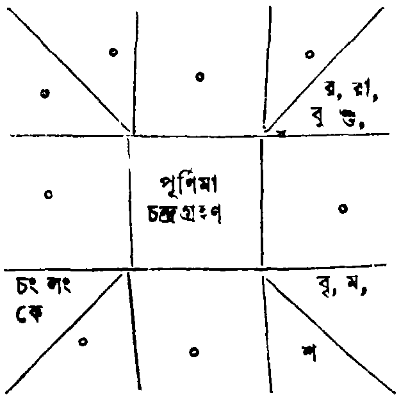

| | |
|---|---|
| চন্দ্র সিংহ— | ২১ অং |
| বুধ মীন— | ৬ |
| মঙ্গল— | ৭ |
| শনি বিছা— | ২১ |
| মুরে মাস ধনু—১৫ | |

( খ ) শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকে ( ঐ সংখ্যায় ) উদ্ধৃত ২টী চক্র আছে ১মটী—




কালনা এডিসন শ্রীচরিতামৃতের ৬৫ পৃঃ এইরূপই আছে।

( গ ) ৪১০ গৌঃ অঃ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় আছে ;—




ইহার মীমাংসা কি ?

শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক ১২বর্ষ ভাদ্র-আশ্বিন ২৩২ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত লিখিত "শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিন" শীর্ষক প্রবন্ধটী ভক্তগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তৃতীয় প্রশ্ন:—মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে। প্রভুর তিরোভাব সন ১৪৫৫ আষাঢ় মাস এবং ইংরাজি ১৫৩৩ খৃঃ অঃ জুন মাস ইহাতে কোন মতভেদ নাই।

(ক) জয়ানন্দ কৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল—১৫০ পৃষ্ঠায়—আছে; "আষাঢ় শুক্লা সপ্তমীতে" (রবিবার) প্রভুর তিরোধান।

এ বিষয়ে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়—(২ বর্ষ ৭২ পৃঃ) বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জয়ানন্দের লিখিত ৭মী তিথি হইতেই পারে না। কারণ ১৪৫৫ শকে সৌর ১লা বৈশাখ শুক্রবার তৃতীয়া।

" সৌর ৩রা আষাঢ় রবিবার শুক্ল অষ্টমী।

" সৌর ১৭ই আষাঢ় রবিবার কৃষ্ণা অষ্টমী।

" সৌর ৩১শে আষাঢ় রবিবার শুক্লা অষ্টমী ৪৯৷৪১ পল।

যদি চান্দ্র আষাঢ় ধরা হয় তবে ১৪ই শ্রাবণ রবিবার কৃষ্ণা সপ্তমী ৫০৷৫৩ পল।

(মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রথযাত্রার মধ্যে। যখন জগন্নাথ দেব গুণ্ডিচা মন্দিরে অবস্থান করিতে ছিলেন তখন।)

কিন্তু চান্দ্র আষাঢ় হিসাবে ১৪ই শ্রাবণ রবিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি হওয়াতে জগন্নাথদেব কখনই গুণ্ডিচা মন্দিরে থাকিতে পারেন না। (তাই লেখকের মতে) ৩১ আষাঢ় রবিবার শুক্লা অষ্টমীতেই প্রভুর অন্তর্ধান সম্ভব।

মাস এবং রবিবার ঠিক। কিন্তু জয়ানন্দের মতে শুক্লা ৭মী নহে—উহা লিপিকারের ভুল বলিয়া মনে হয়।

(খ) কাহারও মতে ৩রা আষাঢ় রবিবার প্রভুর অন্তর্ধান।

(গ) প্রবাসী পত্রে আছে—(১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ—১৭২ পৃঃ) ১৪৫৫ শক × আষাঢ়—শুক্লা ৮মী তিথি ইংরাজি—১৫৩৩ খৃঃ ২৭ জুন।

এ বিষয়েও পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট মীমাংসার প্রার্থনা করি। আশা করি পণ্ডিতগণ কৃপা করিয়া "ভক্তি" পত্রিকাতে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব জগতের উপকার করিবেন।

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

# ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

[ ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৩১ সাল

## প্রার্থনা

"( হরি ) কি দোষে মজালে কেন হ'রে নিলে
হৃদয় হইতে প্রেমরত্ন সার।
প্রেমশূন্য প্রাণ মরুভূ সমান
দেখনা কি দশা হ'য়েছে আমার॥
নামে নাই রুচি হ'য়েছি অশুচি
যাতনার বিষে হ'তেছি দাহন।
কিহ'ল কিহ'ল সকলি ফুরাল
কে আছে অভাগা আমার মতন॥"

প্রভো! জানিনা জন্মজন্মান্তরের কোন্ কুকর্ম্মের ফলে এমন করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইতেছে। কোন দুষ্কর্ম্মের ফলে যে, প্রেমধনে বঞ্চিত হইয়া দিবানিশি এমন করিয়া অশান্তি ভোগ করিতেছি ভাবিয়াও তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। তবে আমার স্বকৃত কর্ম্মের ফলেই যে এরূপ হইতেছে তাহা স্বীকার না করিয়াও পারি না। কিন্তু যাহাই হউক বেদনার শান্তিদাতা ত তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই; জন্মজন্মান্তরের কর্ম্ম-ফলে এ জন্মে এত যাতনা ভোগ করিতেছি কিন্তু তথাপিও এজন্মে এমন কোন সাধন ভজন করিতেছি না যাহার বলে পরজন্মেও কিছুমাত্র শান্তি

পাইতে পারে। তোমার ভালবাসার অন্ত নাই, সিন্ধু হইতেও তোমার ভালবাসা অনন্ত। কিন্তু তথাপিও মন ত তোমার নাম-গুণ গানে মত্ত হইতেছে না। দিবারাত্র অসৎ সঙ্গে বিষয়রূপ বিষমবিষের সেবায় রত থাকিয়া মনুষ্যত্ব একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছি; এমন একটা গুণও নাই যে গুণের দ্বারা তোমার কৃপা লাভের জন্য কিছু মাত্রও দাবী করিতে পারি। এমতাবস্থায় আমার উপায় কি? যাহাদের লইয়া আমার ঘরকন্না তাহাদের নিকটে সৎপরামর্শ লাভ করিয়া সৎপথে চালিত হইবার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। সুখ পাইব বলিয়া, শীতল হইব ভাবিয়া যাহাকেই আপন মনে করি সে-ই আমাকে দুঃখের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া আমার ভালবাসার প্রতি-দান দেয়। এমতাবস্থায় আমার বেদনা কাহাকে জানাই, কার কাছে গেলে আমার অশান্তি অনলের দাহন নিবৃত্তি হইবে, কে আমাকে শান্তি দান করিবে। জ্বলিয়া পুড়িয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে একমাত্র তোমার কৃপা ভিন্ন যে শান্তিলাভের কোন আশা নাই তাহা বেশ অনুভব হইয়াছে। হে অকিঞ্চনবন্ধো! দীনহীনকে তোমার পরম শান্তিপ্রদ প্রেম-সাগরে ডুবাইয়া রাখ, আমার যত কিছু জ্বালা যন্ত্রণা সব প্রেম সাগরের শীতল বারিস্পর্শে জুড়াইয়া যাউক, আমি প্রেমানন্দে প্রাণ খুলিয়া বলিতে থাকি—

"তোমার মতন এমন আপন ভুবন মাঝারে নাই আমার।
ওহে জীবনবল্লভ! (নাথ) তুমি আমার আমিও তোমার॥"

# বিশ্বরূপের সঙ্গীত

## (২১)

৩৬।— করুণা ছল ছল দুটী নয়নে।
ঐ যায়—অবধূতরায়,
কাতরে ফিরিয়া চায় পতিত দুর্গতি পানে॥
স্বয়ং অনন্ত যেই রোহিণী নন্দন রাম
পতিতে তারিতে অবতীর্ণ সেই গুণধাম
ব্রজের বলাই—নিতাই—ঐ যায় ভাই
(ওরে) প্রেমেতে পাগল জীবে ধন্য করে প্রেমদানে॥

মথিয়া সে চারিবেদ—পুরাণাদিতন্ত্র
কলিতে বিধান কৈল্পা ( হরি ) নামমহামন্ত্র
( তাই ) চাঁদ বদনে—সঘনে—যতনে
হরিনাম বিলায়ে যায় ঐ. সুরধুনী পুলিনে ॥
কৃষ্ণভুলি মত্তজীব বিষয় অনর্থে
দিনবার নাহি পায় প্রেমপরমার্থে
( বুঝি ) তাইতে এমন—জগজন—উদ্ধারিতে মন
( জীবেবড় ) ভালবাসে তাই দায় ঠেকিয়াছে আপনে ॥
যুগে যুগে কতবার হন অবতীর্ণ
হরিতে বিশ্বের ভার স্থাপিতে স্বধর্ম্ম
এলরে এবার—ধরাপর—গৌরাঙ্গ আমার
( নিতাই ) এ বার্ত্তা শুনায়ে যায় কলিহত জীবগণে ॥
ছুটে আয় কে কোথায় পণ্ডিত পাষণ্ড
দুঃখীতাপী অপরাধী অসৎ কি ভণ্ড
যে হোস্ যেমন—দুর্জ্জন—শুদ্ধ হবে মন
( নিতাই ) শুনায়ে অভয়বাণী আশ্বাসেন জনে জনে ॥
( বলে ) হবে নিত্য নবখেলা নবলীলা রঙ্গ
ব'বে চির-অনর্পিত রসের তরঙ্গ
কেঁদে কাঁদাবে—নাচাবে—প্রেমে মাতাবে
এ বিশ্ব হইবে ধন্য রাধা প্রেম আস্বাদনে।

সম্পাদক

# শ্রীচৈতন্য ভাগবত

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥"

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই মহামঙ্গলময়ী বাণী যখনই স্মরণ হয় তখনই বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের অপরিসীম প্রেম-মাহাত্ম্যে হৃদয়-মন নাচিয়া উঠে, প্রাণে অপরিসীম বল অনুভূত হয়। ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠেন, "ভয় কি, অগ্রসর হও, বাঙ্গালীর প্রেমে জগৎ মাতিবে।" একদিন বাঙ্গালীর

প্রেমে পশুপক্ষী মাতিয়াছিল। বন্যহস্তীগুলি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্র স্বীয় স্বভাব ভুলিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া হরিণ হরিণীর সহিত খেলা করিয়াছিল। আর মানুষের কথা কি? জগাই মাধাইর মতন, দস্যু নৌরজীর মতন মহা পাষণ্ড, আর বাংলা, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর পশ্চিম ভারতের মত বিদ্যা, কুল, ধন, মানের উচ্চ পাহাড়গুলি সেই প্রেম পুরুষের চরণধূলির স্পর্শ পাইবার জন্য ধুলায় গড়াগড়ি দিয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব যাদুকর কি এক মোহন মন্ত্রবলে ভারতের ধূলি প্রেমধূলিতে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই ধূলিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই প্রেমপুরুষের মঙ্গলময়ী বাণী স্মরণ করিয়া যদি আজ কেহ এই বিষম জাতীয় সর্ব্ববিধ বিপ্লবের দিনেও তাঁহারই নামে প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। আজ সেই প্রেম পুরুষেরই অণুমাত্র কৃপার লোভে তাঁহারই প্রসূতি লীলাস্থলী শ্রীনবদ্বীপ ভূমিকে প্রণাম করি, সেই প্রেমনাট্যরঙ্গস্থল শ্রীবাসআঙ্গিনাকে প্রণাম করি। জননী জাহ্নবী, যিনি সে লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করি। অগণিত ভক্তবৃন্দ, যাঁহারা সে ভুবন ব্যাপী লীলায় সহচর ও সহচরী ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি, আর তাঁহার সে মধুময়ী লীলাগাথক যিনি জন্মাবধি শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপারই নিদর্শন, ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও তাঁহার পরম ভাগবতী লীলাগাথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতের শরণাপন্ন হই।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঙ্গালীর মাতৃভাষার আদি মহাকাব্য গ্রন্থ। বাঙ্গালা-ভাষার আদি মহাশিক্ষক। ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাতে বাঙ্গালী হৃদয়ের পূর্ণতম আদর্শ প্রেমপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবন পাবনী মধুময়ী লীলা মধুময় অক্ষরে সংনিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার পাঠ ও শ্রবণে হৃদয় নির্ম্মল হয়, ভাবরস উথলিয়া উঠে। "গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।" পূজ্যপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য অনুভূত হয়। গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কেন, সমগ্র ভারতের প্রণম্য। যেহেতু তাঁহার অমর তুলিতে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালী এই হৃদয় দেবতার অমৃত ময় ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের নামান্তর (আদি নাম) শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। বাঙ্গালীর অন্যতম মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এইরূপে তাঁহার গ্রন্থারম্ভে শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন—

"অরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈলা চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিবে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার॥"

মনুষ্য এমন গ্রন্থ রচনা করিতে পারে না, ইহাই এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পরম দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে করিতে—যখন এই গ্রন্থের যথার্থ আস্বাদ উপলব্ধি হয়, তখন কি যেন এক অপ্রাকৃত মধুময় রসে প্রাণ মন ভরিয়া যায়। উহা প্রকাশের ভাষা নাই। বলি বলি করিয়াও যেন এক অব্যক্ত মধুর বেদনা প্রাণকে আকুল করিয়া তোলে। জগতে দেখিতে পাই, মানুষ স্বভাবতঃ ঐহিক সুখে মত্ত। মানুষ বিষয় রসে, ধন জন কামিনী কাঞ্চন রসেই সুখ পায়। তাহাতেই আনন্দ অনুভব করিতে শিখে। অপ্রাকৃত প্রেমরস কি তাহা তাহার ভাবনা ও অনুভবের বাহিরে। প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তময় অন্ধকার রজনীতে ক্ষণিক বিদ্যুৎ যেমন ঝলসিয়া উঠে—এবং তাহাতে ভীত চমকিত পথিক অতি কষ্টে কোন প্রকারে স্বীয় গন্তব্য পথ দেখিয়া লয়, এই মহা কষ্টকর জীবন পথেও অনেক ঝটিকার ভিতর দিয়া তেমনই করিয়া অনেকের পথ দেখিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই শিক্ষা এই পথ দেখিয়া লওয়া বড় ভীষণ, বড়ই ভয়াবহ। শ্রীচৈতন্য ভাগবত এই জীবন মহারজনীর এই ভীষণতা দূরীভূত করিয়া উহাকে পরমানন্দ-

ময় মধুর চাঁদিনী রজনীতে পরিণত করিবার জন্য সমুদিত। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মহিমা কথঞ্চিত পরিব্যক্ত করিতে ইহাই বলিতে হয় যে, বর্ষার সমগ্র মেঘ অপসারিত করিয়া নির্ম্মল শারদ গগনে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া দশদিকে সুধাধারা বিতরণে তাপ হরণ করতঃ যেমন জগৎকে আহ্লাদিত করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থসুধাকরও তেমনি ভাবে সমুদিত হইয়া জীবের যাবতীয় সমস্যা ও তাপ হরণ করিয়া প্রেম সুধা বিতরণে তাহাকে কৃত কৃতার্থ করেন। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র শুধু বাহিরের তাপ হরণ করেন, আর এই গ্রন্থ সুধাকর জীবের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় হরণ করিয়া তাহাকে অপ্রাকৃত চিন্ময় রসে নিমজ্জিত করেন।

যথার্থই এই গ্রন্থপাঠে পরিপূর্ণ প্রেমশশধর শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরা দেন, তাঁহার নির্ম্মল প্রেমে সাধকের চিত্ত মন ডুবিয়া যায়। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়, এই গ্রন্থের কৃপায় চিত্ত নির্ম্মল হয়। অপ্রাকৃত ভাগবত-তত্ত্ব হৃদয়ে জাগ্রত হয়। সাধকের যাবতীয় সমস্যা সন্দেহ দূরীভূত হয়। উপনিষদের ভাষায় "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" এই কথাই বলিতে হয়।

সেই পরাবর পুরুষ রতনকে দর্শন করিলে যা হয়—তাহার হৃদয়ের গ্রন্থি খুলিয়া যায়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, কর্ম্মবন্ধন এককালে ক্ষয় হইয়া যায়। আর কি হয়?—মায়ার দাসত্ব চিরকালের জন্য ঘুচিয়া অমৃতময় ভগবৎ প্রেমরসের আস্বাদে জীব উন্মাদ হইয়া পড়ে। জীব পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম রত্নের সন্ধান পাইয়া কৃতকৃতার্থ হয়। এ অবস্থা নাকি দেবতারও আরাধ্য, ভব বিরিঞ্চিরাও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

যখন দেখিতে পাই যিনিই এই গ্রন্থ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পাঠ ও অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনিই যথার্থতঃ জুড়াইয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, মধুর প্রেমরস উথলিয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ দেশ নায়ক রাজনৈতিক সুক্ষ্মধী শিশির কুমার ইহারই স্পর্শে পাগল হইয়াছিলেন; শুধু অপরের কথা নহে, যখন দেখি আমার মতন পাষাণ হৃদয়ও ইহারই স্পর্শে দ্রবীভূত হয়, তখনই, "মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য" এই মহাজন বাক্যে দৃঢ় আস্থা জন্মে এবং ভগবৎকৃপায় প্রণোদিত হইয়াই যে গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আর কোনরূপ সন্দেহই থাকে না। পরম ভাগবতগণ বলিয়া থাকেন, ইহার ছত্রে ছত্রে, পত্রে পত্রে, প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ভগবৎকৃপা সিঞ্চিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থের সেবা করিলে সেই কৃপা

লাভ হয়। শ্রীচৈতন্য লীলায়—ইহা অমৃতময় ভাগবত। এইজন্য এই মহাগ্রন্থের সর্ব্ব পরিচিত নাম শ্রীচৈতন্যভাগবত। আর শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যখন ব্যাসদেবের অবতার বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে চির পূজিত। কৃপাবতার শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে তাঁহার পরম কৃপাপাত্র গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গে পরম প্রেমাবিষ্ট হইয়াই যে গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বীয়—লেখনী মুখে এইরূপে প্রকাশ—

"অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
চৈতন্য চরিত্র আদি অন্ত নাহি দেখি।
যেন মত দেন শক্তি তেন মত লেখি॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে খেলায়॥"

গভীর আবিষ্ট অবস্থা ব্যতীত এই ভাব হয় না। জগতের যাবতীয় মহাগ্রন্থ সমূহই এই ভাবে লিখিত হইয়াছে।

এইরূপে এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর স্বীয় ভাষায় রচিত অপূর্ব্ব ধর্ম্ম মহাগ্রন্থ, আর যদি সাহিত্যের দিক দিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা বিশুদ্ধ প্রেম রসময়—বাঙ্গলার আদি মহাকাব্য সাহিত্য। সত্যং শিবং সুন্দরং এই ঘনীভূত পরম বস্তুটিকে মধ্যকেন্দ্র করিয়া ভাষার লহরীতে কিরূপে ভাব সমূহে প্রকটিত করিতে পারা যায়, বাঙ্গালীর পরম পূত মাতৃবাণীর সুমধুর বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া কিরূপে পরিপূর্ণ প্রেম ধীরে ধীরে মূর্ত্ত হইয়া উঠেন ও স্বীয় রূপের আলো ছড়াইয়া সাধকের সমগ্র হৃদয় খানি জুড়িয়া বইসেন, আর বিশুদ্ধ নব নব রসের উদ্গমে তাহার প্রাণ অভিভূত করিয়া ফেলেন, এই মহাগ্রন্থের অমৃতময়ী বাণী দ্বারা তাহাই সপ্রমাণিত হইয়াছে! এই হিসাবে গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের আদিগুরু, বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের চির প্রণম্য বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

আর ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ইহা প্রাচীন বাঙ্গলার একখানি অমূল্য সামাজিক ইতিহাস। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতির ভাষা, ভাব, ভাবনা, সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ প্রণালী ইহা পাঠে উত্তম রূপে অবগত হইতে পারা যায়। প্রাচীন বাঙ্গালী হিন্দুর ধ্যান, জ্ঞান, আদর্শ ইহাতে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারেই

এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর চির প্রণম্য। বাঙ্গালী হৃদয়ের চির আদরনীয় বস্তু। সর্ব্বোপরি, ইহা বাঙ্গালীর গৌরবময় অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের জীবন-চিত্র। বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি। এক দিন উহা সমগ্র জগৎকে বিমুগ্ধ করিবে। আমরা ভূয়োভূয়ঃ ইহাকে প্রণাম করি।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ঘোষ, ভক্তিবিনোদ।

# শ্রীশ্রীতুলসী স্তোত্র

( পরিব্রাজক 'ভুলুয়া বাবা' লিখিত। )

তুলনাতীতা তুলসীরাণী ত্রিতাপে লোকতারিণী।
ত্রিলোকমান্যা স্বগুণেধন্যা অঘজঘন্য কারিণী॥
সাধন শূণ্যে পুণ্যদায়িনী দীনের দৈন্যহারিণী।
শরণাগত ভয় ভঞ্জিনী ভকত হৃদয় রঞ্জিনী॥
বিষ্ণু মোহিনী জিষ্ণু রোহিণী বিষয়তৃষ্ণা তারিণী।
পরমেশ্বরী মাধবপ্রিয়া মাধব পদ চারিণী॥
শ্রীনারায়ণী শ্রীসনাতনী শ্রীসুরধুনী রূপিণী।
শ্রীবৃন্দারাণী শ্রীবৃন্দাবনে পরমানন্দ দায়িনী॥
শ্রীজনার্দ্দন ভোগ বাসিনী ছাপ্পান ভোগরঞ্জিনী।
বৈষ্ণবজন মন তোষিণী 'ভুলুয়া' ভাবনাহারিণী॥

# একটী গান

কর বা না কর তুমি করুণা।
আমি যা ধরেছি চরণ আর তাহা ছাড়িব না॥
যদি না করুণা কর হে করুণাকর নাথ,
চরণে শরণাগতে নাহি কর দৃষ্টিপাত
( যদি ) নিতান্ত সহিতে হয় যাতনা ;—
সহিব তাহাতে আর—
ভয় কি আছে আমার—
কাঙ্গালে দুঃখের ভয় করে না॥

মরিতে যখন হবে কৃষ্ণবলি মরিব
শমন ধরিতে এলে চরণ জোরে ধরিব
দেখিব তখন কি হয় ঘটনা ;—
( তখন ) যম জিতিলে পরে
এ বিপুল বিশ্বো পরে
নামের গৌরব এত রবে না ॥
এবার হ'য়েছি যা অনুগত অনুগতই রহিব,
আমার ধরম আমি কিছুতে না ছাড়িব,
দেখিব তোমার কি বিবেচনা ;—
'ভুলুয়া' ভণয়ে যারা
দীনবন্ধু বলে, তারা
বিচার করিবে তোমার মহিমা ॥

শ্রীভুলুয়া।

# শ্রীবৈষ্ণব ইতিহাস

( শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রকট কাল। )

( গত সহস্র বৎসরের শ্রীবৈষ্ণব ইতিহাস সঙ্কলন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহ হইতে আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করা হইতেছে এবং সে গুলির যথাসম্ভব অভ্রান্তভাবে কাল নির্ণয় করিবার জন্য বৈষ্ণব জগতে প্রকাশিত করা হইতেছে। বৈষ্ণব মণ্ডলের চরণ প্রান্তে আমার করযোড়ে নিবেদন—ভুলভ্রান্তি গুলি সরলভাবে সমালোচনা ও উপদেশের সহিত—আমার নিম্ন ঠিকানায় পত্রে অথবা চরণধূলি দিয়া আমাকে জানাইলে কৃতার্থ হইব। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু পরিকর ও ভক্ত মণ্ডলীর বংশধর দিগের নিকট নিবেদন,—তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জীবনী সংক্রান্ত কোন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ও তাহার সময় তাঁহাদিগের জানা থাকিলে তাহা পাঠাইলে শ্রীবৈষ্ণব ইতিহাসে সন্নিবেশিত করা হইবে। সংবাদাদি পাঠাইবার ঠিকানা :—শ্রীমুরারিলাল অধিকারী, ১২ এক্, মুসলমান পাড়া লেন, কলিকাতা। ) বর্ত্তমান প্রবন্ধে ১৪০৭ শকাব্দা হইতে বিবরণ উল্লেখ করা হইল।

| শকাব্দা | | খৃষ্টাব্দ |
|---|---|---|
| ১৪০৭ | ( ফাল্গুনী পূর্ণিমা চন্দ্রগ্রহণ ) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব | ১৪৮৬ |
| ১৪০৯ | ( বৈশাখী অমাবস্যা ) শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব | ১৪৮৭ |
| ১৪০৯ | লাউড়ীয়া কৃষ্ণদাসের "বাল্যলীলা সূত্র" রচনা | ১৪৮৭ |
| ১৪১০ | শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোপাল মূর্ত্তি আবিষ্কার | ১৪৮৮ |
| ১৪১০ | শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামীর আবির্ভাব | ১৪৮৮ |
| ১৪১০ | ( বৈশাখী পঞ্চমী ) শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতার আবির্ভাব | ১৪৮৮ |
| ১৪১১ | শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর আবির্ভাব | ১৪৮৯ |
| ১৪১৩ | ( শীতকাল ) শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ ও লোকনাথের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস | ১৪৯১ |
| ১৪১৪ | গোপাল কমলাকর পিপ্পলাইএর আবির্ভাব | ১৪৯২ |
| ১৪১৪ | গোপাল মহেশপণ্ডিতের আবির্ভাব | ১৪৯২ |
| ১৪১৪ | অদ্বৈত প্রকাশ প্রণেতা ঈশান নাগরের জন্ম | ১৪৯২ |
| ১৪১৪ | অদ্বৈত প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দের জন্ম | ১৪৯২ |
| ১৪১৫ | শ্রীশ্রীবিশ্বরূপের পাণ্ডুপুরে দেহত্যাগ | ১৪৯৩ |
| ১৪১৬ | শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপনয়ন | ১৪৯৪ |
| ১৪১৬ | ( চৈত্রপূর্ণিমা ) শ্রীশ্রীবংশীবদন ঠাকুরের আবির্ভাব | ১৪৯৫ |
| ১৪১৭ | ( মাঘী শুক্লাপঞ্চমী ) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব | ১৪৯৬ |
| ১৪১৮ | শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব | ১৪৯৬ |
| ১৪১৮ | শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর পিতৃবিয়োগ | ১৪৯৬ |
| ১৪১৯ | ঈশানসহ তদীয় জননীর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ | ১৪৯৭ |
| ১৪২০ | শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নবদ্বীপে মাতুলালয়ে আগমন | ১৪৯৮ |
| ১৪২০ | উপগোপাল কাশীশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব | ১৪৯৮ |
| ১৪২০ | শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব | ১৪৯৮ |
| ১৪২০ | সন্ন্যাসিনী শ্রীমীরাবাইএর জন্ম | ১৪৯৮ |
| ১৪২১ | শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যাকরণের টিপ্পনী প্রণয়ন | ১৪৯৯ |
| ১৪২২ | শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায়শাস্ত্রের টিপ্পনী লিখন ও রঘুনাথের অনুরোধে উহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ | ১৫০০ |
| ১৪২২ | শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব | ১৫০০ |
| ১৪২২ | বাদশাহ সেকেন্দার লোদীর মথুরামণ্ডলের সমস্ত মন্দির ধ্বংশ করিয়া তদুপরি কসাইএর দোকান স্থাপন | ১৫০০ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৪২৩ | শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল স্থাপন | ১৫০১ |
| ১৪২৩ | শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম বিবাহ | ১৫০১ |
| ১৪২৩ | শ্রীশ্রীপাদঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপ আগমন | ১৫০১ |
| ১৪২৪ | শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বায়ুরোগ | ১৫০২ |
| ১৪২৪ | রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীহিত হরিবংশের আবির্ভাব | ১৫০২ |
| ১৪২৫ | পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীতপন মিশ্র-মিলন ও তাঁহাকে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ | ১৫০৩ |
| ১৪২৫ | শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার দেহত্যাগ | ১৫০৩ |
| ১৪২৫ | শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপে প্রত্যাগমন | ১৫০৩ |
| ১৪২৬ | (গ্রীষ্ম কাল) দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরীর নবদ্বীপে আগমন ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইয়া সংসার ত্যাগ | ১৫০৪ |
| ১৪২৬ | শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বিবাহ | ১৫০৪ |
| ১৪২৭ | শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণগ্রামে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা | ১৫০৫ |
| ১৪২৭ | শ্রীশ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব | ১৫০৫ |
| ১৪২৮ | শ্রীশ্রীযবন হরিদাসের সপ্তগ্রামে বলরাম আচার্য্যের গৃহে আগমন | ১৫০৬ |
| ১৪২৯ | (আশ্বিন মাস) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াযাত্রা | ১৫০৭ |
| ১৪২৯ | (অগ্রহায়ণ) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াধামে শ্রীশ্রীপাদঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ | ১৫০৭ |
| ১৪২৯ | (পৌষ) মহাপ্রভুর নবদ্বীপে প্রত্যাগমন। | ১৫০৭ |
| ১৪৩০ | (মাঘী শুক্লাপঞ্চমী) শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব | ১৫০৮ |
| ১৪৩০ | রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হিতহরির বংশের গৃহত্যাগ; কৃষ্ণদাসী ও মনোহরী দাসীর পাণিগ্রহণ ও শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহ লইয়া বৃন্দাবনে গমন এবং প্রতিষ্ঠা | ১৫০৮ |
| ১৪৩০ | শ্রীগোবিন্দ কর্ম্মকারের গৃহত্যাগ ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ | ১৫০৮ |
| ১৪৩১ | (আষাঢ়) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক জগাই ও মাধাই উদ্ধার | ১৫০৯ |
| ১৪৩১ | (কার্ত্তিক) শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক চাঁদ কাজির উদ্ধার | ১৫০৯ |
| ১৪৩১ | (অগ্রহায়ণ) শ্রীশ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভ গোস্বামীকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বৃন্দাবনে প্রেরণ | ১৫০৯ |

ক্রমশঃ

শ্রীবৈষ্ণব পদরেণু প্রার্থী—শ্রীমুরারিলাল অধিকারী

# শ্রীবৃন্দাবনের তিন শ্রীবিগ্রহ

( সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩১০।২য়সং ৭৭ পৃঃ হইতে )

শ্রীকৃষ্ণ
|
প্রদ্যুম্ন
|
অনিরুদ্ধ
( স্ত্রী—উষাদেবী )
|
বজ্র

ভাবার্থ—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র বজ্র। যদুবংশ ধ্বংশের পর একমাত্র বজ্রই ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রকে, ইন্দ্রপ্রস্থ ও পরিক্ষিতকে হস্তিনাপুর প্রদান করিয়াছিলেন।

বজ্রের মাতা শ্রীমতী উষাদেবী পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবার আজ্ঞা করিলেন, তিনি যে মূর্ত্তি প্রথমে নির্ম্মাণ করেন তাহা দেখিয়া উষাদেবী বলেন—"এই মূর্ত্তিতে কৃষ্ণের চরণারবৃন্দ ব্যতিরেকে আর কোন অঙ্গের ঐক্য হয় নাই।" তদবধি ঐ শ্রীমূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদনগোপাল নামে অভিহিত হইয়া সংরক্ষিত হইলেন।

পরে দ্বিতীয় বার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইলে উষাদেবী বলিলেন—"বক্ষঃস্থল ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আর কোন অঙ্গের সহিত সাদৃশ্য হইতেছে না।" এজন্য ঐ শ্রীমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগোপীনাথ নামে অভিহিত হইয়া সংরক্ষিত হইলেন।

পুনরায় তৃতীয়বার বজ্র কর্ত্তৃক শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে উষাদেবী যেইমাত্র উহাঁকে দর্শন করিলেন—অমনি লজ্জা পাইয়া ঘোমটা টানিয়া দিলেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণ উষাদেবীর দাদাশ্বশুর, উষা নাত্‌বৌ। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রীমূর্ত্তি হইয়াছিল। ঐ শ্রীমূর্ত্তিই শ্রীরূপ গোস্বমীর সেবিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। বর্ত্তমানে জয়পুরে অবস্থান করিতেছেন।

## শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীবিগ্রহের বিবরণ।

১। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব—শ্রীল রূপ গোস্বামীর সেবা।
২। শ্রীশ্রীমদনমোহন—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সেবা।
৩। শ্রীশ্রীরাধাদামোদর—শ্রীল জীব গোস্বামীর সেবা।
৪। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ—শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর সেবা।

৫। শ্রীশ্রীগোপীনাথ—শ্রীল মধু পণ্ডিতের সেবা।

৬। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর—শ্রীল রঘুনাথ ভট্টের সেবা।

৭। শ্রীশ্রীরাধারমণ—শ্রীল গোপাল ভট্টের সেবা।

৮। শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন শীলা ও গুঞ্জামালা—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সেবা।

শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট।

# সুখ ও দুঃখ

লীলাময়ের লীলা নিকেতন এই সংসারে নানাভাবে নানা প্রকারের সাধক লীলা করিতেছেন, কেহ সন্ন্যাসী কেহ গৃহী কেহ বা অন্য প্রকারের। যে সাধক যে ভাবেই সাধন করুন না সকলকারই মুখ্যউদ্দেশ্য যে সুখ সে বিষয় আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। নিজ নিজ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ফলে যদি সুখ না পান তবেই তিনি কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া নিজ আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর সংসারী আছেন তাঁহারা বদ্ধসংসারী, আর এক শ্রেণীর সংসারী আছেন তাহারা মুক্তসংসারী। বদ্ধসংসারীর সুখলাভের বাসনাও যেমন নানা মুখে প্রধাবিত হয় দুঃখতাড়নাও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নানামুখে আগমন করে। যে সুখ নশ্বর পরিণামী বস্তুর সম্বন্ধীয় তাহা ক্ষণিক অথচ দুষ্পূর। একটীর ভোগে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি আসিলেই আর একটীর জন্য লালসা হইয়া থাকে। সংসারীর সুখের প্রলোভন এত অধিক যে, প্রতি মুহূর্ত্তে এক একটি ভোগ করিলেও অনন্তকালে তাহা শেষ হয় না। সাধু মহাত্মারা বলেন—"যেখানে লালসা সেইখানেই উদ্বেগ সেইখানেই হতাশ।" তাই-ই যদি হয় তবে আর সুখ হইল কোথায়?

তারপর ভোগ ইচ্ছামাত্রেই হয় না, উহা ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য সাপেক্ষ। যাহার যেমন সুকৃতি তাহার তদনুরূপ ভোগ হইয়া থাকে। তাহা হইলে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভোগ যখন ইচ্ছাধীননহে—নিজ নিজ কর্ম্মায়ত্ত তখন ভোগের ইচ্ছা বৃদ্ধি করিয়া বৃথা বিড়ম্বনা ভোগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। লোভ বাড়ে, আশা বাড়ে, কিন্তু সুকৃতি বাড়ে না; উত্তরোত্তর সুখাশা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন বদ্ধসংসারী জীবের একটী অতি কষ্টময় যন্ত্রণাপ্রদ নরক ভিন্ন আর

কিছুই নয়। এই হইল বদ্ধ সংসারীর কথা। এইবার মুক্ত সংসারীর সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মুক্তসংসারী সর্ব্বকালে সকল অবস্থাতেই সুখী, কেন না তাহার সুখবাসনা অনিত্য বস্তুতে নিবদ্ধ নয়, নিত্য সত্য বস্তুতে নিবদ্ধ। ভগবান নিত্য সত্য; মুক্ত সংসারী তাঁহাতে আত্মসমর্পণ তাঁহাতে প্রগাঢ় চিন্তা দ্বারা সর্ব্বকাল আনন্দে বিভোর থাকে, কাজেই তাহার দুঃখ আসিবার অবসর কোথায়? কৃষ্ণ সুখে সুখ বোধ, কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ, ঐহিক সুখের অসারত্বজ্ঞান, কৃষ্ণচিন্তায় কালক্ষেপ, কৃষ্ণ নিষ্ঠা, কৃষ্ণ প্রাপ্ত্যুপায়ানুসন্ধান, কৃষ্ণরূপ ধ্যান, কৃষ্ণ গুণানুবাদ স্মরণ ও মনন, কৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন প্রভৃতি। এক কথায় সমস্ত কৃষ্ণময় করিয়া ভোগ করাই মুক্ত সংসারীর কর্ম্ম, কাজেই তাহাতে সুখ কেন হইবে না?

সংসার ত্যাগ করিলেই সংসার ত্যাগ হয় না। সংসার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে। ঘর, বাড়ী, স্ত্রী, পুত্র, ক্ষেত্র, বিত্ত প্রভৃতির মিলিত ভোগভূমিকে সংসার বলে। অনেকে এইগুলি ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে বলে। কিন্তু ইহাই প্রকৃত সংসার নহে।

সংসার আত্মসুখরত নিজের দেহ। দেহের সম্বন্ধেই ইহাদের সহিত বদ্ধ সম্বন্ধ। আত্মসুখী দেহ লইয়া এ সকল ছাড়িয়া বাহির হইলেও, ঐ পাপ দেহ আবার সংসার পাতিয়া লইবে। কাজেই সর্ব্বাগ্রে আত্মসুখ কামনা ছাড়িয়া সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইলে, তবে সংসার ছাড়িয়া সুখী হইবে। আর তখন সংসার না ছাড়িলেও তোমার সুখলাভে কোন বাধা পড়িবে না।

সংসারে থাকিয়া বিমল সুখলাভ হয় কি না এই যদি তোমার জিজ্ঞাস্য হয় তাহা হইলে তাহার উত্তরে আমি সংসারী আমি বলিব হয় না, সন্ন্যাসী বলিবে হয় না, কিন্তু যথার্থ ভক্ত বলিবেন হয়। যে বিমল সুখ অনুসন্ধান করে তাহার সংসার বা সন্ন্যাস কিছুতেই কিছু হয় না। সর্ব্বসুখের নিদান আনন্দময় শ্রীভগবানকে ছাড়িয়া দিয়া যদি তুমি সুখ পাইতে চাও তবে তোমার কথা কিছু বলিতে বা বুঝিতে চাই না। আর তাঁহাকে লইয়া যদি সুখ চাও তবে সে সংসারই হউক আর সন্ন্যাস আশ্রমই হউক, গৃহই হউক আর বনই হউক, তাহাতে আসে যায় না, সর্ব্বত্রই তাহার সুখ।

অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ কর, নিস্পৃহ হও, কিছু থাকে বেশ, যায় তাহাতেও দুঃখ করিওনা, যাহা শরীর ধারণোপযোগী, যাহাতে কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহাই যথেষ্ট ভাবিয়া গ্রহণ কর অধিক প্রত্যাশা করিওনা, আত্মসুখ স্পৃহা শূন্য হইয়া ভগবানের ভৃত্য বোধে সংসারের সমস্ত

কার্য্য নির্ব্বাহ কর, নিত্য পোষ্য পোষণ কার্য্যে কৃষ্ণ নিয়োগ জ্ঞান, পরোপকারার্থে জীবন নিয়োগ, সর্ব্বত্র সমভাব, মিষ্টবাক্য, ক্ষমা, দোষ পরিহার, পরগুণানুবাদ, উপদেশে আনন্দ. কৃতজ্ঞতা, সারল্য, পরনিন্দা ত্যাগ, সদানন্দ ভাব প্রভৃতি গুণ মুক্ত সংসারীর সুখের হেতু।

এমন কতকগুলি ভয়ঙ্কর বদ্ধ সংসারী আছে যাহাদের সঙ্গী স্বার্থ আর বিদ্বেষ। বিনাকারণে উহারা অনায়াসে সৌহৃদ্য ভঙ্গ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। মৌখিক মিত্রতা তাহারা সকলের সঙ্গেই করে কিন্তু যথার্থ মিত্র তাহাদের কেহই নাই, হাতে পাইলে তাহারা কাহারও অনিষ্ট করিতে ছাড়ে না। নীতিশাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর সহিত উপমা দিয়াছেন, এই সকল কুটিল স্বভাব ব্যক্তির সহস্র উপকার করিলেও তাহারা তাহাতে বাধ্য হয় না।

*মুক্তসংসারিগণ, নিষ্কিঞ্চনগণ প্রায়ই এই সকল হিংস্র প্রাণীর গ্রাসে* পতিত হন। কেননা সরল ব্যক্তি দেখিলেই তাহারা নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য নানাভাবে তাহাদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। ভক্ত, যথার্থ ভগবৎভাবে যাহার হৃদয় ভরপুর সে কিন্তু ইহাতে বিচলিত হয় না। কারণ সে জানে যে, দণ্ডদাতা আমি নয়, দণ্ডদাতা—সদসৎ কর্ম্মের ফলদাতা শ্রীভগবান। প্রকৃত পক্ষেই তাই, যে ব্যক্তি উপদ্রুত হইয়াও উপদ্রব না করে, ভগবান তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া উপদ্রবকারীকে নানাভাবে নিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা অনেক সময় প্রত্যক্ষও করা যায়। তাই মুক্তসংসারী ভক্ত ঐহিক সুখ দুঃখের দিকে না তাকাইয়া সেই পরমপদ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া নিত্য সুখময় প্রেমরাজ্যে বিচরণ করে। প্রকৃত সুখলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে হয়।

---

# শ্রীভক্তিরত্নাকর।

এই শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের নাম-গ্রাম বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে এক্ষণ বড়ই প্রবল। কারণ এই গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া অনেকেই অনেক নূতন প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেছেন ; ইহা যে একেবারেই আধুনিক তাহা কেহই অনুসন্ধান করেন না। কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্নাকর আর নরোত্তম বিলাস গ্রন্থ, শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থেরই পরিশিষ্ট গ্রন্থ। এই প্রেমবিলাস গ্রন্থের জন্ম

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের প্রায় দুই শত বৎসর পরে। এই সমস্ত গ্রন্থ যে কতদূর আধুনিক তাহাই দেখাইবার জন্য ঐ ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ প্রণেতার সংক্ষেপে জীবনী লিখিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের নূতন প্রবন্ধ লেখকগণের কৌতুহল নিবৃত্তি করিতেছি। শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রণেতা শ্রীনরহরি দাস। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, শ্রীখণ্ডের বৈদ্য কুলোদ্ভবনহেন। ইহার পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ দাস, ইহার বস বা জন্মভূমি জেলা মুর্শিদাবাদের অধিন জঙ্গীপুর সান্নিধ্য নশীপুর-পানিশালার সামিল টেঞ্চাপুর গ্রাম। নরহরির পিতা বিপ্রবর জগন্নাথ দাস, ইনি বিশ্ব বিখ্যাত শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য। ইহা শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি দাস নিজ গ্রন্থের শেষ ভাগেই বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্ব জনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ।"

ঐ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জেলা নদীয়াধিন দেবগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে বহরমপুরের সান্নিধ্য সৈদাবাদে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সৈদাবাদের শ্রীমোহন রায় জীউর সেবা স্থাপয়িতা শ্রীহরিনাম আচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ চরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকটেই ঐ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিষ্য হইয়া ছিলেন। প্রমাণ শ্রীকবিকর্ণ পুর কৃত অলঙ্কার কৌস্তুভ গ্রন্থের টীকার শেষে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন—

"সৈদাবাদ বাসি শ্রীবিশ্বনাথাখ্য শর্ম্মণা
চক্রবর্ত্তি নাম্নেয়ং কৃত টীকা সুবোধিনী।"

আবার শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে লিখিয়াছেন—

রামকৃষ্ণ গঙ্গাচরণান্নত্বা গুরু মুরু প্রেম্নঃ
শ্রীলনরোত্তম নাথ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু নৌমি।

এই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৬২৬ শকের মাঘমাসে, শুক্লপক্ষ ষষ্ঠী তিথিতে, বৃন্দাবনে, শ্রীকুণ্ডতীরে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিয়া শেষ করিয়া ছিলেন। যথা—

"খষঙ্কি ষড়ভূমিমিতে শাকে রাধা সরভটে
শুক্লষষ্ঠ্যাং সিতেমাসে টীকেয়ং পূর্ণতামগাৎ।"

এই বর্ত্তমান ১৮৪৬ শকাব্দায় ঐ ১৬২৬ শকাব্দা বাদদিলে অবশিষ্ট থাকিল ২২০ বৎসর। এই ২২০ দুই শত কুড়িবৎসর পূর্ব্বে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্ত্তমান ছিলেন, ইহারই শিষ্য শ্রীজগন্নাথ বিপ্রবর, ঐ ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা শ্রীনরহরি দাস ইহারাই পুত্র। ঐ ২২০ বৎসর সময়েই যদি নরহরির পিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সময়েই যে নরহরি দাস জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন ইহা কখনই সম্ভবপর নহে, স্বভাবতঃ ইহাতে ২২।২২ বৎসর বাদ দিলেও ২০০ বৎসর অবশিষ্ট থাকিল, তাহার পর বিদ্যাশিক্ষা সময় ৩০ বৎসর বাদ দিতে হইবে, ঐ ৩০ বৎসর বাদ দিলেও তৎসঙ্গে সঙ্গেই যে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা সুধীগণ বিচার করিয়া লইবেন। এই সমস্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়াই আমি ঐ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের জন্ম কাল ১৫০ বৎসর নিরূপণ করিয়াছি। ঐ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণিত সমস্ত কথাই শ্রীনরহরি দাস—লোক পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা শ্রীগ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের মধ্যে বহু স্থানেই বর্ণনা করিয়াছেন। অধিক কথা কি? শ্রীদেবকীনন্দন দাস কৃত শ্রীবৈষ্ণব বন্দনার কথা যখন ঐ গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, তখন ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা শ্রীনরহরি দাস যে অধিক দিনের লোক নহেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

আর একটা কথা এইযে, বহরমপুর সাকিনের শ্রীযুক্তবাবু গোপেন্দ্র নারায়ণ মৈত্র মহাশয়ের পিতা আনন্দ নারায়ণ ভাগবতভূষণ মহাশয় আন্দাজ ৫০ বৎসর হইল অপ্রকট হইয়াছেন, তাঁহার কৃত "শ্রীনরহরি দাসের জীবনী" স্বর্গীয় রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মুদ্রিত নরোত্তম বিলাস গ্রন্থের শেষাংশে বর্ণনা হইয়াছে তাহা অনেকেই বোধহয় পাঠ করিয়াছেন কিম্বা পাঠ করিলেও জানিতে পারিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে আমার বোধহয় "উভয়েই পণ্ডিত বলিয়া" উক্ত ভাগবত ভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে "ভক্তিরত্নাকর" প্রণেতা নরহরি দাসের সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দ্দ ছিল।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার ভুক্ত, ইহার প্রমাণ শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ১৪ বিলাসে বিস্তৃত রূপেই বর্ণিত আছে, আবার নরোত্তম বিলাস গ্রন্থের দ্বাদশ বিলাসেও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শাখা বর্ণনার মধ্যে বর্ণনা হইয়াছে। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর

অপ্রকটের প্রায় একশত বৎসর পরে প্রকট হইয়া ছিলেন, তাহার পর ঠাকুর মহাশয় শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড় দেশে আসার বহু দিবস পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ চরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিষ্য হয়েন, তাঁহার নিকটেই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিষ্য হইয়া বহু দিবস পরে ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরিদাসের পিতাকে শিষ্য করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত প্রমাণানুসারে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের জন্মকাল কত দিবস হইল তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। সে যাহাই হউক দেড়শত বৎসরের অধিক নহে। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় এই সমস্ত আবর্জ্জনাপূর্ণ পুঁথীগুলা, গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের কতদূর অহিত সাধন করিতেছে তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না; ইহাকে কালমাহাত্ম্য ভিন্ন আর কি বলিব বলুন।

শ্রীপ্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, ভক্তি রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থগণের পয়ার প্রমাণ দিয়া যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন, সেই সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যাঁহারা সেই কথা সত্য জ্ঞান করেন, তাঁহারা সাবধান হইবেন। শ্রীচৈতন্য লীলার মুখ্য মুখ্য গ্রন্থগণের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া যাঁহারা প্রবন্ধ লিখেন, সেই সমস্ত প্রবন্ধই সত্য, তদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধ সমস্তই স্বকপোল কল্পিত বলিয়া উপেক্ষা করা বৈষ্ণবমাত্রের কর্ত্তব্য!

এক্ষণে অনেকেই স্বকপোল কল্পিত বাক্যে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া ব্যবসায় করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন, ইঁহারাই এক্ষণে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে নামজাদা মহা বিজ্ঞ বৈষ্ণব। কি দুঃখের কথা। ধন্যরে কাল মাহাত্ম্য! তুমিই ধন্য!! পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের রচিতগ্রন্থ এবং শ্রীপাদ গোস্বামীগণের রচিত গ্রন্থগণে আর কাহারই আস্থা নাই, তাহা এক্ষণে বর্জ্জন হইয়াছে, তাহার নাম গন্ধ আর শুনিতে পাওয়া যায় না। কালে কালে হইতে চলিল কি?" *

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী।

* শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ লইয়া অনেক দিন হইতেই আলোচনা হইতেছে, বাজারে যে গ্রন্থ চলিতেছে কোন কোন স্থলে হস্তলিখিত পুঁথির সহিত তাহার মিল নাই এ সংবাদও আমরা পাইয়াছি। আশাকরি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এ বিষয় সুমীমাংসা করিতে পশ্চাৎ-পদ হইবেন না। প্রবীন বৈষ্ণব লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় এ বিষয়ে কি বলেন আমরা শুনিবার জন্ম ব্যগ্র রহিলাম। (ভঃ সঃ)

# শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী

( ৬ )

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীমৎ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সহবাসে দেবানন্দ পণ্ডিতের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের চরণ দর্শন লালসায় সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন, পণ্ডিত বক্রেশ্বর তদীয় প্রিয় শিষ্যের হৃদয়ের সংবাদ সম্যকরূপেই অবগত ছিলেন। কুলিয়ায় প্রভু শ্রীমাধব দাসের গৃহে অবস্থান কালে বক্রেশ্বর দেবানন্দ পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সহিত মিলন করাইয়া দিবার জন্য সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলেন।

দেবানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে চলিয়াছেন, প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব পুলক শিহরিয়া জাগিতেছে। ক্রমশঃ তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার অভয় চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া শত অপরাধীর মত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার টোল হইতে ছাত্রগণ শ্রীবাস পণ্ডিতকে বাহির করিয়া দেওয়ায় প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, অতীতের সেই কাহিনী তাঁহার চিত্তে জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতেছিল। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি নীরবে প্রভুর চরণের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন সাধুসঙ্গ মাহাত্ম্যে তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল, অন্তর্য্যামী প্রভু সমস্তই বুঝিলেন। তিনি তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া জনতা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে ॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান।
দেবানন্দ পণ্ডিত হইল বিদ্যমান ॥
দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন একদিকে সঙ্কুচিত হৈয়া ॥

"প্রভুও তাহাকে দেখি সন্তোষিত হৈ।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা ॥
পূর্ব্বে তার যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ।"

শ্রীগৌরাঙ্গ, পণ্ডিতের সকল অপরাধ ভঞ্জন করিয়া তাঁহাকে বড়ই কৃপা করিলেন। ধন্য সাধুসঙ্গের মহিমা! ধন্য প্রভু বক্রেশ্বর!! আর ধন্য আমাদের পণ্ডিত দেবানন্দ !!!

শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে বসিয়া দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছিলেন তাহাই পরবর্ত্তী কালে "অপরাধ ভঞ্জনের পাট" নামে বৈষ্ণবগণের নিকট স্বর্গাদপি গরীয়সী এক মহান্ তীর্থক্ষেত্ররূপে আদৃত হইয়াছিল, পণ্ডিত দেবানন্দ ঐ স্থানে গড়াগড়ি দিয়া প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "প্রভু! আজি এই শুভমুহূর্তে আপনার চরণে এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, পাপীতাপী যে কেহ আসিয়া তোমাতে শরণাগত হইয়া অপরাধ ভঞ্জনের জন্য এই স্থানে গড়াগড়ি দিবে তুমি তাহাকেই পাপ ভার হইতে মুক্ত করিবে।" আর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু আমাদের ইহাতে বলিয়া ছিলেন "তথাস্তু" আর তদবধি আজ পর্য্যন্ত কত শত শত পাপ ভার গ্রস্ত ব্যথিত নর নারী যে এই পুণ্যস্থানে আসিয়া প্রেমমাখা তনু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ অভেদ ভ্রাতৃযুগলের নাম স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের চিত্ত ভার লঘু করিয়া যাইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে শুনাগিয়াছিল। কলির জীবের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ এই বৈকুণ্ঠ তুল্য ভূমি জাহ্নবী জীবনে চির লুক্কায়িত হইয়াছেন। কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে আবার আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম কতিপয় ভক্ত মহাত্মার কৃপায় "অপরাধ ভঞ্জনের পাট" আবার প্রকাশিত করা হইয়াছে। ইহার অনেক বাদ প্রতিবাদও হইয়াছিল। জানি না শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা চিহ্নিত সেই পুণ্যভূমিখণ্ড প্রকৃতই তদীয় ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনকারী রূপে নয়ন গোচর হইয়াছেন কিনা?

প্রভু দেবানন্দকে মিষ্ট বাক্যে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই সকল উপদেশের মধ্য হইতে আমরা বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মাহাত্ম্যও উপলব্ধি করিতে পারি। যথা—

প্রভু বলে তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পূর্ণশক্তি।
সেই কৃষ্ণপায় যে তাঁকে করে ভক্তি॥
বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিলে বক্রেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়।
সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠ ময়॥

মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া দেবানন্দ এক্ষণে আনন্দে পুর্ণিত তনু হইয়াছেন। তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে প্রভুর অনেক স্তব করিলেন। তাহার পর বলিলেন প্রভু! ভাগবতের ভক্তি পক্ষের ব্যাখ্যা আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। প্রভু আমাদের ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী। তিনি কৃপা করিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন, আর সেই হইতে দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর গণমধ্যে পরিগণিত হইলেন। যথা—

শুনি দ্বিজ দেবানন্দ প্রভুর বচন।
যোর হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন॥
জগত উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
নবদ্বীপ মাঝে আসি হইলা উদয়॥
মুঞি পাপী দৈব দোষে তোমা না জানিনু।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইনু॥
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগো তোমাতে হউক অনুরাগ॥
এক নিবেদন প্রভু তোমার চরণে।
কি করি উপায় প্রভু বলহ আপনে॥
মুঞি অসর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লইয়া।
ভাগবত পরাঙ আপনে অজ্ঞ হৈয়া॥
কিবা বাখানিব পড়াইব বা কেমনে।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু করহ আপনে॥
শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান।
কহিতে লাগিল ভাগবতের প্রমাণ॥
* * *

অতঃপর দেবানন্দকে উপলক্ষ করিয়া জগদ্বাসীকে ভাগবত মহিমা বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন।

প্রভু বলিলেন—

ভক্তিযোগ মাত্র ভাগবতের আখ্যান।
আদি মধ্যে অন্ত্যে কভু না বুঝয়ে আন॥
না মানয়ে ভক্তি ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে অপরাধ পায়॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যেসে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র॥
ভাগবত পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত পঠন শ্রবণ ভক্তিময়॥
* * *

এইরূপে কুলিয়ায় নানা লীলা প্রকাশ করিয়া দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ আপন ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার মানসে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু আপনারা জানেন এবার তাহার বৃন্দাবনে গমন করা হয় নাই। কানাই নাটশালা নামক স্থানে গমন করিলে তথায় তাৎকালীন গৌড়ের বাদশাহের প্রধান অমাত্যদ্বয় দবিরখান ও সাকর মল্লিক তাঁহার অভয় চরণারবিন্দে শরণাগত হইয়া অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। প্রভু আমাদের চিরদিনই আপনাকে লুকাইতে ভালবাসেন। দুই ভাই আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলে বিনয়ের খনি প্রভু আমাদের বক্রেশ্বরাদি আপন মর্ম্মী ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমরা শ্রীকৃষ্ণের নিজ জন, এই দুই ভাইকে কৃপা করিয়া ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর।"

দবিরখান ও সাকর মল্লিক তখন প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া ভক্তগণের জনে জনার চরণে পড়িয়া আপনাদের দৈন্য জানাইতে লাগিলেন। তখন,—

দুই জনে প্রভু কৃপা দেখি ভক্তগণে।
হরি হরি বোলে সবে আনন্দিত মনে॥
নিত্যানন্দ শ্রীবাস হরিদাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর॥
সবার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে কহে ধন্য তুমি পাইলে গোঁসাই॥

বলা বাহুল্য এই দুই ভ্রাতাই প্রভু কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া নাম হইয়াছিল সনাতন ও রূপ। সনাতনের কথায় প্রভু এইস্থান হইতে নীলাচলে ফিরিয়া যান। এবার আর তাহার বৃন্দাবন যাওয়া হইল না।

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা

# আলোচনা

সমাজে আজকাল বৈষ্ণব পত্রিকা কয়েকখানি বেশ চলিতেছে, পূর্ব্বে আরও অনেকগুলি ছিল, নানা কারণে তাহার প্রচার বন্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব সমাজের উপকার ও অভাব মোচন যে এই সকল পত্রিকার দ্বারা একেবারে কিছুই হইতেছে না তাহা বলা যায় না। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের এক মহান্ অভাব কাহারও লক্ষ্যে আসিতেছে না। আজ সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ লেখনি ধারণ। সে অভাব—নবীন বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের কার্য্যকারিতায় উৎসাহ না দেওয়া। সাধারণ সাময়িক পত্রিকার এই অসাধারণ

গুণে অনেক প্রাকৃত লেখকগণ অতি অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতনামা হইতেছেন ইহা এক হিসাবে সুখের বিষয়। কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব পত্রিকা-সম্পাদকগণের নিকট নবীন বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ অসাধারণ আত্যাত্মিক চিন্তাশীলতার ও গবেষণার পরিচয় দিয়াও চিরদিন অন্ধকারের আবছায়ায় ঢাকাই রহিলেন, এটা নিতান্তই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

এক সময় বৈষ্ণব সমাজে বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের এতই আদর ছিল যে, সে সময় মুদ্রাযন্ত্র না থাকিলেও সেই সমস্ত গীত, কবিতা বা গ্রন্থ হস্তে হস্তে অনুলিপি হইয়া সমগ্র গৌড় মণ্ডল ছাইয়া গিয়াছিল। এমন কি সমস্ত উড়িষ্যা, দক্ষিণ সমুদ্র কূলের রাজ রাজাদের প্রতি রাজধানি, নেপাল প্রভৃতি সুদূর প্রান্তেও সে সমস্ত বৈষ্ণব কবিদের প্রসার হইয়াছিল। তারপর বৈষ্ণব কবিগণেরও যে পরস্পর গুণোল্লাসিতা ছিল বৈষ্ণবগ্রন্থে ও পদাবলীতে তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন কোন বৈষ্ণব অন্যকোন বৈষ্ণবের গুণ দেখিলে আত্মহারা প্রাণে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন কিন্তু কাল মাহাত্ম্যেই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক এখন সে ভাব উল্টাইয়া গিয়াছে, পরগুণে প্রীতির পরিবর্ত্তে এখন আত্মগুণে উন্মত্ততাই যেন অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

অধুনা বৈষ্ণব সমাজে সাধারণতঃ তিন ভাবের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক, লেখক, সমালোচক বা সংস্কারক। লেখক দলের মধ্যে অনেকটা বৈষ্ণব ব্যবহার অর্থাৎ গুণোল্লাসিতা দেখা যায় কিন্তু প্রাচীন ধরণের কোন কোন সাধক ও নবীন ধরণের সংস্কারকদের যে কি এক অবৈষ্ণবোচিত দম্ভময় ভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা দেখিলেই যেন কেমন প্রাণের কোমলতা বিশুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে, অপরাধের ভয়ে অনেক সময় সকল কথা বলাও যায় না কিন্তু যে সমাজের নিরভিমানীতা ও পর গুণোল্লাসিতাই মূল চিহ্ন, সে সমাজে এ সকল ভাব বিপর্য্যয় দেখিলে যথার্থই দুঃখ হয় নাকি? অভিমান যে কুসাধকের লক্ষণ অনেকে তাহা মনেই করেন না। কিন্তু একবার যদি নিরভিমানী ভক্তগণের দিকে চাহিয়া দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন সেই সকল নিরভিমান সৌম্য মূর্ত্তি বিশ্বপ্রেমে গদগদ কোমল হৃদয় ভক্তগণকে দেখিলেই কাঁদিয়া তাঁহাদের পদে পড়িতে ইচ্ছা হয়। তাঁহাদিগের অমৃতায়মান সস্নেহ মধুর বাক্য শুনিতে শুনিতে অন্তঃকরণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। এত দর্শনে হয় তাহা ছাড়া

দূরে থাকিয়াও এমন অনেক মহাপ্রাণ ভক্তি রসপূর্ণ পত্রাদি লিখিয়া থাকেন যে, তাহা পাঠ করিয়াও অনেকে তাঁহাদের পাদপদ্মে আত্ম বিক্রয় করিয়া বসে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এই প্রেমোদ্যানে দু'একটী আগাছার আবছায়া দেখিয়া প্রাণে যথার্থই আঘাত লাগে তাই সময় সময় দু'একটী প্রাণের দুঃখ ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বৈষ্ণবগণ ক্ষমা করিবেন।

আমরা কি চাই যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে আমরা বলিব আমরা চাই বৈষ্ণব সমাজে বিদ্বজ্জনের সমাবেশ, চাই সেই বৈষ্ণবোচিত এক প্রাণতা। যদি ইহাই চাই তাহা হইলেই যাঁহাদের চিন্তাশীলতায় আধ্যাত্মিকতা আছে যাঁহাদের পবিত্র লেখনী সেই পূর্ণ প্রেমাধারের প্রেমরসে ডুবিয়া আছে সেই বৈষ্ণবকবি—বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের উৎসাহ বর্দ্ধন যে একান্ত আবশ্যক এ বিষয়ে আর অস্বীকার করা চলে না।

অনেক সময় কোন কোন বৈষ্ণব সহযোগীর তীব্র সমালোচনায় কোন কোন গ্রন্থকারকে অসাধারণ ভাবে নিস্পিষ্ট হইতে দেখা যায় ইহার যে কোন উপকারীতা নাই তাহা বলিতে চাই না, তবে নবীন বৈষ্ণব গ্রন্থকার গণের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য গুণের সমালোচনাও থাকা দরকার বলিয়া মনে হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের হিতানুষ্ঠাতৃ লেখকগণের সংখ্যা যে অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় খুব বেশী তাহা মনে হয় না। যাহারা আছেন তাঁহারা যদি উৎসাহ প্রাপ্ত হন তাহা হইলে সমাজের কার্য্য যে আরও ভাল ভাবে চলিতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয় প্রত্যেক বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদকগণেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত বলিয়া মনে করি। বিশ্বপ্রেমিকতার উত্তেজনায় বৈষ্ণবপত্রিকা পরিচালন আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব সমাজের উন্নতি কামনায় যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারা হীন স্বার্থের বা প্রতিপত্তির লোভে নিজ নিজ কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়া অবারিত হিতানুষ্ঠানের আশার মূলে কুঠারাঘাত না করেন সম্পাদকগণের নিকট আমাদিগের ইহাই বিনীত নিবেদন।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীনিতাইদাস দাস

# ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

[ ২৩শ বর্ষ, মাঘ, ১৩৩১ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ]

## প্রার্থনা

হে সর্ব্বজীব-জীবন দীনবন্ধু! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই স্রষ্টা—আবার তুমিই সংহার কর্ত্তা। সাধুগুরু-মুখে সর্ব্বদাই ইহা শুনি, কিন্তু ঠিকমত এভাব মনে রাখিতে পারি না। যখন শুনি তখন মনে হয় তুমিই সব, কিন্তু কার্য্যকালে সে ধারণা ঠিক থাকে না। হয়ত একটু সুখ পাইলাম বা লোকের কাছে একটু বাহবা পাইলাম, অমনি অহঙ্কারে মাতিয়া তোমার কথা ভুলিয়া গেলাম; আবার যেমন দুঃখের সাড়া পড়িল, অমনি হা হুতাশ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলাম। বুঝিতেছি এ সকলই তোমার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার খেলা; মায়ার বিমুগ্ধ বলিয়াই তোমার লীলাখেলা বুঝিতে পারিতেছি না।

দয়াময়! তুমি কৃপা না করিলে ত তোমার মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনই উপায় নাই, তুমিই ত বলিয়াছ যে, "সত্বাদি গুণ-বিকারময়ী অলৌকিকী আমার মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা, যাহারা অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা আমাকেই ভজনা করে, তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিয়া আমার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়।" প্রভু, এ ত তোমারই শ্রীমুখের কথা; অতএব হে জীব-বৎসল! তোমার তত্ত্ব জানিবার, তোমাতে আত্ম-নির্ভর করিবার, তোমাকেই একমাত্র পরমা গতি বলিয়া বিশ্বাস করিবার শক্তি দাও। তোমার তত্ত্ব জানিয়া তোমার অসীম কর্ত্তৃত্বে আমার এই কল্পিত কর্ত্তৃত্ব মিশাইয়া আমি তোমার হইয়া ধন্য হইয়া যাই।

যাহার প্রভাবে তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া অজ্ঞান নাশ করিয়া জীবের একমাত্র ভজনীয় দয়ারসাগর যে তুমি, সেই তোমাকে ভজনা

করিতে পারি—তোমাকে আমার সর্ব্বরকমের আপনার করিয়া লইতে পারি এমন উত্তমা ভক্তি দাও। অজ্ঞান-আঁধারে সংসার-তাপে তাপিত হইয়া দিবানিশি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। আমি যা-ই করি না—তুমি ত দয়ার সিন্ধু, তুমি দয়া করিয়া আমাকে তোমার ভাব-সিন্ধুতে ডুবাইয়া দাও। আমি ভাবসিন্ধুর সুশীতল বারিস্পর্শে সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া শীতল হইয়া যাই।—আমার মানবজীবন ধন্য হইয়া যাউক।

মোহমদিরার নেশায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নানাভাবে সর্ব্বদাই অধঃপতনের দিকে চলিয়াছি। লোকদেখানভাবে হয়ত কখন কখন তোমায় ডাকি, কিন্তু দয়াল! সে ডাকাতো ডাকার মত নয়, তাই যদি হইত তাহা হইলে সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই ত তোমার সাড়া পাইতাম। ডাকার মত করে' যদি একবারও ডাকা যায় তাহা হইলেই নাকি দুঃখ-পরিতাপ একেবারে দূর হইয়া যায়। কিন্তু আমার ত দিন দিন দুঃখ দূর হওয়া দূরে থাকুক বাড়িয়াই চলিয়াছে; তাই মনে হয়—

যে ডাকে তুমি দাও দেখা,
সে ডাক মোর হয়নি শেখা,
যা ডাকি সে ফাঁকা ফাঁকা,
তাইতে দেখা পাই না।

শিখায়ে দাও প্রভু সেই ডাক, যে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ত্রিভুবন-মোহন ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-মুরলি-মোহনমূরতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। শিখায়ে দাও প্রভু সেই ডাক, যে ডাকের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ আকুল হইয়া তোমার ঐ কোটীচন্দ্রসুশীতল ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত-চরণে প্রাণ লুটাইয়া পড়িতে পারে। হে অনন্ত-লীলা-বিলাসী-গোবিন্দ! বাসনার সঙ্গে ভোগও অনেক হইয়াছে, আর নয়; এবার আর নূতন করিয়া বাসনা জাগাইয়া আমাকে ভুলাইও না, তোমার প্রেমে মাতাইয়া তোমার ভাবে বিভোর করিয়া রাখ, এবার দীনহীনের ইহাই প্রার্থনা।

# বিশ্বরূপের সঙ্গীত

## ( ২২ )

৩৭।— ( কিবা ) ধন্য—লীলা ধন্য ;
( মরি ) এ লীলা-খেলায় কে করে অন্ত।
কত, বিরিঞ্চি বাসব    ধ্যানে পঞ্চানন
ধ্যান ধরে' রয় যুগ-যুগান্ত ॥
সেযে, অনাথের নাথ    প্রভু জগন্নাথ
কৃপা-গুণে গুণবন্ত।
তাই, রাখিতে স্মরণ    করেন পালন
শরণাগত জীবে একান্ত ॥
ও সে, পাষণ্ড দুর্জ্জন    পীড়নে যখন
জীব হয় মতিভ্রান্ত।
তখন, হরিতে ভূ-ভার    হন অবতার
নাশিতে দুষ্ট অসুর অশান্ত ॥
হ'য়ে, অনাদি কালের    যাতায়াতে
দুর্ব্বাসনা শ্রমে শ্রান্ত।
এ "বিশ্বরূপের"    হরিতে বাসনা
লভিতে যুগল-চরণ-প্রান্ত ॥

সম্পাদক

# উপাসনা কোথায় ?

( 'পল্লীবাসী' হইতে উদ্ধৃত। )

আমরা দৈনন্দিন সমস্ত কার্য্যেরই সময় পাইতেছি। কিন্তু উপাসনা করিবার সময় আর পাই না। মানব-জীবনে ভগবান্‌কে ডাকা যেন আর কোন প্রয়োজন বলিয়াই আমাদের বোধ থাকিতেছে না। এমনই ভাবে দিন দিন আমরা ধর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

বিলেবতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত নচোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ভাঃ-২।৩।২০

অর্থাৎ—যাহার কর্ণযুগল উরুক্রম নারায়ণের লীলাকথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণ ত সামান্য গর্ত্তের তুল্য এবং যাহার জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তন না করে, তাহার জিহ্বা ত ভেক-জিহ্বারই তুল্য।

নয়নে তো পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যই অহরহঃ নিরীক্ষণ করিতেছি। কিন্তু কৈ ভগবদ্‌বিগ্রহ মূর্ত্তি-দর্শন করিবার জন্য দিনান্তে তো একবারও আমাদের রতি মতি জাগিতেছে না। ভাগবত শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন—

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতোহরের্যৌ ॥ ভাঃ-২।৩।২২

অর্থাৎ—যে চক্ষু ভগবান্ হরির শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করে, সে চক্ষু কি আবার চক্ষু? সে ত ময়ূরপুচ্ছে যে চক্ষুর আকার আছে, তাহারই মত বৃথা চক্ষু এবং যাহার পদদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণুর লীলাস্থলী সকল দর্শনার্থ গমন করে নাই তাহার পদদ্বয় তো বৃক্ষজন্মের ন্যায় স্থাণু হইয়াই রহিল।

সেইজন্য জীবন থাকিতে থাকিতে—ইন্দ্রিয় সকল স্ববশে সবল থাকিতে থাকিতে জীবন ও ইন্দ্রিয় সার্থক করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দেহের জন্য—ভোগের জন্য—বিলাসের জন্য সব ভুলিতে বসিয়াছি। দেহটাকেই সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিয়াছি। দেহের জন্য যাহা সুখভোগের প্রয়োজন, তাহাকেই জীবনের চরম কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু হায়! এ দেহের পরিণাম একবারও চিন্তা করিয়া দেখা হইয়াছে কি? শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে, স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে, রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

আচার্য্য-শঙ্কর ঘোষণা করিয়াছেন—

'কো বাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহঃ'

অর্থাৎ নিজ দেহের তুল্য আর ঘোরনরক নাই। বিষ্ণুপুরাণ দেখুন, মহাভারত দেখুন, অসংখ্য শ্লোকে দেহাত্মবাদ নিরসন করিয়াছেন। কিন্তু কালের বিচিত্র বিধানে এমনই আমাদের রুচিবিকার জন্মিয়াছে যে, এই দেহকে এবং দেহের তৃপ্তির নিদানীভূত যাবতীয় পদার্থের প্রতি বাসনা স্বতই ধাবিত হইতেছে। এই দেহের জন্যই বিলাসে প্রবৃত্তি, বিলাসের জন্যই ধনে আকাঙ্ক্ষা, আর ধনাহরণের জন্যই যে-কোন অসদুপায় অবলম্বনেও অকুণ্ঠা,—নানা প্রকারে আমরা

আবার ঘোর দেহাত্মবাদী হইয়া পড়িয়াছি। অধ্যাত্মভূমি ভারতবর্ষে ইহাই বৈদেশিক সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা জয়স্তম্ভ!

যাহাকে একবার হেরিলে, দর্শনের সকল পিপাসা মিটিয়া যায়, যাহার কথা কহিতে কহিতে অনন্ত রসনা লাভের বাসনা আকুল করিয়া তুলে, যাহার রূপ, গুণ লীলার মধুরবাণী শুনিতে শুনিতে কাণ, প্রাণ জুড়াইয়া যায়—আমরা কি তাঁহার নিকট হইতে চিরদিন দূরে দূরেই অবস্থান করিব? তাঁহাকে কাছে আনিবার কথা উঠিলেই এত ভয় পাইতেছি কেন? উপাসনা যে, সতত তাঁহারই সান্নিধ্যলাভ। সাহস করিয়া কয়জন বলিতে পারিতেছে—জীবনের সকল কাজের ভিতর তুমি আসিয়া দাঁড়াও! আমরা যেন সতত তোমার আদেশ মাথায় লইয়া সংসার-পথে যাত্রা করিতে পারি। আমরা যেন মনে, মুখে, কাজে, কথায় বলিতে পারি।

"শ্রীকান্ত বিজ্ঞো ভবদাজ্ঞয়ৈব সংসার-যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥"

সময় নদীর স্রোতের মত চলিয়া যাইতেছে। সে তো কাহারই জন্ম অপেক্ষা করিবে না। তোমার আয়ু দিনের পর দিন ফুরাইয়া যাইতেছে। একবার জীবনের কাজ করিয়া লও।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া। ভাঃ—২।৩।১৭

এই সূর্য্য প্রতিদিন উদয় ও অস্তাচলে গমন করিয়া সকল লোকেরই আয়ু হরণ করিতেছেন, শুধু যে ব্যক্তি ভগবানের কথা লইয়া কালাতিপাত করেন, তাহারই জীবন বৃথা নষ্ট হয় না। শ্রীধরস্বামিপাদ তাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"বৃথৈবক্ষীয়মানমায়ু হরিকথয়া সফলং কুরু
আয়ু ত যাইবেই, হে মানব, শ্রীভগবৎ-কথালাপে সেই আয়ু সার্থক কর।

---

# কালা-তরে

কালার বিহনে মরমে মরেছে
বৃন্দাবনের বালা,
কে দিবে গলায়? শুকায়ে গিয়েছে
মালতী পুষ্প মালা।

সাধের কুঞ্জবনে—
অলিকুল আর গুঞ্জরে নাক'
পুষ্পকলির সনে!
বাঁশীর সুরেতে উদাস হইয়া
বামার হয়না ভুল,

যমুনা বহেনা কুলু কুলু রবে
ফুটেনা কদম ফুল,
কোথা সে পারের ঘাট ?—
গোপের বালারা যায়না ক' আর
দুধ বেচিবার হাট !
গোঠের ধেনুরা যায়না ক' মাঠে
উচ্চে পুচ্ছ তুলি,

রাখাল নাচেনা পথে হেলে দুলে
মাখি গোধূলির ধূলি ,
নীরব সকল তান—
ব্রজবাসিগণ ভুলে গেছে সবে
হাসিরাশি আর গান।

———

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

# শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জীবনী

(৭)

প্রভু নীলাচলধামে অষ্টাদশবর্ষ অবস্থান করিয়াছিলেন। উৎকলবাসিগণের পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহারা বাঙালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অচল জগন্নাথের পার্শ্বে সচল জগন্নাথরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেম ও ভক্তি-ভরে সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রভু নীলাচলে কাশীমিশ্রের ভবনে একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেন। উড়িষ্যাবাসিগণ এইরূপ ক্ষুদ্র গৃহকে গম্ভীরা বলে। প্রভুর অপ্রকটের পর বক্রেশ্বর পণ্ডিতই গৌর-গম্ভীরার গদি প্রাপ্ত হইয়া এই আশ্রমের মহান্ত হইয়াছিলেন। এই গৃহে মহাপ্রভুর খড়ম, করঙ্গ ও গাত্রের কন্থাখানি সযত্নে রক্ষিত আছে। পরবর্ত্তী যুগে কন্থাখানি হইতে ভক্তগণ অল্প অল্প করিয়া ছিঁড়িয়া লইতেন বলিয়া উহা একটি ক্ষুদ্র কাঁচাধারের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, কাঁথা খানির আন্দাজি ছয় আনা রকম আছে। করঙ্গটী কয়েকবৎসর পূর্ব্বে জনৈক ভক্তের হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, এখন ঐ ভগ্ন অবস্থাতেই করঙ্গটী গম্ভীরা মন্দিরে আছে।

প্রভুর অপ্রকটের পর ভক্তগণের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। নিদারুণ শোকে তাঁহারা যেন স্পন্দন রহিত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রভুর-মূর্ত্তির ন্যায় সকলে আপন আপন আশ্রমে বসিয়া অশ্রু মোচন ও দীর্ঘ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেন। এই সময়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য নীলাচলে আসিয়া বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। যথা—

"চলিলেন শ্রীনিবাস বিহ্বল অন্তর।
যথা বসিয়াছেন পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥
ভূমে পড়ি তাঁর পাদপদ্মে প্রণমিলা।
শ্রীনিবাসে দেখি পণ্ডিত সুখী হৈলা ॥
আইস বাপ বলি তুলি লইলেন কোলে।
শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্রজলে ॥
বসাইল নিকটে বাৎসল্য অতিশয়।
অঙ্গে হস্ত দিয়া কথা কহে সুধাময় ॥
ভালহইল আইলাশীঘ্র দেখিনু তোমারে।
বহু কার্য্য প্রভু সাধিবেন তোমা দ্বারে ॥
এত কহি অধৈর্য্য হইলা মহাশয়।
পরম বাৎসল্যে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥
যদ্যপিহ শ্রীনিবাসে নারয়ে ছাড়িতে।
তথাপিহ আজ্ঞাদিলা সবারে মিলিতে ॥"

শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত মিলিত হইবার অল্পদিন পরেই বক্রেশ্বর পণ্ডিত তিরোহিত হইয়াছিলেন। কারণ, শ্রীনিবাস শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইবার অল্পদিন পর যখন নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় নীলাচলে আগমন করেন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত আর তখন ইহ জগতে ছিলেন না। ঠাকুর মহাশয় ঐ আশ্রমে শ্রীগোপালগুরুকে মহান্তের পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। ইনি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবক ছিলেন। ঠাকুর নরোত্তম, মহাপ্রভুর শয্যাদি দর্শন করিয়া অতীব কাতর হইয়া পড়িলে গোপালগুরু তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গৌরাঙ্গচাঁদের অদর্শনে শ্রীক্ষেত্রবাসী ভক্তগণ ভুবন আঁধার দেখিয়াছিলেন। তাহার পর ভক্তগণ পরামর্শ করিয়া বক্রেশ্বরকেই শ্রীক্ষেত্রে গদি দিলেন। বক্রেশ্বর নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রমের গদি পাইয়া আপন সম্প্রদায়কে "নিমানন্দ সম্প্রদায়" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

এই "নিমানন্দ সম্প্রদায়ের" ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দুই প্রকার মত দেখা যায়। পদ্ম-পুরাণে লিখিত আছে যে, শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক কলিযুগে বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হইবেন। আবার এই চারি সম্প্রদায়ে চারিজন প্রধান মহান্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যথা ভক্তমালে—

শ্রীসম্প্রদায় গুরু শ্রীল রামানুজ স্বামী।
চতুর্মুখ সম্প্রদায় মাধবাচার্য্য নামী ॥
বিষ্ণুস্বামী মহান্ত শ্রীরুদ্র সম্প্রদায়।
নিম্বাদিত্য চতুঃসন সনক সম্প্রদায় ॥

এই নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ৩৮ পর্য্যায়ভুক্ত গুরু শ্রীমন্নারায়ণ স্বামী একসময় তীর্থ-পর্য্যটনের পথে ত্রিবেণী তীর্থে মুক্তবেণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন এবং এই সময় এই স্থানে পণ্ডিত বক্রেশ্বর তাঁহার নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বক্রেশ্বর এই নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়কে "নিমানন্দ সম্প্রদায়" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

অপর মত এই যে,—নিমাইচাঁদের নাম হইতেই "নিমানন্দ সম্প্রদায়ের" উৎপত্তি। বৈষ্ণবগণ "অনুরাগবল্লী" গ্রন্থখানি প্রামাণিক বোধে মান্য করিয়া থাকেন। ইহার মতে শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরী মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু পুরী গোঁসাইয়ের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে ঐ সম্প্রদায় ধন্য হইয়াছিল। পরে মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারেই সম্প্রদায়ের নাম "নিমানন্দ সম্প্রদায়" হয়। যথা—

"আদৌ শ্রীমধ্বাচার্য্য ভাষ্যকার হয়।
মাধ্ব-ভাষ্যে ভক্তিতত্ত্ব করিয়াছে নির্ণয়॥
ঈশ্বরপুরী গোসাঞি পর্য্যন্ত এই মতে।
মাধ্ব সম্প্রদায় বলি জগত বিখ্যাতে॥
শ্রীমন্মহাপ্রভু যবে প্রকট হইলা।
সর্ব্বনাম পূর্ব্বে নাম নিমাই পাইলা॥
সেই নামে মহাপ্রভুর স্বেচ্ছা অনুক্রমে।
নিমানন্দী সম্প্রদায় হইল নিয়মে॥"

আবার ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থও এই মতের সমর্থন করিয়া বলিতেছেন —

প্রভুর অদ্ভুতশক্তি কে পারে বুঝিতে।
নিমানন্দ সম্প্রদায় হৈল প্রভু হৈতে॥ ৺
প্রভু নামমধ্যে মুখ্য নিমাই পণ্ডিত।
নিত্যানন্দ প্রভুর এ নামে অতি প্রীত॥
নিমাই প্রদান কৈলা জগতে আনন্দ।
এই হেতু অবনী বিখ্যাত নিমানন্দ॥

এখন বুঝা যাইতেছে শ্রীগৌরাঙ্গদেব মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইয়া ছিলেন। এই সম্প্রদায়-প্রণালী আমরা বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রধান শিষ্য শ্রীমদ্ গোপাল গুরুকৃত একটী শ্লোক হইতে বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। যথা—

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এব চ।
শ্রীমধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরি র্মাধবস্তথা॥
অক্ষোভ্যো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্ম মুনিস্তথা।
শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীশ্বরঃ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥

অর্থাৎ শ্রীমন্নারায়ণ, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শ্রীল মধ্ব, পদ্মনাভ, নরহরি, মাধব, অক্ষোভ, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, মহানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্মমুনি, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, ব্যাসতীর্থ মুনি, শ্রীমন্ লক্ষ্মীপতি, শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরী, তাহার পর প্রেমকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায় ক্ষিতিমণ্ডলে "নিমানন্দ সম্প্রদায়" নামে বিখ্যাত।

পণ্ডিত প্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার শিষ্য গোপালগুরু গোস্বামী গদি পাইয়াছিলেন। তিনি এই মঠে রাধাকান্ত নামে এক সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা একবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়া গৌরাঙ্গ গম্ভীরার রাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। ইহার সহিত নিতাই গৌরের বিগ্রহও আছেন। কিন্তু ঐ বিগ্রহদ্বয়ের তেমন যত্নে সেবা পূজা হয় বলিয়া মনে হইল না। বিশেষতঃ গম্ভীরা-গৃহে রক্ষিত মহাপ্রভুর কন্থা, করঙ্গ, খড়ম প্রভৃতিরও যত্নের সহিত পূজা হওয়া উচিত। বর্ত্তমান মহান্ত অপরাপর দেবস্থানের মহান্তগণের ন্যায় ভোগী ও বিলাসী বলিয়া শুনিয়া আসিয়াছি। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে যে নিতান্তই পরিতাপের বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? মঠ-বাড়ী বর্ত্তমানে রাধাকান্ত মঠ বা বড় মঠ নামেই পরিচিত।

শ্রীবৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর কুঞ্জমধ্যে নিমানন্দ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের আর একটী পাটবাড়ী আছে। উহা ছোট মঠ নামে অভিহিত। শ্রীমদ্ গোপাল গুরু গোস্বামী ইহারও প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে ইহার মহান্ত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছেন। গোপাল গুরু বৃন্দাবনে শ্রীজীবের নিকট বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। বৃন্দাবনবাসী সেই সমস্ত বৈষ্ণবগণ "নিমাই-সম্প্রদায়ী" এবং "স্পষ্ট-দায়ীক" বৈষ্ণব নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে রাধাবল্লভ দাস নামক জনৈক বৈষ্ণবের নিকট হইতেই অনুরাগবল্লী প্রণেতা মনোহর দাস মহাশয় শ্রীমদ্ গোপালগুরু কৃত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায় নির্ণায়ক লিখিত বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনুরাগবল্লী গ্রন্থে ঘটনাটী এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"তবে শ্রীবৃন্দাবন মথুরার চারি।
সম্প্রদায় তাঁ সভারে করিল পুজারী॥
তিন সম্প্রদায় আপন গুরুর প্রণালী।
আনিয়া দিলেন তাহা দেখিল সকলি॥
মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বিবরণ না পাঞা।
সর্ব্বজ্ঞ তল্লাস করি চিন্তিত হইয়া।
এইমত কথোদিন ঢুড়িতে ঢুড়িতে।
আচম্বিতে পাইলাম প্রভুর কৃপাতে॥
শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জে একজন।
শ্রীগোপালগুরুগোঁসাইর পরিবার হন॥

রাধাবল্লভ দাস নাম প্রাচীন বৈষ্ণব।
তাঁরে নিবেদন কৈল এ আখ্যান সব॥
তিঁহো কহেন শ্রীগোপালগুরুগোঁসাই।
ইহার নির্ণয় করিয়াছেন চিন্তা নাই॥
এত কহি মোরে এক পত্র পুরাতন।
কৃপা করি দিয়া কৈল সন্দেহ ছেদন॥
মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
তাঁহার সেবক শ্রীগোপাল গুরুবর॥
শ্রীহরি নাম যাথা সম্প্রদায় নির্ণয়।
আগেই করিয়া রাখিয়াছেন মহাশয়॥

মহাত্ম গোপাল গোস্বামীর সহিত "গুরু" শব্দ যোগ হওয়া সম্বন্ধে এই প্রকার বৃত্তান্ত শুনা যায়।—শ্রীজীব গোস্বামীর জিহ্বায় শ্রীহরি নাম সর্ব্বসময়েই অবিরাম ভাবে উচ্চারিত হইত বলিয়া তিনি মলমূত্র ত্যাগের সময় রসনা বন্ধন করিয়া রাখিতেন। একদিন গোপাল তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বিনিতভাবে বলিলেন, প্রভু! আপনি মলমূত্র ত্যাগকালে দেহকে অশুচি বিবেচনা করিয়া জিহ্বায় সুমধুর হরিনাম উচ্চারণ হইতে দেন না, কিন্তু দেহ ত ক্ষণভঙ্গুর, যদি দৈবাৎ ঐ অবস্থাতেই এই দেহের পতন হয় তাহা হইলে ত মৃত্যুকালে আর হরিনাম জপ করা হইল না।

শ্রীজীব ইহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন—"গোপাল, তুমি সাধু, আর তোমার উপদেশটি অতি উপাদেয়। তদবধি তিনি গোপালকে গুরু বলিয়া ডাকিতেন এবং গোপালও গোপালগুরু নামে সেই অবধি সাধারণ্যে পরিচিত হইলেন।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ, তারকব্রহ্ম ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরই কলিকালে একমাত্র জপ করিতে হইবে। শ্লোকটী এই—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

এখন গোপালগুরু কৃত ইহার সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন,—

"বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহং।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্য যতোহরিরিতি স্মৃতি॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা॥
আনন্দৈক সুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥
বৈদগ্ধ্য সার সর্ব্বস্ব মূর্ত্তিং লীলাধিদেবতাং।
রাধিকাং রময়েন্নিত্যাং রাম ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ—চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহ ভগবত্তত্ত্বকে বিশেষরূপে জানাইয়া অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যসমূহ হরণ করেন বলিয়াই "হরি" এইরূপ কথিত হন।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদ স্বরূপিণী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন। এই হেতু "হরি" শব্দে শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

কেবলানন্দ সুখের স্বামী, শ্যামবর্ণ কমল লোচন, গোকুলানন্দ নন্দ নন্দনই "কৃষ্ণ" শব্দে উক্ত হইয়াছেন।

শ্রীরাধামূর্ত্তি রসিকতার সার সর্ব্বস্ব স্বরূপা। তিনি লীলার অধিদেবতা। যিনি নিত্য সেই শ্রীরাধার সহিত রমণ করেন, তিনিই "রাম" শব্দে অভিহিত হন। এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অনুরাগবল্লী গ্রন্থে এইরূপ অভিমত দৃষ্ট হয়।

"হরিনাম মধ্যে তিন নামের কথন।
হরে কৃষ্ণ রাম ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন॥
হরিশব্দে সম্বোধনেহ হয় হরে।
হরা শব্দে সম্বোধনেহ হয় হরে॥
তাথে হরে শব্দের ব্যাখ্যা দুই শ্লোকে কয়।
কৃষ্ণ রাম নাম অর্থ দুই শ্লোকে হয়॥
এই চারি শ্লোকে করি হরিনাম ব্যাখ্যা।
মহাপ্রভুর পরিবার প্রতি দিল শিক্ষা॥

গোপালগুরু পূর্ব্বলীলায় ব্রজের সুমুখী নাম্নি গোপিকা ছিলেন। এই সুমুখী শ্রীললিতা দেবীর যুথমধ্যে পরিগণিতা ছিলেন দেখা যায়।

গোপালগুরুর তিরোধানের পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী গদি পাইয়াছিলেন। ইনি একাধারে বহু শাস্ত্রদর্শী ও উচ্চাঙ্গের সাধক বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তিনি ব্রজলীলার সাধকগণের পরম মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। রাধাকান্ত মঠের পূর্ব্বাপর মহান্তগণের একটী নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।
২। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী।
৩। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী।
৪। শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী।
৫। শ্রীবলভদ্র গোস্বামী।
৬। শ্রীদয়ানিধি গোস্বামী।
৭। শ্রীদামোদর গোস্বামী।
৮। শ্রীগোবিন্দানন্দ গোস্বামী।
৯। শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামী।
১০। শ্রীহরেকৃষ্ণ গোস্বামী।
১১। শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী।
১২। শ্রীকৃষ্ণচরণ গোস্বামী।

১৩। শ্রীরাধামাধব গোস্বামী। | ১৫। শ্রীগোবিন্দচরণ গোস্বামী।
১৪। শ্রীহরেকৃষ্ণ গোস্বামী। | ১৬। শ্রীবলভদ্র গোস্বামী।

মহাত্মগণ এই স্থানে বসিয়াই শিষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা কুত্রাপি মঠ-বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া শিষ্য সংগ্রহ করিতে যান না। বর্ত্তমানে এই মঠবাড়ীর অবস্থা মন্দ নহে। নিত্য অতিথি সেবাও হইয়া থাকে। আমরা মঠে একটি ক্ষুদ্র পাঠাগার স্থাপিত হইতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

সমাপ্ত।

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।

# শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ ( ২ )।

এই বলিয়া সকলেই প্রেমানন্দে নাচিতে লাগিলেন। আজ নবদ্বীপ দাসের উপর শক্তি সঞ্চার দেখিয়া আমি (১) অবাক্। অবশ্য উপস্থিত ভাবে এরূপ সুমধুর পদাবলী আমরা রাজেন দাদার (শ্রীবাবাজী মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের নাম) মুখে অনেকবার শুনিয়াছি বটে; কিন্তু নবদ্বীপ যে রাজেন দাদার এত কৃপার পাত্র, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। কিছুক্ষণ এইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্যের পর কীর্ত্তন সমাপ্তি করিয়া সকলে বুকে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহাপুরুষদের সকলই অদ্ভুত।"

## নবদ্বীপ দাদার পুনর্জ্জীবন

একদিন অপরাহ্নে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী একজন পণ্ডিত আসিয়া অতি আগ্রহের সহিত সকলের হাত দেখিতে লাগিলেন। কয়েকজনার হাত দেখার পর নবদ্বীপ দাসের হাতখানা ধরিয়াই চমকিতভাবে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে ভূমিতে নানারূপ অঙ্কপাতপূর্ব্বক হাতের রেখার সহিত মিলাইয়া বিশেষ নিবিষ্টভাবে গণনা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের ভাবগতিক দেখিয়া সকলেই একটু বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নবদ্বীপের হাতে ভালমন্দ বিশেষ কি একটা আছে, উহা জানিবার জন্ত সকলেই

(১) এই ঘটনাগুলি নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার মহাশয় "চরিত সুধা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিছুকাল পরে পণ্ডিত মহাশয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাতখানি ছাড়িয়া দিলেন। বাবাজী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রকম মহাশয়! উঁহার হাতে কিরূপ দেখিলেন?"

পণ্ডিত। আজ্ঞে, কথাটা আপনাকে একটু একান্তে বলিব।

বাবাজী। কেন, একান্তের প্রয়োজন কি। জগতে ভাল এবং মন্দ দুইটী বস্তুই পরস্পর একত্র মিলিত। এটী স্বাভাবিক নিয়ম। আমার মতে বরং যাহার কথা তাহার সম্মুখেই বলা ভাল।

পণ্ডিত। কি আর বলিব? আমার বিদ্যাবুদ্ধি এবং ধারণায় আমি যত-টুকু বুঝিলাম, তাহাতে ঐ বালকের পরমায়ুকাল শেষ প্রায়। যদি কোনরূপ প্রতিকারের সম্ভব থাকিত তবে তাহা আমি বলিতাম।

নবদ্বীপ দাস একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ্ঞে এ ত আমার পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে। যিনি আমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি একজন বহুদর্শী জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত। তিনি ১৩০৩ সালের পৌষ মাসের প্রথমাংশে আমার মৃত্যু নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এমন কি কোন্ ব্যাধিতে, তাহাও বলিয়াছিলেন।

পণ্ডিত। আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে জ্বর এবং কাসি রোগেই তোমার দেহত্যাগ হইবে।

নবদ্বীপ। ঠিক কথা। তিনিও তাহাই বলিয়াছিলেন। ইহাতে আর দুঃখ কি বাবা? আমার ত আজ পরমানন্দের দিন। এমন সৎসঙ্গে থাকিয়া যদি আমার ন্যায় পতিত জীবের দেহ পতন হয়; তবে ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপের জ্বর ও কাসি ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল, নবদ্বীপ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। সকলেরই ধারণা যে, নবদ্বীপ দাদা এবার আর রক্ষা পাইবেন না। একদিন অবস্থা এমন শোচনীয় হইল যে, কথা বলিবার শক্তিও রহিত হইয়া গেল। তখন বাবাজী মহাশয়ের আদেশক্রমে নবদ্বীপ দাদার অন্তিম সময়ে সকলে উঁহাকে বেরিয়া নাম করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপ কর-যোড়ে বাবাজী মহাশয়ের নিকট বিদায় চাহিলেন। বাবাজী মহাশয়ের আরক্ত নয়ন ছল ছল করিতেছে; আর এক একবার "জয় নিতাই, জয় নিতাই" বলিয়া হুঙ্কার করিতেছেন। বেলা অনুমান দশটার সময় নবদ্বীপ দাসের নাড়ী স্থানচ্যুত হইয়া গেল। চক্ষু শ্বেতবর্ণ এবং ক্রমে পলকহীন হইয়া আসিল। সঙ্গিগণ কাঁদিতে

কাঁদিতে গদ্গদ কণ্ঠে নাম করিতেছেন। হঠাৎ বাবাজী মহাশয় গোকুল ও বিষ্ণুকে বলিলেন, উঁহাকে ধরিয়া বাহিরে নাও।" তখন সকলে হতাশপ্রাণে ধরাধরি করিয়া নবদ্বীপ দাদাকে বাহিরে আনিয়া ফেলিলেন। নবদ্বীপের উর্দ্ধনেত্র, মাথা ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। উচ্চকণ্ঠে নাম হইতেছে হঠাৎ বাবাজী মহাশয় গিয়া নবদ্বীপকে বুকে ধরিয়া দাঁড়াইলেন। বাবাজী মহাশয় কম্পিত কলেবর। পাছে পড়িয়া যান, এই ভয়ে গোকুল ইঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে দণ্ডায়মান। নবদ্বীপের মাথাটী ইঁহার বামস্কন্ধে অবস্থিত। সঙ্গীগণ আত্মহারা ভাবে নাম করিতেছেন। সে সময়ের সেই নামের ধ্বনি একবার যাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, সে-ই ব্যাকুলভাবে আসিয়া নামে যোগ দিতেছে। দেখিতে দেখিতে নবদ্বীপের নয়ন উন্মীলিত হইল। ক্রমে বাবাজী মহাশয়ের স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক তুলিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তখন বাবাজী মহাশয় উঁহাকে বুক হইতে ছাড়িয়া দিয়া ভাবভরে ঢলিতে ঢলিতে "বোল শ্রীনিত্যানন্দ, বোল শ্রীনিত্যানন্দ" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন।

আগন্তকবৃন্দ এই ব্যাপার দর্শনে একেবারে বিস্ময় সাগরে "নিমগ্ন হইলেন। সঙ্গীগণ ভাবোন্মত্ত। সকলেরই মুখে "বোল শ্রীনিত্যানন্দ" এই বুলি। চারিদিকে নামের রোল উঠিল। ক্ষণকাল পরে বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপকে আর একবার আলিঙ্গনপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলে তিনিও নাচিতে লাগিলেন। তখন সকলের প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। এইরূপে কিছুপরে কীর্ত্তন সমাপ্ত করিয়া বাবাজী মহাশয় নবদ্বীপকে বলিলেন "রজে গড়াগড়ি দাও; নিতাইচাঁদ এ যাত্রা তোমায় রক্ষা করিলেন।" নবদ্বীপ একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা। তুমি রাখিতেও পার, মারিতেও পার।" এই বলিয়া রজে গড়াগড়ি দিয়া বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক শ্মশানযাত্রী রোগী উপবেশন করিলেন।

এই সময়ে গোকুল, বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ্ঞে পরমায়ু না থাকিলে কেহ বাঁচাতে পারে কি?"

বাবাজী। আরে পাগল! ঘরে খাবার না থাকিলে লোকে ধার করিয়া কি খায় না?

গোকুল। পয়সাকড়িরই ধার চলে জানি, পরমায়ুর কি ধার চলিতে পারে?"

বাবাজী। নিতাই চাঁদের ইচ্ছা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে— কাঠের পুতুলও কথা বলে। সামান্য পরমায়ুর কথা কি?

এইরূপ কথা বার্তার পরে সকলে স্নানাদি করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের গুরুপগ্রামে অবস্থানের সময় হইয়াছিল।

## শ্রীল রামদাদার সহিত নবদ্বীপ ধামে নবদ্বীপদাদার মিলন

একদিন অপরাহ্নে শ্রীবাবাজী মহাশয় নবদ্বীপ ধামে গোবিন্দ দাস মহান্তের আখড়ায়—( নবদ্বীপে ইনি পাগলগোবিন্দ নামে বিখ্যাত ) বসিয়া আছেন। সঙ্গে নবদ্বীপ দাদা এবং আর দুই একটী সঙ্গী রহিয়াছেন। মহান্তের সহিত নানারূপ কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ হইতেছে, এই সময়ে হঠাৎ চৌদ্দ পনের বৎসর বয়স্ক একটি গৌরবর্ণ বালক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দূর হইতে বালকটীকে দেখিবামাত্র সকলেই যেন উহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। নবদ্বীপ দাদা উঠিয়া বালকটীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বাবাজী মহাশয়ের নিকটে লইয়া আসিলেন। বাবাজী মহাশয় উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় নবদ্বীপ দাদা বলিলেন ;—"বালকটী অল্পদিন হইল শ্রীধামে আসিয়াছে। ইহার নাম রামদাস। ফরিদপুর নিবাসী মহাত্মা জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্যের অনুগত। সম্প্রতি ইহারা হরিসভায় আছে। এ বালকটী বড়ই অনুরাগী। নিতাইচাঁদ নাম সংকীর্ত্তন বিষয়ে ইহাকে বড়ই কৃপা করিয়াছেন। ইহার মধুময় কণ্ঠে প্রেমমাখান নাম কীর্ত্তন শুনিয়া পাষাণ প্রাণও যেন ক্ষণকালের জন্য "হা নিতাই গৌরাঙ্গ" বলিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়।" শুনিয়া বাবাজী মহাশয় রামদাসকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কাছে বসাইলেন। বালক রামদাস, অভিনব, অপ্রাকৃত, সুশীতল বক্ষ-সংস্পর্শে অতীব বিস্মিত হইয়া নিজ হৃদয়ের মধ্যে নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ বাবাজী মহাশয়ের আপদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ভক্তপাঠক, এই বালক রামদাসই সর্ব্ব-পরিচিত শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়। আজ যাঁহার সুমধুর গৌরগুণ কীর্ত্তনে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ব্রজমণ্ডল এমন কি সুদূর মান্দ্রাজ, বম্বেবাসিগণও মুগ্ধ—বিচলিত। সেই হইতেই ইনি রাধারমণ চরণ দাসদেবের শ্রীচরণে বিক্রীত হইয়া গিয়াছেন।

## নবদ্বীপ দাদার বিদায়

মহাপুরুষগণের চরিত্র এক সময়ে যেমন কুসুমাপেক্ষাও কোমল হয় অন্য সময়ে তেমনি বজ্র অপেক্ষাও কঠিন হয়। কখন যে কি করেন তাহা তাঁহাদের কৃপাব্যতীত বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য।

একদিন বাবাজী মহাশয় গম্ভীরভাবে সঙ্গী গোকুল নামক একজন যুবক শিষ্যকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন—"দেখ, তোমার মা, স্ত্রী ও ছোট ভাই তোমার জন্ত বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। অতএব তোমার একবার বাড়ী যাওয়া দরকার। অনেক দিন ত আমাদের সঙ্গে রহিলে; আবার যখন মনে হইবে আসিও। যখন সংসার আশ্রম করিয়াছ, তখন সেটাও অবশ্য দেখিতে হইবে ত? যদি বিবাহ না করিতে বা মা না থাকিতেন, তবুও বরং এক কথা ছিল। সতী সাধ্বী পতিব্রতা ব্রাহ্মণ কন্তার মনোকষ্ট দিলে তাহার অভিসম্পাৎ তোমাকে ও তোমার সহিত আমাদিগকেও ভোগ করিতে হইবে।"

শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে এই বজ্রসম আজ্ঞা শ্রবণে গোকুল অধোবদনে বসিয়া অতি ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছে, মুখে কথা নাই; কেবল এক একবার কাতর নয়নে প্রেমময় নবদ্বীপ দাদার মুখপানে চাহিতেছে। কেবল গোকুল বলিয়া নয়। বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গীগণ সকলেই নবদ্বীপ দাদা গত প্রাণ। যাহার যে মনের ভাব নবদ্বীপ দাদা সব জানেন। কিছু বলিতে কহিতে হইলে নবদ্বীপ দাদাই বলিবেন। আজ গোকুলও যেন কাতর নয়নে নবদ্বীপ দাদাকে ইহাই ইঙ্গিত করিতেছে যে, "দাদা! আমার মনের সঙ্কল্প ত তুমি সকলই জান,—অতএব যাহা বলিতে হয়, তুমিই বল।"

সপরে নবদ্বীপ দাদা আস্তে আস্তে বাবাজী মহাশয়কে বলিলেন, "ও ত নিজে কিছু বলিতে পারিতেছে না, ওর মনের ভাব আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। ও আর বাড়ী যাইবে না বা সংসার করিবে না।

বাবাজী।—আমার বোধ হয় তুমিই ইহার পরামর্শ দাতা?"

নবদ্বীপ।—আমি যদি পরামর্শ দিয়া লোকের সংসার বন্ধন মোচন করিতে পারিতাম, তবে আমি জগতে আর মায়ার অধিকার রাখিতাম না। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি বহু বহু শাস্ত্র এবং অনেক ধর্ম্ম-প্রচারকগণ উচ্চকণ্ঠে সংসারের নশ্বরতা, দুঃখময়তা প্রভৃতি জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতেছেন, কিন্তু কই কয়জন লোক সংসার ত্যাগ করিতেছে? কয়জন মন দিয়া সেই কথা শুনিতেছে? আবার হয়ত একজন বাল্যকাল হইতেই সংসারে অনাশক্ত। ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম স্ত্রী ও মাতাপিতা সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সংসারে রাখিতে পারেন না। যুক্তি বা পরামর্শ করিয়া কি সংসার ত্যাগ হয়, না ভোগ হয়? ইহার যখন সংসার করিবার ইচ্ছা নাই, তখন ইহার প্রতি এরূপ কঠোর আদেশ করিবার প্রয়োজন কি?

বাবাজী মহাশয় বলিলেন,—"যখন ইহার প্রতি তোমার এত ভালবাসা তখন আমার মতে তোমারও ইহার সঙ্গে যাওয়া উচিত। একথায় আর প্রতিবাদ না করিয়া অবিলম্বে তোমরা উভয়েই বাড়ী চলিয়া যাও। নিতাই চাঁদের ইচ্ছায় সময়ান্তরে আবার দেখা হইবে।" এই বলিয়া বাবাজী মহাশয় স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥

কার সাধ্য যে আদেশ লঙ্ঘন করে? যে নবদ্বীপ দাদা বাবাজী মহাশয়ের ছায়ার ন্যায় অনুগত, সপ্নেও যিনি ইঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে অক্ষম, আজ সেই নবদ্বীপ দাদা অবনত মস্তকে এই বজ্রাদপি কঠোর আজ্ঞাপালনে তৎপর। যে আনন্দময়সঙ্গ-ত্যাগের কথা মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—শরীর শিহরিয়া উঠে, আজ বাবাজী মহাশয়ের সুখ হইবে জানিয়া অকাতরে সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছেন।

গোকুল দাদা মনে মনে ভাবিতেছেন,—"হায় হায়! আমার ন্যায় হতভাগার জন্য আজ নবদ্বীপদাদাকেও বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গ ছাড়িতে হইল! আবার ভাবিতেছেন,—নিশ্চয়ই মঙ্গলময় গুরুদেব আমাকে রক্ষা করিবার জন্য নবদ্বীপ দাদাকে সঙ্গে দিতেছেন।"

নবদ্বীপ দাদার হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, কর্ত্তব্যচিন্তা, বিরহ প্রভৃতি উপস্থিত হওয়ায় মুখখানি যেন কেমন একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। একটু চিন্তার পর বলিয়া উঠিলেন, "ভাই গোকুল! আর কেন? আমার বিশ্বাস, এখন আমরা যতক্ষণ এস্থানে থাকিব, ততক্ষণই দাদার (শ্রীবাবাজী মহাশয়ের) কষ্ট হইবে; অতএব চল, আর কাল বিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই এস্থান পরিত্যাগ করি।" এই বলিয়া—

"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

এই নাম করিতে করিতে উভয়ে বাহির হইলেন। সঙ্গিগণ কাঁদিতে কাঁদিতে দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। দাদা ইঙ্গিতে নিষেধ করায় সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

পরে নবদ্বীপ দাদা ও গোকুল দাদা খেয়াঘাটে গিয়া নৌকায় উঠিলেন। ক্রমে গঙ্গার মধ্যস্থলে গিয়া গোকুলকে বলিলেন,—"দেখ ভাই গোকুল! দাদা

আমাদের বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বাড়ী কোথায়? সকলেই যখন আমাদিগকে পুরীর বাবাজী বলে, তখন পুরীতেই ত আমাদের বাড়ী। অতএব দাদা আমাদিগকে পুরী যাইতেই আদেশ করিয়াছেন।" গোকুল বলিয়া উঠিল,—"ঠিক কথা দাদা! আমারও তাই মনে হইয়াছিল। চল আমরা অন্য কোথাও না গিয়া একেবারে পুরীধামেই চলিয়া যাই।" এই বলিতে বলিতে খেয়ার নৌকা গঙ্গার পারে পৌঁছিলে উভয়ে নৌকা হইতে নামিয়া হাঁটাপথে নাম করিতে করিতে পুরী অভিমুখে রওনা হইলেন।

এদিকে নবদ্বীপ দাদার বিরহে বাবজী মহাশয়ের সঙ্গিগণ বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। সকলেরই মুখ ম্লান—সকলেরই মন এক একবার হু হু করিয়া উঠিতেছে। সকলেরই মুখে "হা নিতাই! একি করিলে!" এই এক বুলি। নবদ্বীপ দাদার সঙ্গে ইহাদের ছাড়াছাড়ি এই প্রথম, কাজেই তাঁহার বিরহ সকলেরই একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। কেহ বলিতেছে "হায়! গুরুদেব যদি আমাকে দাদার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিতেন তবুও ভাল ছিল।" এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে;—বাবাজী মহাশয়কেই ত সকলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—বাবাজী মহাশয়ইত সকলের গুরু, তবে ইহাঁর সঙ্গে থাকিয়াও ইহাঁদের এরূপ অবস্থা হইতেছে কেন? এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। মোট কথা—ইহাঁরা নবদ্বীপ দাদাকে আশ্রয় করিয়া বাবাজী মহাশয়কে বিষয় করিয়াছেন। অর্থাৎ বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে যে আনন্দ বা মাধুর্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাঁরা সেই বস্তুটী নবদ্বীপ দাদার মারফতে উপভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং যদিও ইহাঁরা, প্রেমানন্দময় শ্রীবাবাজী মহাশয়ের সঙ্গেই রহিয়াছেন, কীর্ত্তনানন্দও পূর্ব্ববৎ চলিতেছে, তথাপি ইহাঁরা উপভোগ করিবার যন্ত্রের অভাবে যথাযথ উপভোগ করিতে পারিতেছেন না। তাই আজ নবদ্বীপ দাদার বিরহে সঙ্গিগণের মনে অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট।

# বৈষ্ণব-সাহিত্যে দীনেশ বাবু

( যোগেন্দ্রবাবুর সমালোচনা ও প্রতিবাদ )

বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনায় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রভৃতি পুস্তকে রায় বাহাদুর দীনেশ বাবুর গুরুতর ভ্রম সমূহ প্রদর্শন করিয়া এবং নানা যুক্তি দ্বারা

দীনেশ বাবুর বহু অসঙ্গত উক্তি খণ্ডন করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ ভক্তিবিনোদ তত্ত্বভূষণ মহাশয় বিগত পাঁচ মাস ধরিয়া ঢাকার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক "ঢাকা প্রকাশে" প্রবন্ধ লিখিতেছেন। একান্ত অবিশ্বাস্য ও অপ্রামাণিক গোবিন্দদাস কর্ম্মকারের কড়চা, প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করায় দীনেশ বাবুর হস্তে কিরূপে সত্য রূপান্তরিত ও বিকৃত হইয়াছে এবং ঐ বিকৃত সত্য তাহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা বহু পুস্তকের ভিতর দিয়া দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়া উহাই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতেছে, বিশেষতঃ দীনেশ বাবুর ভ্রমাত্মক পুস্তক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় কিরূপে দেশ ও সমাজের বিশেষ অনিষ্টের হেতু হইয়াছে তদ্বিষয়ে যোগেন্দ্রবাবু সমগ্র শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। বিগত শ্রাবণ মাসে যোগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতার নিমিত্ত ঢাকা, ফরিদাবাদ ও নবাব পুরে দুইটি সভা আহূত হয়। এ সংবাদ "ভক্তির" পাঠক বর্গ অবগত আছেন। দ্বিতীয় সভায় ময়মনসিংহ সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে গত ৯ই অগ্রহায়ণ নোয়াখালী টাউন হলে যোগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতার নিমিত্ত তত্রত্য শিক্ষিত ও গণ্য মান্য জনগণের এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রাচীন ও প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর মজুমদার বি, এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যোগেন্দ্র বাবুর সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা দীনেশ বাবুর গুরুতর ভ্রম সমূহ প্রমাণিত হয়। গত ১৬ই ও ১৭ই অগ্রহায়ণ: চট্টগ্রাম, টাউন হলে রায় বাহাদুর উপেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণের এক সভা হয়। তাহাতে যোগেন্দ্র বাবু দীনেশ বাবুর পুস্তক সমূহের ভ্রম প্রতিপাদন করেন। গত ১৯শে অগ্রহায়ণ ফেণী কলেজে তত্রত্য অধ্যাপক, উকিল এবং উচ্চ শিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী জনগণের এক সভা হয়। পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্র বাবু পুঙ্খানু-পুঙ্খ রূপে গোবিন্দদাসের কড়চা খণ্ডন করিয়া দীনেশ বাবুর উক্তির প্রতিবাদ করেন।

গত ৩রা পৌষ বৃহস্পতিবার বিক্রমপুর, সুপ্রসিদ্ধ বজ্র যোগিনী গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গ্রামস্থ বিশিষ্ট জনগণের উদ্যোগে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। বহু শিক্ষিত ও গণ্য মান্য ভদ্রলোক সভায় যোগদান করেন। সাহিত্যানুরাগী পরম বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় সভাপতি বৃত

হয়। যোগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় সভাস্থ সমুদয় ব্যক্তি দীনেশ বাবুর গুরুতর ত্রুটি সমূহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কিরূপে এই শ্রেণীর পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয়, তৎ সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং সুপ্রচারিত দোষযুক্ত সাহিত্য সমূহের সংস্কারের জন্য দেশের যথার্থ কল্যাণকামীগণের ব্রতী হওয়া তাঁহাদের এক প্রধানতম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অবশেষে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত প্রতিবাদ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এই—

"রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত পুস্তকে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গোস্বামীবর্গ ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সম্বন্ধে যে সমুদয় উক্তি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত বোধে এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।" পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় সভায় এই প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

যোগেন্দ্রবাবু নিম্নলিখিত রূপে দীনেশ বাবুর গুরুতর ভ্রম প্রদর্শন করিতেছেন।

"দীনেশ বাবু তাহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ৪র্থ সংস্করণ, ২৫৫ পৃষ্ঠায় মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া একটি অত্যন্ত অযথার্থ ও অসঙ্গত উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্তিটি এই—

"প্রভু বোলে যে জন ডোমের অন্ন খায়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥"

অর্থাৎ মহাপ্রভু বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি ডোমের ভাত খাইবে, সে-ই কৃষ্ণ ভক্তি পাইবে এবং সে-ই কৃষ্ণ পাইবে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দীনেশ বাবু এই একান্ত অসঙ্গত, অশাস্ত্রীয় ও উদ্ভট রকমের উক্তি মহাপ্রভুর নামের সহিত জুড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান যুগের বিকৃত সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়াছেন। দীনেশ বাবু মহাপ্রভুর এই বাক্যটি কোথায় পাইলেন? লিখিয়াছেন,— শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড হইতে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাঠকবর্গ জানেন, এই প্রকার অসঙ্গত উক্তি সমগ্র চৈতন্য ভাগবতের কুত্রাপি নাই। এমন কি কোন সদ্‌গ্রন্থে এইরূপ উক্তি থাকা অসম্ভব।

দীনেশ বাবুর এই উদ্ভট,হাস্যোদ্দীপক ভ্রমটির মূল খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে আমরা শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড ১০ম অধ্যায়ে যাহা পাইলাম, তাহা পাঠক-বর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছি। যথা, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড ১০ম অধ্যায়—(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণ)

( মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি কালে )

"একদিন শ্রীঅদ্বৈতসিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা আজি ভিক্ষা কর ইথি॥
মুষ্টেক তণ্ডুল প্রভু! রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার অর্পণে॥
( তখন ) প্রভু বোলে যে জন ডোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥"

শ্রীঅদ্বৈত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিতেছেন, "প্রভু, আজ আমার গৃহে দুটি ভিক্ষা গ্রহণ কর। আমি নিজ হস্তে এক মুষ্টি রন্ধন করিব। তুমি গ্রহণ করিলে আমার হস্ত পবিত্র হইবে।" তখন প্রভুর উক্তিটি এই—

"প্রভু বোলে যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥"

প্রভু বলিলেন, "তুমি শ্রীঅদ্বৈত, তোমার অন্ন গ্রহণ করিব, সে তো ভাগ্য। তোমার অন্ন যে ব্যক্তি গ্রহণ করে সে নিঃসন্দেহে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণকে লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

পাঠকগণ, দীনেশ বাবুর ভ্রমের প্রকার বুঝিলেন? তিনি "তোমার" স্থানে "ডোমের" করিয়াছেন এবং এই ডোমের ভাত খাওয়াইয়া বর্ত্তমান যুগকে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু তোমার স্থানে ডোমের আইসে কিরূপে? হায় শ্রীঅদ্বৈত! আজ প্রবীণ সাহিত্য-সেবকের হস্তে পড়িয়া তোমাকে ডোম হইতে হইয়াছে! অষ্টম বর্ষীয় বালকেরও এ ভ্রম হয় না।"

তৎপর, যোগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"দীনেশ বাবু একান্ত আধুনিক এক জাল বহি 'গোবিন্দ কর্ম্মকারের কড়চা' যাহার উল্লেখ কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে নাই এবং যাহার রচনা কাল ৪০।৫০ বৎসরের উর্দ্ধে কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না, ঈদৃশ এক পুস্তককে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহা অবলম্বনে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে যে ভ্রম সমূহ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেই সমুদয় ভ্রম ও তজ্জাত অনিষ্ট যাহা হইয়াছে তাহার গভীরতার পরিমাণ করা আমাদের পক্ষে একান্ত কঠিন হইয়াছে। সেই কড়চা অবলম্বনে দীনেশ বাবু লোক-শিক্ষক ও সন্ন্যাসাশ্রমী মহাপ্রভুর দ্বারা দক্ষিণ ভ্রমণের পথে সত্যবালা নাম্নী বেশ্যাকে আলিঙ্গন করাইয়াছেন, যাহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। এইরূপে আরও বহুতর ভ্রম

দ্বারা দীনেশ বাবু মহাপ্রভুর শত সূর্য্যোপম নির্ম্মল চরিত্রে কালিমা আরোপ করিয়াছেন।"

"তৎপর, দীনেশ বাবু তাহার "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" ( Typical selections from Bengali Literature ) নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য সুবৃহৎ পুস্তকে সহজিয়া অস্পৃশ্য পুস্তক "বিবর্ত্তবিলাস" হইতে স্থল বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া জ্ঞান, বৈরাগ্য ও পবিত্রতার উজ্জ্বলতম আদর্শ প্রাচীন গোস্বামী ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সম্বন্ধে অতি জঘন্য মিথ্যা কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন। বলিতে কি, উক্ত 'বিবর্ত্ত বিলাস' অনুসরণে তাঁহাদের প্রত্যেকের পরম পবিত্র নামের সহিত এক একটি নায়িকার নাম সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে সৎ সাহিত্যক্ষেত্রে এবং মাতৃবাণীর পবিত্র মন্দিরে বিকৃত রুচির একান্ত আধিপত্যে আজ এক মহাবিপ্লব উপস্থিত।

যোগেন্দ্রবাবু, দেশের যথার্থ কল্যাণকামী সৎসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজের এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণেরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

"সৎ-সাহিত্য সেবক"

# শ্রীবৈষ্ণব-ইতিহাস

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

| শকাব্দ | | খৃষ্টাব্দ |
|---|---|---|
| ১৪৩১ | ( মাঘের শেষ শুক্লপক্ষ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ ও শ্রীধাম নবদ্বীপে নিদয় ঘাটের উৎপত্তি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যালয়ে আগমন। | ১৫১০ |
| ১৪৩১ | (কৃষ্ণপক্ষ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে শ্রীপাট খড়দায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিতালয়ে আগমন ও শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ। | ১৫১০ |

| শকাব্দ | | খৃষ্টাব্দ |
|---|---|---|
| ১৪৩১ (ফাল্গুন) | শ্রীমন্মহাপ্রভুর অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতালয়ে আগমন ও শ্রীশ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহ প্রকাশ ও শ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল গমন পথে আঁধিপাড়ায় শ্রীঅনন্তপণ্ডিতালয়ে গমন ও তৎপ্রতি কৃপা প্রকাশ এবং ছত্রভোগে রামচন্দ্র খানকে কৃপাদান। | ১৫১০ |
| ১৪৩১ (ফাল্গুনের শেষ) | শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন। | ১৫১০ |
| ১৪৩১ (চৈত্র) | নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম উদ্ধার। | ১৫১০ |
| ১৪৩২ (৭ই বৈশাখ) | শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলত্যাগ ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বাহির। | ১৫১০ |
| ১৪৩২ (জ্যৈষ্ঠ) | শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমন্নরহরি ঠাকুর ও অন্ধ ভগবানাচার্য্যের নবদ্বীপ ত্যাগ ও নীলাচল যাত্রা। | ১৫১০ |
| ১৪৩২ (আষাঢ়) | শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর আগমন ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত, নরহরি ঠাকুর ও অন্ধ ভগবানাচার্য্যের নীলাচলে আগমন ও স্থিতি। | ১৫১০ |
| ১৪৩২ (আশ্বিন) | শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের মিলন। | ১৫১০ |
| ১৪৩৩ (আষাঢ়) | শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীকে তদালয়ে কৃপাদান। | ১৫১১ |
| ১৪৩৩ | শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীগোপীনাথের জন্ম। | ১৫১১ |
| ১৪৩৩ (৩রা মাঘ) | শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন | ১৫১২ |
| ১৪৩৩ (ফাল্গুন) | শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কাশীধাম হইতে নীলাচলে আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় এবং শ্রীপরমানন্দ পুরীর নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গঅন্বেষণে শ্রীশচীমাতার নিকট আগমন। | ১৫১২ |
| ১৪৩৩ (চৈত্র) | শ্রীপরমানন্দপুরীর নীলাচলে আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ। | ১৫১২ |
| ১৪৩৩ হইতে ১৪৩৫ | শ্রীচৈতন্যমঙ্গলকার জয়ানন্দের জন্ম। | ১৫১২—১৪ |
| ১৪৩৪ (বৈশাখ) | শ্রীপাদ্ঈশ্বরপুরীর সেবক শ্রীগোবিন্দ কায়স্থের নীলাচলে আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়। | ১৫১২ |
| ১৪৩৪ (জ্যৈষ্ঠ) | শ্রীকেশবভারতীর পরমার্থ ভাই শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতীর ও শ্রীঈশ্বর পুরীর সেবক শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের এবং শ্রীরামানন্দ রায়ের নীলাচলে আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ। | ১৫১২ |

| শকাব্দ | | খৃষ্টাব্দ |
|---|---|---|
| ১৪২৪ | (আষাঢ়) গৌড়মণ্ডলের ভক্তগণের নীলাচলে আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলন ও শ্রীমুকুন্দদত্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীবাসুদেব দত্ত ও শ্রীদামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর পণ্ডিতের শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্তি। | ১৫১২ |
| ১৪৩৪ | (কার্ত্তিক) নবদ্বীপের ভক্তগণের নীলাচলত্যাগ ও গৌড়মণ্ডল যাত্রা | ১৫১২ |
| ১৪৩৪ | (পৌষ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীবাসু ঘোষ সঙ্গে গৌড়মণ্ডল যাত্রা। | ১৫১২ |
| ১৪৩৪ | (মাঘ) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপরিউক্ত ভক্তগণের সহিত নবদ্বীপ আগমন। | ১৫১৩ |
| ১৪৩৫ | (ফাল্গুন) শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্রীশিখি মাহিতি ও সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘের উদ্ধার। | ১৫১৩ |
| ১৪৩৫ | (আষাঢ়) গৌড়মণ্ডলের ভক্তগণের নীলাচলে আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাসীমাতাঠাকুরাণীর, মালিনী ঠাকুরাণীর ও অন্যান্য ঠাকুরাণীগণের নীলাচল আগমন। | ১৫১৩ |
| ১৪৩৫ | (আষাঢ়ী শুক্লাসপ্তমী) শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতের (মুরারির কড়চা) রচনা শেষ। | ১৫১৩ |
| ১৪৩৫ | (আশ্বিন) গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচল ত্যাগ ও গৌড়মণ্ডল যাত্রা। | ১৫১৩ |
| ১৪৩৬ | (জ্যৈষ্ঠ) শ্রীনিত্যানন্দের নীলাচলে আগমন। | ১৫১৪ |
| ১৪৩৬ | (জ্যৈষ্ঠ) কাশীধাম হইতে শ্রীপ্রকাশানন্দসরস্বতীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি কটূক্তিপূর্ণ পত্র আসিলে বাসুদেবসার্ব্বভৌমের কাশী যাত্রা। | ১৫১৪ |
| ১৪৩৬ | (আষাঢ়) গৌড়মণ্ডলের ভক্তদিগের নীলাচল আগমন। | ১৫১৪ |
| ১৪৩৬ | (শ্রাবণ) শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রকাশ্যে শ্রীগৌরসংকীর্ত্তন এবং গৌড়মণ্ডলের ভক্তদিগের নীলাচলত্যাগ ও নবদ্বীপ যাত্রা। | ১৫১৫ |
| ১৪৩৬ | (ভাদ্র) শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের কাশীধাম হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন | ১৫১৪ |

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবপদরেণুপ্রার্থী——

শ্রীমুরারিলাল অধিকারী—

১২ এক, মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা।

# ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

[ ২৩শ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩১ ৭ম সংখ্যা ]

## প্রার্থনা

এ কি বিড়ম্বনা, বুঝিতে পারি না,
অভাগার সনে কেন প্রতারণা।
মরি ঘুরে ঘুরে, আঁধারে আঁধারে,
এ কেমন ছলা জানি না জানি না।
হৃদয় বিদারি, ওই দেখ হরি,
রাখিতাম আমি তোমারে যেথায়।
কি দুর্দ্দৈব-বসে, ঐ দেখ বসে,'
মায়ার পুতলি খেলিছে সেথায়॥
ভজন পূজন, মোর অকারণ,
বৃথা ধ্যানে বসি কাজ কিবা আর।
বসিলে ধেয়ানে, হৃদয়-দর্পণে,
মায়ার মূরতি জাগে বার বার॥
অভাগা অশুচি, পরম পাতকী,
তাই বুঝি দাও এত বিড়ম্বনা।
আর কেন হরি দাও দয়া করি
শ্রীচরণ দীনে, ক'রনা বঞ্চনা॥

দীনশরণ! ঘোর সংসার-সমুদ্রে নিপতিত হইয়া, সর্ব্বদাই নানাপ্রকার বিপদ-তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতেছি, কি করিব, কোন্ উপায়ে যে এই ভীষণ তরঙ্গের তীব্র আঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মনে মনে স্থির হইবার উপায় নানা রকমে চিন্তা করিয়া যেমন একটু স্থির হই অমনি-ই কোথা হইতে আবার এক নূতন তরঙ্গ আসিয়া আমার চিন্তাস্রোতের গতি ফিরাইয়া কোথায় লইয়া যায় তাহার সীমা থাকে না। এই ভাবে অনন্তকাল ভাসিয়া ভাসিয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে চলিয়াছি, কূল আর পাই না, কখনও পাইব কি না—এই ভীষণ তরঙ্গে স্থির হইবার অবলম্বন আমার কিছু আছে কি না তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

ধন, জন, বন্ধু-বান্ধব যাহাকেই ধরিতে যাই সকলই দেখি আমারই মত চঞ্চল ও বিপন্ন। তাই তোমাকে অচ্যুত জানিয়া আজ তোমার অচঞ্চল, শান্তিময়, অভয়পদে আশ্রয় লাভের জন্য তোমার দুয়ারে উপস্থিত হইয়াছি। আমাকে কৃপা করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দাও, আমি তোমার পদে আশ্রয় পাইয়া, চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া, প্রাণে শান্তিলাভ করি। দুর্নিবার সংসার সমুদ্রে ঘোরা ফেরা বন্ধ হইয়া যাউক, সর্ব্বদা তোমার ভাবে বিভোর থাকিয়া জীবন ধন্য করি, দয়াময়! দয়াকর!

যে প্রার্থনা করিতেছি তাহা পূর্ণ হইতে যে সাধন ভজন চাই তাহাও আমি জানি আর এই সাধন ভজন নাই বলিয়াই যে আমি দুঃখ পাইতেছি তাহাও বুঝি; কিন্তু তুমি কৃপাকরিয়া হৃদয়ে সৎপ্রবৃত্তি না দিলে ভজন সাধনেও ত প্রবৃত্তি জন্মিবে না; তাই বলি তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়-জন্য আমার যাহা কিছু করা আবশ্যক সেগুলি তুমিই প্রাণে প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া করাইয়া লও। মোট কথা আমার যাহা কিছু কর্ত্তব্য, যাহা কিছু করণীয়, সবই তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। যথার্থ প্রাণের অভাব বুঝিতে এবং সেই অভাব ঘুচাইতে তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। আমি তোমার শরণ লইলাম, আমার যাহা করিলে ভাল হয় তাহা তুমিই করিয়া লও, আমি তোমারই ভরসায়, তোমারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। আমার তুমিই আশা, তুমিই ভরসা, তুমিই সহায়, তুমিই সম্পদ, দেখ যেন আমাকে কৃপা করিতে কৃপণতা করিয়া তোমার দয়াল নামের—পাতকীতারণ নামের—অনাথশরণ নামের—দীনবন্ধু নামের কলঙ্ক করিও না। দীনহীনের আজ ইহাই প্রার্থনা।

# নবদ্বীপ

এই পূত ধামে লভিলা জনম
নদীয়ার গোরাচন্দ্র,
চুম্বি' চরণ জাহ্নবী সতী,
গাহিছেন যাঁর বন্দনা-গীতি,
শত যোগীজন বন্দিত ভূমি,
উঠিছে সদা আনন্দ।
চরণ নিয়ে নীল জলঙ্গী
কল কল জলভঙ্গে,—
*গাহিয়া গোরার গৌরব গান,*
তুলিছে মোহন মুরলীর তান,

ভাগীরথী বুকে আছাড়িয়া পড়ে—
নৃত্য করিয়া রঙ্গে।
এই ধরণীর বক্ষেতে বাজে
অতীতের ব্রজ বেণু,
মিলনের এই পুণ্য-পুরীতে,
বঙ্গজনের এ মহা-তীর্থে,
কৃতার্থ হয় মানব, পরশি'—
গোরার চরণ-রেণু।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

# অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম (৮)

এই সময়ে রথযাত্রা দর্শন উপলক্ষ করিয়া শ্রীল রূপগোস্বামী বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের পুণ্য আশ্রমে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যহ জগন্নাথের উপল ভোগ দর্শন করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন দিয়া যাইতেন। যথাসময়ে প্রভু হরিদাস ঠাকুরের নিকেতনে চন্দ্র মুখে 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হরিদাস প্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, প্রভু দেখুন শ্রীরূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন। করুণাসাগর শ্রীগৌরাঙ্গ সস্নেহে তাঁহাকে বক্ষে উঠাইয়া লইলেন এবং কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সেইস্থানেই তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন। প্রভু শ্রীরূপকে কিছুদিন নিকটে রাখিয়া তাঁহাকে কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য যথেষ্ট শক্তি-সঞ্চারিত করিলেন। সেই বৎসর প্রভু যখন রথাগ্রে নৃত্য করেন তখন একটী

শ্লোক বলেন। শ্লোকটী কাহার রচিত জানা যায় না, কিন্তু কাব্য-প্রকাশে উদ্ধৃত আছে। শ্লোকটীর অর্থ,—

কোন নাগরী তাহার পতীকে বলিতেছেন, "হে নাথ! সেই তুমি, সেই আমি, সেই আমরা মিলিত হইয়াছি, কিন্তু তবু আমাদের সেই যে প্রথম নিভৃত স্থানে মিলন হয়, তাহাতে যে সুখ হইয়াছিল তাহা আর এখন পাইতেছি না।" জগন্নাথ রথে চড়িয়া সুন্দরাচলে যাইতেছেন, প্রভু "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক পড়িয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ইহাতে এমন কি আছে যে প্রভু এই আদিরস ঘটিত শ্লোকটি পাঠ করিয়া এত আনন্দ পাইতেছেন? স্বরূপ উহার ভাব বুঝিয়াছেন। অপর কেহ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই। ভাগ্যবান্ শ্রীরূপ কিন্তু ইহা বুঝিয়াছেন, বুঝিয়া ঐ ভাবের একটী শ্লোক রচনা করিলেন। যথা :—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর মুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায়স্পৃহয়তি॥ ( পদ্যাবলী )

অর্থাৎ শ্রীমতী কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিতেছেন, ললিতে! ইনি সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, আমি সেই রাধা, এখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ উপভোগও করিতেছি, কিন্তু সেই মধুর বংশীধ্বনি-মুখরিত কালিন্দীপুলিনস্থ বিপিনের নিমত্তই আমার চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে।"

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্লোকটী তালপত্রে লিখিয়া আপন গৃহের চালে গুঁজিয়া রাখিয়া ছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ যথাসময়ে তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন, শ্রীরূপ তখনও স্নান সারিয়া ফিরেন নাই। প্রভু চালে সেই তাল পত্রখানি গোঁজা আছে দেখিয়া টানিয়া পাঠ করিলেন। দেখিলেন তিনি যে শ্লোকটী পূর্ব্বে রথাগ্রে নৃত্যকালে পাঠ করিয়াছিলেন ইহা তাহারই ভাবানুগত। শ্রীরূপ স্নান করিয়া প্রত্যাগত হইলে প্রভু পুলকিত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে একটী চপেটাঘাত করিলেন এবং বলিলেন, "রূপ! তুমি আমার মনের ভাব কিরকম করিয়া জানিলে?" রূপ নত মুখে হাসিলেন মাত্র। মহাপ্রভু স্বরূপকে শ্লোকটী শুনাইলে তিনি বুঝিলেন শ্রীরূপ তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ।

শ্রীরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সাগরে নিমজ্জিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলেন। তদুপরি তাঁহার অসাধারণ কবি-প্রতিভা

ছিল। তিনি হরিদাস ঠাকুরের নিভৃত কুটীরে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটক প্রণয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন। শ্রুতির সেই "রসো বৈ সঃ" রূপে অভিহিত শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার নাটক সমূহের নায়ক এবং শ্রীমতী রাসেশ্বরী রাধিকা সুন্দরীই নায়িকা, কাব্যস্থান—অতুল সুষমামণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবন ধাম।

একদিন শ্রীরূপ হরিদাস ঠাকুরের নিকট বসিয়া নাটক রচনা করিতেছেন এবং হরিদাস বসিয়া নাম জপ করিতেছেন এমন সময় মহাপ্রভু আসিলেন। তাঁহার শুভাগমনে উভয়ে উঠিয়া শ্রীচরণে প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া—শ্রীরূপের নিকটবর্ত্তী আসনে উপবেশন করিলেন। শ্রীরূপ সেদিন যে নাটক খানি লিখিতে ছিলেন তাহার একখানি পাতা তুলিয়া লইয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিলেন,—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥
চেতঃপ্রাঙ্গন-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং।
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

কবি যদুনন্দন দাস এই কবিতাটীর যে সুমধুর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহাই এস্থানে আস্বাদ করিবার সাতিশয় লোভ হইতেছে,—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম,　　নাচে তুণ্ড অবিরাম,
আরতি বাঢ়ায় অতিশয়।
নাম সুমাধুরী পাঞা,　　ধরিবারে নারে হিয়া,
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥
কি কহব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া,　　কে জানি গঢ়ল ইহা,
কৃষ্ণ এই দুই আখর করি॥
আপন মাধুরী গুণে,　　আনন্দ বাঢ়ায় কাণে,
তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ,　　যবে হয় তার নাম,
মাধুরী করিতে আস্বাদনে॥
কৃষ্ণ দু'আখর দেখি,　　জুড়ায় তাপিত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।

যদি হয় কোটি আঁখি, তবে কৃষ্ণ রূপ দেখি,
নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে,
বিস্তারিত হৈয়েত হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন,
নামে করে প্রেম-উনমাদ ॥
যে কাণে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম,
সম ভাব করায় উদয়।
সকল মাধুর্য্যস্থান, সব রস কৃষ্ণ নাম,
এ যদুনন্দন দাস কয় ॥

শ্রীল রামানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ এই শ্লোক শুনিয়া যুগপৎ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন। রামরায় অলঙ্কার শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁহার নাটকের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব সমূহ ধরিয়া গুণাবলী আলোচনা করিতে লাগিলেন। কাব্য-শাস্ত্রবিদ্ রামানন্দ অতঃপর শ্রীরূপের নিকট তাহার বিদগ্ধমাধব নাটকের নান্দীশ্লোক শুনিতে চাহিলেন, এই নান্দীশ্লোকে গ্রন্থকর্ত্তার ইষ্টদেবের বর্ণনের রীতি আছে। ইহাতে শ্রীরূপ তাঁহার ইষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহিমা বর্ণিত করিয়াছেন। মহাপ্রভু প্রচ্ছন্নাবতার, তিনি পাছে কিছু বলেন এইজন্য শ্রীরূপ তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, প্রভু সরল ভাবে বলিলেন, "রূপ! তুমি সচ্ছন্দে ইহাদিগকে তোমার শ্লোক শুনাও।" শ্রীরূপ প্রভুর কৃপানুমতি পাইয়া এই অতি সুন্দর নান্দী শ্লোকটী পাঠ করিলেন,—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ ( বিদগ্ধমাধব )

অর্থাৎ উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিশ্রী যাহা ইহজগতে পূর্ব্বে কোন অবতারই প্রদান করেন নাই, তাহাই প্রদান করিবার জন্য কনক-কান্তি সমুজ্জ্বল কিরণ কদম্ব-সন্দীপিত শ্রীগৌরাঙ্গ হরি কলিকালে করুণা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন—সেই শচীনন্দন হরি সতত আমাদিগের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউন।

প্রভু ইহাতে বলিয়া উঠিলেন—"অন্যায় করিয়াছ, ইহাতে অতিস্তুতি করা হইয়াছে।"

রামানন্দ বলিলেন—যাঁহার স্বরূপ বর্ণনাই সম্ভবপর নহে তাঁহার আবার অতিস্তুতি কি?

রামানন্দ রায়ের শ্রীরূপের নাটকের লক্ষণ, সিদ্ধান্ত, প্রেম-বর্ণনা প্রভৃতি প্রতিপাদ্য বিষয় গুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করার ভঙ্গী দেখিয়া ভূতপূর্ব্ব বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী ও পরম পণ্ডিত শ্রীরূপ গোস্বামীও চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। অতঃপর ;—

প্রভু কহে প্রয়াগে ইহার হইল মিলন।
ইহাঁর গুণ ইহাঁর আমার তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥
সবে কৃপাকরি ইহাঁর এই দেহ বর।
ব্রজলীলা প্রেম রস বর্ণে নিরন্তর॥
ইহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম।
তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ, তৈছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইব বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তি শাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥

রামানন্দ বলিলেন, প্রভু উপযুক্ত পাত্রেই আপনার কৃপা প্রদর্শিত হইয়াছে।

রায় কহে—ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতুল তুমি পার নাচাইতে॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই সব রস দেখি এই ইহাঁর লিখনে॥
ভক্ত কৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।
যারে করাও সেই করিবে জগৎ তোমার বশ॥

রামানন্দ বলিলেন, প্রভু তোমারই প্রেরণায় শ্রীরূপ ব্রজরস প্রকাশার্থ এই সমস্ত নাটক রচনা করিয়াছেন। ধন্য প্রভু আমাদের! যাঁহার মহতী কৃপায় আজ কলির মলিন জীবগণ ব্রজ-রস-সুধা-মন্দাকিনীর প্রসন্ন ধারায় তাহাদের ত্রিতাপ দগ্ধ হৃদয় সুশীতল করিতে সমর্থ হইবে।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক জনৈক সরল চিত্ত ব্রাহ্মণ নীলাচলে বাস করিতেন।

মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়া ইহাঁর ভক্তির সুবিমল প্রবাহ সঞ্জাত হইয়াছিল। তিনি একদিন মহাপ্রভুর চরণান্তিকে এই বলিয়া প্রার্থনা জানাইলেন যে—

মহাপ্রভো! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোনভাগ্যে পাইয়াছি তোমার দুর্লভচরণ॥
কৃষ্ণ কথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণ কথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥—

আমাদের রঙ্গিয়া প্রভুর রঙ্গ দেখুন, তিনি বলিতেছেন, "প্রদ্যুম্ন, আমি ত কৃষ্ণ কথা জানি না। তোমার যদি কৃষ্ণ কথা শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে রামানন্দের নিকট যাও। কৃষ্ণ কথা শুনিতে ইচ্ছা হওয়া বহু ভাগ্যের কথা। তুমি নিজকে অধম বলিয়া ধিক্কার দিতেছ কেন? তুমি ত অধম নহ, তোমার যখন কৃষ্ণ কথার রুচি হইয়াছে তখন তুমি মহা ভাগ্যবান।"

প্রভু কহে কৃষ্ণ কথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানেন, তাঁর মুখে শুনি॥
ভাগ্য তোমার—কৃষ্ণ কথা শুনিতে হইল মন।
রামানন্দ পাশে যাই করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণ কথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্য মান।
যার কৃষ্ণ কথায় রুচি সেই ভাগ্যবান॥

প্রভুর লীলা, এই অধম ও অক্ষম লেখক অতি সামান্য মাত্রায় আস্বাদ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া যাহা বুঝিয়াছে তাহা এই,—প্রভুর অবতীর্ণ হইবার নানা কারণ ছিল তাহা আপনারা অবগত আছেন, তন্মধ্যে ইহাও একটী কারণ যে, স্বীয় ভক্তগণের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা এবং জগৎ সমক্ষে তাহা প্রকটিত করা। 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের প্রতিমূর্ত্তি হরিদাস দ্বারা নাম মাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ করা, রূপ সনাতন প্রভৃতির দ্বারা ব্রজলীলা-রস-বিভাবিত নাটকাদির প্রচার ও বৃন্দারণ্যের উদ্ধার, শ্রীবাসের অপূর্ব্ব নির্ভরতা; বাসুদেব দত্তের মহানুভবতা সূচক অপূর্ব্ব প্রার্থনা—প্রভৃতি কত নাম লইব। প্রভু নিজে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া ভক্তগণের কার্য্য কলাপ যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল গৌর-ভক্তগণ সাদরে পাঠ করিবেন। তাই বলিতেছিলাম রঙ্গিয়া প্রভুর রঙ্গ দেখুন, তিনি আজ তদীয় প্রিয়তম রামানন্দের এক অপূর্ব্ব চরিত্র ভক্তগণকে আস্বাদ করাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

ডাঃ শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

# গৌররায়

প্রাচীনা এ ভারত মায়ের
আঁচল-ধরা মেয়ে—
আমাদের এ বাঙলা ভূমি।
অসহায়া রুগ্না ক্ষীণা
ছিন্ন যাহার হৃদয়-বীণা
যার দৈন্য পাতাল চুমি'!
বিরস নীরস ইহার পানে
কাহার সদয় দৃষ্টি?
এ নির্জীবিত তপোবনে
করে সরস নবীন সৃষ্টি?
ইতিহাসের বুকে পুন
কে আঁকিল বাঙলা নাম।
তার নত শির উচ্চ করি
কে উঠাল গর্ব্বে ভরি'
মহিমায় তারে কে রচিল
তীর্থ শ্রেষ্ঠ ধাম?
জাগিল এ বাঙলা দেশ
পুণ্যে পুন কার?
সে যে মোদের 'গৌরহরি'
জীবন নদীয়ার॥
দীন কাঙালের দুঃখ লাগি
কাহার হৃদয় খানি
করুণা আবেগ হেতু
স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিরাট ব্যোমে
বাঁধলো সরল সেতু।
বিকাল আত্মখানি,
নবদ্বীপ-ইন্দু সে যে
মোদের, গৌর গুণমণি।
কে শিখাল জগৎ মাঝে
এমন প্রেমের শিক্ষা?
কাহার নিকট পেলে জগৎ
এমন প্রেমের দীক্ষা?
আচণ্ডালে আপন করে'
কেবা দিলে কোল,
কাহার বলে উঠ্‌লো দেশে
নাম প্রেমের রোল,
কে জানে তাহার মহিমা;
উপহাসি জ্ঞান, কর্ম্ম,
বিলাল প্রেমের ধর্ম্ম,
যার মর্ম্ম মোদের বর্ম্ম রচিল
বাড়ায়ে ভক্তি মহিমা!
প্রণমি তাহার পায়;
শুধু নদীয়ার নহে,—বাঙলায়
প্রতি অভাগার সে যে
প্রাণের 'গৌররায়'।

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।

# শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ (৩)

## ( নবদ্বীপ দাদা ও কটকের উকিল আনন্দ বাবু। )

নবদ্বীপ দাদা কটকে আছেন এই সময়ে আনন্দ বাবুর সহিত যে ঘটনা হয় তাহা এই। প্রথমতঃ আনন্দ বাবুর একটু পরিচয় দিই ;—

আনন্দ বাবুর পুরা নাম শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র, কটকের কাটগড়া সাহীতে বাড়ী করিয়াছেন —নাম জাদা বড় উকিল। তারপর তাঁর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে হিন্দুর সহিত কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার সম্বন্ধে চরম পন্থী কিছুতেই বিমুখ নহেন। জাতি ভেদটা কুসংস্কার বলিয়াই তাঁহার ধারণা। প্রতিমা পূজা তাঁহার মতে নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে কোন সারবস্তু আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস নাই। তবে তাঁহার হৃদয়টি কোমল, পরের দুঃখ দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু ঘোর বিলাসী। নিজের মনোবৃত্তি অনুযায়ী সুখ স্বচ্ছন্দতা ও আহার বিহারাদি দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন এবং মনের আনন্দকেই মনুষ্য জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন।

একদিন বেলা ১০টা, আনন্দ বাবু আদালতের পোষাক পরিতেছেন, এমন সময়ে নবদ্বীপ দাদা পাগলের মত আলুথালু মলিন বেশে করতাল বাজাইয়া সহাস্য বদনে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম গান করিতে করিতে আনন্দ বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। আনন্দ বাবুর ভৃত্যগণ তাহাদের বাবুর রুচি বিগর্হিত ওরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু নবদ্বীপ দাদার সে কথায় ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি আনন্দচিত্তে নামগান করিতেছেন আনন্দ বাবু বৈঠকখানা হইতে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"এখানে কি চাস ?" দাদার খেয়াল নাই তিনি আপন মনে নাম করিতেছেন। আনন্দ বাবু বিরক্ত হইয়া কর্কশ ভাবে বলিলেন "এই পাগলা ! কথা শুনছিস্‌না, এখানে কি চাস্।" এই বার যেন দাদার কাণে কথাটা প্রবেশ করিল তিনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কিছুই না।"

আনন্দ।—তবে কি ক'রতে এখানে এসেচিস্ ?

নবদ্বীপ।—জানি না।

আনন্দ বাবু তখন চারিটি পয়সা দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিবার জন্য একজন

ভৃত্যের উপর আদেশ করিয়া বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। ভৃত্য পয়সা লইয়া ইহাঁকে দিতে গেলে ইনি তাহা না লইয়া পূর্ব্ববৎ নামই করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবু তখন বৈঠকখানা হইতে ভৃত্যকে ধমক দিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, "ওকে পয়সা দিয়ে বিদায় করে' দেনা রে?" ভৃত্য অতি ত্রস্ত ভাবে বাবুর নিকট গমন করিয়া বলিল, "আজ্ঞে লোকটা যে পয়সা নেয় না, যেতেও চায় না।" তখন বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"বেটা বদমাস! এখানে বদমাইসি করতে এসেচো, দাঁড়া আমি যাচ্চি।" ভৃত্য আসিয়া তাড়াতাড়ি দাদাকে বলিল—"ওরে! বাবু আসছে, পালা পালা নইলে এখনই মার খাবি।" দাদা সে সময় একটু হাঁসিয়া আরও একটু উচ্চকণ্ঠে নাম গান করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবু তখন আদালত যাইবার পোষাকে বাইরে আসিয়া দাদাকে বলিলেন—"হারে তুই কি চাস?" দাদা কোন কথা না বলিয়া প্রেমময় দৃষ্টিতে আনন্দ বাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। আনন্দবাবু তখন দাদাকে পাগল ইহাই দৃঢ় ধারণা করিয়া একটু মৃদুভাবে বলিলেন—"এই পয়সা নিয়ে চলে যা, কেন মিছি মিছি জ্বালাতন করচিস্?" দাদা তাহাতেও যখন কথা কহিলেন না তখন আনন্দ বাবু বিশেষ বিরক্ত হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন "ওরে চাবুক্ নিয়ে আয়তো! বেটার বদ্‌মাইসি ভেঙ্গে দিই।"

বলিবামাত্রই অভ্যস্থ ভৃত্য কোচমানের নিকট হইতে দ্রুত চাবুক আনিয়া হাজির করিল, ইহাতে দাদা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া যেন আরও আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে যেন কি এক আনন্দময় অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। বদনমণ্ডল পুলকে উল্লাসিত হইয়া ওষ্ঠাধর প্রীতি পূর্ণ মধুর হাস্যে নৃত্য করিতে লাগিল। আনন্দ বাবু বড়ই গোলে পড়িয়া গেলেন। তিনি ইহাকে নগন্য ভিক্ষুক মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিমার্জ্জিত বিচার বুদ্ধি যেন সেরূপ বলিতে চাহে না, তাঁহার বিবেক যেন ইহাকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখিতে বলিল, তাই তিনি চাবুক রাখিয়া একটু কোমল ভাষায় বলিলেন;—"তুমি কি চাও বল দেখি?" দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমায় কিছু খেতে দাও খাব।"

আনন্দ। কি খাবে?

নবদ্বীপ। মুড়ি খাব।

আনন্দ বাবু চারিটী পয়সা বাহির করিয়া—বলিলেন, "এই পয়সা নিয়ে যাও খাওগে।"

নবদ্বীপ।—পয়সা কি হবে, পয়সা কি খাওয়া যায় ?

আনন্দ বাবু বিস্মিত ভাবে একটী সিকি দাদার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"এই নিয়ে মুড়ি কিনে খাওগো।"

নবদ্বীপ দাদা সিকির দিকে দৃষ্টি না করিয়াই হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। আনন্দ বাবু অনিমেষ নয়নে দাদার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দাদাও অদৃশ্য হইলেন আনন্দ বাবুও আদালতে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার দুইদিন পরে বেলা আটটার সময় আবার পূর্ব্ববৎ "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম গান করিতে করিতে নবদ্বীপ দাদা আনন্দ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। আনন্দ বাবু তখন বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিতে ছিলেন। ইহাঁর কণ্ঠস্বর শুনিবা মাত্র যেন কেমন হইয়া গেলেন। একজন ভৃত্যকে বলিলেন "ঐ পাগলাকে ডেকে আনতো ?" ভৃত্য হুকুম মত পাগল্ দাদাকে ডাকিয়া আনিল। সেদিন দাদার বেশ কিছু অন্য রকম। নাসিকায় তিলক, চাদর খানি গলায় বাঁধা। আনন্দ বাবু দেখিবা-মাত্রই মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে, আজ আবার কি মনে করিয়া ? আজ যে আবার অন্য রূপ ভবা সভ্য বেশ দেখ্‌চি। গলায় মালা, কপালে তিলক দেখ্‌তে বৈষ্ণব বলে' বোধ হয়! তা কেন এসে বল দেখি ?"

নবদ্বীপ নিরুত্তর কেবল মৃদু মৃদু হাসি ও সরলতা পূর্ণ দৃষ্টিতে আনন্দ বাবুর হৃদয় দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন। আনন্দ বাবু কোনও উত্তর না পাইয়া বলিলেন—"কিহে, কিছু জবাব নেই যে! এস এগিয়ে এস ?"

নবদ্বীপ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আনন্দ বাবুর টেবিলের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। আনন্দ বাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "ঐ চৌকিতে বোস।" দাদা বসিলেন। আনন্দ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে, ব্যাপারটা কি বল দেখি ?" দাদা নিরুত্তর।

আনন্দ :—তোমার নাম কি ?

নবদ্বীপ।—(মৃদু হাসিয়া) অনেকে নবদ্বীপ দাস বলে।

আনন্দ।—কি মনে করে' এখানে এসেছো ?

নবদ্বীপ।—আমার কিছু খেতে দাও।

আনন্দ।—কি খাবে ?

নবদ্বীপ।—মুড়ি খাব।

আনন্দ।—আচ্ছা তা না হয় দিলাম। তুমি এখানে কোথায় থাক ?

নবদ্বীপ।—আমি কাঙাল, আমার আবার থাকার নির্দ্দিষ্টতা কি? যে দিন যেখানে আশ্রয় পাই সেইদিন সেইখানেই থাকি।

আনন্দ।—খাও দাও কোথায়?

নবদ্বীপ।—যেদিন যেখানে যা জোটে।

আনন্দ বাবু একটা টাকা ইহার নিকট দিয়া বলিলেন "এই নাও, মুড়ি খেতে চাচ্ছিলে খাওগে।"

নবদ্বীপ।—তাতো খাবো, তুমিতো দিতে পারলে না, আমি চাচ্ছি মুড়ি, তুমি দিচ্ছ টাকা। হায় হায় সংসারটা এমনিই মজার বটে, এক চাই আর পাই। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে চেয়ার হইতে উঠিলেন। আনন্দবাবু একটু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন—"আরে শোন শোন, বোসো, আমি না হয় মুড়ি আনিয়ে দিচ্ছি।"

নবদ্বীপ। আচ্ছা আর এক দিন হইবে। বলিয়া পূর্ব্ববৎ নাম করিতে করিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। টাকাটী যেখান কার সেই খানেই পড়িয়া রহিল।

চারি পাঁচ দিন পরে একদিন অপরাহ্ণ ছয় টার সময়ে আনন্দ বাবু আদালত হইতে আসিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া সটকায় তামাক খাইতেছেন নিকটে একটী অল্পবয়স্কা বালিকা খেলা করিতেছে, এমন সময়ে নবদ্বীপ দাদা পূর্ব্ববৎ করতাল বাজাইয়া "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম "নাম করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ আনন্দ বাবু ইহঁাকে দেখিবা মাত্রই অতিশয় ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে এস এস তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।" ভৃত্যকে আর এক খানা চেয়ার আনিতে আদেশ করিবামাত্র সে চেয়ার লইয়া আসিলে দাদা তাহাতে উপবেশন করিলেন।

আনন্দ বাবু। তবে ঠাকুর, আজ কি মনে করে' বল দেখি?

নবদ্বীপ। সেদিন বলে গিছলুম, তাই আজ মুড়ি খেতে এসেছি।

আনন্দ। মুড়ি কেন, অন্য কিছু খাবার খাও আনিয়ে দিই।

নবদ্বীপ। না না মুড়ি খাব। দিতে পারতো বল না হয় চলে যাই।

আনন্দ। আচ্ছা তাই আনিয়ে দিচ্ছি। এই বলিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য শশব্যস্তে মুড়ি আনিতে গেল।

আনন্দ। আচ্ছা তুমি রোজ রোজ আমার নিকট আস কেন?

নবদ্বীপ। তুমি বলতে পার, রোজ রোজ তুমি কাছারী যাও কেন?

আনন্দ বাবু নবদ্বীপ দাসের এই কথায় একটু আশ্চর্য্যান্বিত এবং ঈষৎ বিরক্তও হইলেন। কারণ তাঁহার স্তায় প্রতিষ্ঠাবান্ সুশিক্ষিত ধনী ব্যক্তিকে সামান্ত একটা পথের কাঙাল যেরূপ নির্ভীক ভাবে প্রশ্ন করিল ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারই কথা। আনন্দ বাবুর ধারণা তিনি একজন বক্তা, সুমীমাংসক ও শিক্ষিত। যে কেহই তাঁহার সহিত কোন বিষয় লইয়া বিচার করিতে আসে, সকলেই প্রায় তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিকট পরাভূত। অল্পবয়সে যে আনন্দ বাবু অনেক পক্ককেশ, লব্ধ প্রতিষ্ঠ প্রবীণ প্রবীণ ব্যক্তিকে এজলাসে নাস্তা নাবুদ করিয়া নিজ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া থাকেন, আজ তিনি একটা ভিক্ষুকের প্রশ্নের উত্তর দিতে থত মত খাইলেন। এই সমস্ত অহঙ্কারের মূলে আঘাত হইবার দরুণই ঈষৎ বিরক্ত সহকারে বলিলেন, "আমি যে জন্ম আদালতে যাই, তুমিও কি ঠিক সেই জন্তই আমার নিকট আস ?"

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

# বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে দীনেশ বাবু ও গোবিন্দ দাসের কড়চা।

( ১ )

রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী আলোচনায় গোবিন্দ দাসের কড়চা পুস্তককে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভয়াবহ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দীনেশ বাবু মহাপ্রভুর লীলাচরিতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ শ্রীচৈতন্তভাগবত, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, মুরারি গুপ্তের কড়চা, শ্রীচৈতন্তচরিত কাব্য, কবিকর্ণপুরের চৈতন্তচরিতামৃত মহাকাব্য ও চৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া এক নিতান্ত আধুনিক, প্রক্ষিপ্তাংশ পূর্ণ জাল বহি গোবিন্দ দাসের কড়চা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করতঃ মহাপ্রভুর যথার্থ চরিত্র-চিত্রটিকে বিকৃত করিয়াছেন, এবং উহাই তাহার প্রসিদ্ধ পুস্তকাবলী দ্বারা জগতে প্রচারিত হইতেছে। এই

রূপে দীনেশ বাবুর ভ্রমপূর্ণ মত বহুলোকের ভ্রমের কারণ স্বরূপ হইয়াছে। দীনেশ বাবুর হস্তে মহাপ্রভুর চিত্র বাউলিয়া কিম্বা সহজিয়া চিত্রই হইয়াছে। কিন্তু এই চারিশত বর্ষকাল ধরিয়া মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণ ও মহাজন গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক যেভাবে গৃহীত, স্থাপিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছেন, দীনেশ বাবুর চিত্র সেই সত্যচিত্র হইতে বহু পর্য্যায় দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। ইহা দীনেশ বাবু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন। দীনেশ বাবুর এই মহাভ্রম গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষ বেদনার কারণ হইয়াছে।

দীনেশ বাবু কি করিয়াছেন? তিনি মহাপ্রভুর জীবনীর শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থনিচয় উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পরম পূত লীলায় বিপর্য্যয় সংঘটন করিয়াছেন। আর তিনি গোবিন্দ দাস কর্ম্মকার, যাহার উল্লেখ কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে নাই, তাহাকে দক্ষিণ ভ্রমণে মহাপ্রভুর বিশ্বস্ত অনুচর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দ দাসের নামে প্রচারিত কড়চা পুস্তক যাহা একান্ত আধুনিক এবং যাহার ভাষা ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের ভাষা বলিয়া কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না, সেই গোবিন্দ দাসের কড়চা পুস্তককে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের (মহাপ্রভুর সম সাময়িক) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দীনেশ বাবু কি করিয়াছেন? তিনি গোবিন্দের কড়চা অবলম্বনে ধর্ম্ম-সংস্থাপক, সন্ন্যাস আশ্রমী মহাপ্রভুর দ্বারা সত্যবালা নাম্নী বেশ্যাকে আলিঙ্গন করাইয়াছেন। সে স্থানে গোবিন্দের কড়চার উক্তিটা এই—(মহাপ্রভু) "সত্যকে বাহুতে ছাঁদি বলে হরি হরি।" অর্থাৎ সত্যবালা নাম্নী বেশ্যাকে বগলে করিয়া মহাপ্রভু হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু এই উক্তিটি—তাহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দীনেশ বাবুর অবলম্বিত গোবিন্দ দাসের কড়চা কি করিয়াছে? সন্ন্যাসের কঠোরতায় দীক্ষিত মহাপ্রভুকে গোবিন্দের স্ত্রীর সহিত আলাপ করাইয়াছে। কাশীমিশ্র নামক গৃহস্থ-গৃহে মহাপ্রভুকে স্বহস্তে রন্ধনাদি করাইয়া ভূরি ভোজন করাইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পেটুক গোবিন্দ কর্ম্মকারের অতিরিক্ত ভোজনে পেট ফাঁপিলে মহাপ্রভুর দ্বারা গোবিন্দের পেটে হাত বুলাইয়া দেওয়াও হইয়াছে।

আর কি করিয়াছে? মহাপ্রভুর দ্বারা বারমুখী বেশ্যা প্রভৃতিকে উদ্ধার করাইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতিকে আলিঙ্গন করাইয়াছে, স্বর্ণ-গড়ের রাজার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করাইয়াছে। যাহা সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অপ্রামাণিক ও অসম্ভব।

গোবিন্দের কড়চা বর্ণিত মহাপ্রভু কেমন? তিনি এক জটাজুট ধারী সন্ন্যাসী। গোবিন্দের কড়চার উক্তি—"প্রভুর খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।" গোবিন্দ মহাপ্রভুর মস্তকে জটার ভার দেখিয়াছে। এই কোন্ মহাপ্রভু—? এই সমুদয় ঘটনা লইয়া আমরা যথাস্থানে বিচার করিব।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর নীলাচল যাত্রা, নীলাচল হইতে দক্ষিণাপথে তীর্থ ভ্রমণ, তীর্থ ভ্রমণ অন্তে আলালনাথ হইতে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন, প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে একান্ত বিচার্য্য বিষয় হইবে। সত্যের আগুনে পোড়া দিলে এই সমুদয়ের যত টুকু টিকিবে তাহা নখাগ্রে চিড়িয়া দেখা অসম্ভব প্রতীয়মান হইবে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনায় দীনেশ বাবু কি প্রকার ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, তাহার একটি ক্ষুদ্র নমুনা সর্ব্বাগ্রে পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি। গত মাঘ মাসেও এটী দেওয়া হইয়াছিল, প্রবন্ধের পুর্ণাঙ্গতার জন্য পুনর্ব্বার এখানে দেওয়ায় পাঠকগণ পুনরুক্তি দোষ ধরিবেন না।

দীনেশবাবু তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪র্থ সংস্করণ ২৫৫ পৃষ্ঠায় মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া একটি অত্যন্ত অযথার্থ ও অসঙ্গত উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্তিটি এই—

"প্রভু বলে যে জন ডোমের অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্ব থায়॥"

অর্থাৎ মহাপ্রভু বলিতেছেন, যে, যে ব্যক্তি ডোমের ভাত খাইবে সে-ই কৃষ্ণ ভক্তি পাইবে এবং কৃষ্ণ পাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর নিশ্চয়ার্থক 'ই' যোগে সেই ব্যক্তিই কৃষ্ণ পাইবে, অন্যে পাইবে না। দীনেশ বাবু এই একান্ত অশাস্ত্রীয় ও অসঙ্গত বাক্যটি মহাপ্রভুর নামের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান যুগের বিকৃত সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়াছেন। দীনেশবাবু মহাপ্রভুর এই উক্তিটি কোথায় পাইলেন? লিখিয়াছেন শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড হইতে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাঠকবর্গ জানেন, এই প্রকার অসঙ্গত উক্তি সমগ্র চৈতন্য ভাগবতের কুত্রাপি নাই।

দীনেশ বাবুর এই হাস্যোদ্দীপক ভ্রমটীর মূল খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে আমি। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্য খণ্ড ১০ম অধ্যায়ে যাহা পাইলাম তাহা পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রকাশ করিতেছি। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড ১০ম অধ্যায় প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত সংস্করণ—

( মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি কালে )

একদিন শ্রীঅদ্বৈত সিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা আজি ভিক্ষা কর ইথি"
মুষ্ট্যেক তণ্ডুল প্রভু রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর ধন্য হউক তোমার ভক্ষণে॥
( তখন ) প্রভু বোলে যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥

শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে বলিতেছেন, প্রভু আজি আমার গৃহে দুটি ভিক্ষা গ্রহণ কর, আমি নিজহস্তে এক মুষ্টি রন্ধন করিব। তুমি গ্রহণ করিলে আমার হস্ত পবিত্র হইবে। তখন প্রভুর উক্তিটি এই—

প্রভু বলে যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥

পাঠকগণ দীনেশবাবুর ভ্রমের প্রকার বুঝিলেন? তিনি "তোমার স্থানে "ডোমের" করিয়াছেন। এবং এই ডোমের ভাত খাওয়াইয়া বর্ত্তমান-যুগকে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দিতেছেন! কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া "তোমার" স্থানে "ডোমের" আইসে কিরূপে? হায়, শ্রীঅদ্বৈত! আজ প্রবীন সাহিত্য সেবকের হস্তে পড়িয়া তোমায় ডোম হইতে হইয়াছে।

অতঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয় গোবিন্দ দাসের কড়চা। সর্ব্বাগ্রে এই কড়চার রচনা কালটি বিচারের নিমিত্ত ইহার ভাষা ও কবিত্বের নমুনা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি। ইহা হইতে অতি সহজেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। দীনেশবাবু এই কড়চাকে সাড়ে সাত্রি শত বৎসরের বলিয়া নির্দ্ধারণ ও প্রচার করিয়া ইতিহাসে ও সাহিত্যে কি মহা বিপর্য্যয় সংঘটন করিয়াছেন।

দীনেশবাবু গোবিন্দের কড়চা হইতে দুইটি প্রাকৃতিক বর্ণনা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটি নীলগিরি বর্ণনা ও অন্যটি কন্যাকুমারিকা বর্ণনা। দুইটিই একান্ত উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। যথা নীলগিরি বর্ণনা—

কিবা শোভা পা'য় আহা নীলগিরি রাজে।
ধ্যানমগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়।
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥

বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আরোহিয়া।
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥
ঝর্ ঝর্ শব্দে পড়ে ঝরণার জল।
তাহা দেখি বাড়িল মনের কৌতূহল॥
পর্ব্বতের নিম্নভূতে ঘুরিয়া বেড়াই।
নবীন নবীন শোভা দেখিবারে পাই॥
কত শত লতা বৃক্ষ করিয়া বেষ্টন।
আদরেতে দেখাইছে দম্পতি বন্ধন॥
ময়ুর বসিয়া ডালে কেকা রব করে।
নানাজাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে॥
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা॥
রজনীতে কত লতা ধপ ধপি জ্বলে।
গাছে গাছে জোনাকি জ্বলিছে দলে দলে॥

কন্যাকুমারীকা বর্ণনা—

তাম্রপর্ণী পার হ'য়ে সমুদ্রের ধারে।
প্রভু কন্যাকুমারী চলিল দেখিবারে॥
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই।
পর্ব্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাঁই॥
হু হু শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর।
কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর॥
দেখিবারে কিছু নাই তথাপি শোভন।
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে শুদ্ধ হয় মন॥

ইহা গোবিন্দের কড়চার ভাষা। এই ভাষার কাল বিচার করুন। দীনেশ বাবুর মতে ইহা সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা। ইহার আধুনিকত্ব বালকের নিকটেও সুস্পষ্ট। ইহার সহিত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "সদ্ভাব শতকের ভাষা পাশাপাশি করিয়া পাঠ করুন।

"সদ্ভাব শতক" প্রভাত কাল—

তামসী হইল শেষ দিনেশ উদয়।
পরমেশ গুণ গায় বিহঙ্গ নিচয় ॥
সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ ছলে।
মহেশ মহিমা ব্যক্ত করে মহীতলে ॥
সেফালিকা আদি যত পুষ্প তরুগণে।
সুখে দেয় পুষ্পাঞ্জলি প্রভুর চরণে ॥
অনিল দোদুল্যমান বিটপী নিকরে।
স্মর সে পরমেশ্বরে শর্ শর্ স্বরে ॥
ঝর ঝর করিতেছে প্রেমাশ্রু পতন।
ভ্রমে ভাবে তুহিনের পাত নরগণ ॥

পুনশ্চ সচিত্র প্রেম বর্ণনে—

রঞ্জিত বিবেকাঞ্জনে যাহার নয়ন।
সেই পায় সে পুরের দ্বার দরশন ॥

নিদাঘ নিশীথ ভ্রমণে—

একদা নিদাঘ কালে নিশীথ সময়।
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয় ॥
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে।
চলিলাম বাহিরেতে সমীর সেবনে ॥
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন।
ডুবিল বিমল সুখ সিন্ধুসমে মন ॥
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে।
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে ॥

ইত্যাদি।

পাঠকগণ সম্ভাব শতকের মনোরম প্রাকৃতিক বর্ণনা ও কবিত্বের অনুকরণ প্রয়াস ও সাদৃশ্য গোবিন্দের কড়চার রচনায় ভাল করিয়া লক্ষ্য ও অনুভব করুন।

গোবিন্দের কড়চার ভাষা ও রচনার নমুনা প্রদর্শন করিলাম। দীনেশ বাবুর মতে ইহাই মহাপ্রভুর অনুচর কর্ত্তৃক লিখিত। দীনেশ বাবু এই কড়চার মহিমা তাহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত করিয়া বলিয়া-

ছেন, "আমরা নানা কারণে এই পুস্তকখানা চৈতন্যদেব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করি।" আমরা তার এই উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিধ্বনি করিয়া বলি "আমরা নানা কারণে এই পুস্তককে একান্ত অপ্রামাণিক ও মিথ্যা বলিয়াই মনে করি।" দীনেশ বাবুর "শ্রেষ্ঠ প্রামাণিকতা" কথাটির মর্ম্ম পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন।

দীনেশবাবুর সমগ্র জীবনব্যাপী অক্লান্ত সাহিত্য সাধনার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াও আমরা তাঁহার গুরুতর ভ্রম ও অসত্য প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া পারিতেছি না। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

শ্রীযোগেন্দ্র মোহন ঘোষ।

# শ্রীবৈষ্ণব-ইতিহাস

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

| শকাব্দ | | খৃষ্টাব্দ |
|---|---|---|
| ১৪৩৬ | (আশ্বিন বিজয়াদশমী) শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল ত্যাগ ও গৌড়যাত্রা | ১৫১৪ |
| ১৪৩৬ | (আশ্বিন) মুসলমান ঘাটরক্ষককে উদ্ধার | ঐ |
| ঐ | (কার্ত্তিক কৃষ্ণাদ্বাদশী) পানিহাটিতে শ্রীরাঘবভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন | ঐ |
| ঐ | (ত্রয়োদশী) কুমারহট্টে (হালি সহরে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবাসালয়ে গমন | ঐ |
| ঐ | (চতুর্দ্দশী) কাঞ্চনপল্লীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীশিবানন্দ সেনের ও বাসুদেব দত্তের বাটীতে আগমন | ঐ |
| ঐ | (প্রতিপদ) শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতালয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন | ঐ |
| ঐ | (কার্ত্তিক শুক্লপক্ষ) শ্রীনবদ্বীপে বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বাচস্পতির আলয়ে মহাপ্রভুর গোপনে আগমন ও স্থিতি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রার্থনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাষ্ঠ পাদুকা তাঁহাকে সমর্পণ। কুলিয়ার মাধব দাসের বাটিতে সাতদিন স্থিতি ও দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন | ঐ |
| ঐ | (অগ্রহায়ণ) শ্রীগোবিন্দ ঘোষকে অগ্রদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ত্যাগ ও তথায় বাস করিতে আজ্ঞা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়নগরে আগমন ও শ্রীরূপ সনাতনকে কৃপা এবং কনাই নাটশালা হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন | ঐ |

১৪৩৬ (পৌষ) গৌড় হইতে প্রত্যাগমন পথে পদ্মাতীরে "নরোত্তম দাসকে" আহ্বান ঐ

ঐ (পৌষসংক্রান্তি) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীউদ্ধারণদত্তের আশ্রমে উদ্ধারণপুরে আগমন ১৫১৫

ঐ (মাঘ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীখণ্ডে আগমন এবং অগ্রদ্বীপে প্রত্যাগমন ও শ্রীগোবিন্দ ঘোষের গৃহে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, পুনরায় শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতালয়ে আগমন ও মাধবেন্দ্রপুরীর নির্য্যাণ পর্য্যন্ত স্থিতি ঐ

ঐ (ফাল্গুন) শান্তিপুরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আগমন। অম্বিকায় গৌরীদাস আলয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক "নিতাই গৌর" শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। কুমারহট্টে শ্রীবাসালয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাটী আগমন ও খঞ্জ শ্রীভগবান আচার্য্যের স্ত্রীকে পুত্র বর দান। পানিহাটীতে শ্রীরাঘব ভবনে পুনরাগমন ঐ

ঐ (ফাল্গুনী কৃষ্ণাদ্বাদশী) বরাহনগরে আগমন ও শ্রীভাগবতাচার্য্যকে কৃপা ঐ

ঐ (প্রথম চৈত্র) শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়ে রাখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ত্যাগ ঐ

ঐ (শেষ চৈত্র) শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন শ্রীরূপ ও অনুপমের গৃহত্যাগ ও শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা ঐ

১৪৩৭ (আশ্বিন বিজয়াদশমী) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা ঐ

ঐ (অগ্রহায়ণ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাশীধামে আগমন, শ্রীতপন মিশ্র ও শ্রীচন্দ্রশেখর সেনকে কৃপা, শ্রীসুবুদ্ধিরায়কে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ ঐ

ঐ (পৌষ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রয়াগে আগমন ও তিন দিন স্থিতি মথুরায় আগমন ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে কৃপা ও তৎসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন আগমন ও শ্রীগোবর্দ্ধনে লাহোরবাসী কৃষ্ণদাসকে কৃপা, গুঞ্জামালা প্রদান ও কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী নাম দিয়া এবং শক্তি সঞ্চার করিয়া পশ্চিমদেশ উদ্ধার করিতে প্রেরণ। থানেশ্বরী জগন্নাথকে কৃপা। ঐ

ঐ * (মধ্য পৌষ) শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ ও শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ। ১৫১৬

ঐ (শেষ পৌষ) পথে পাঠান রাজপুত্র বিজলী খাঁকে ও তাহার ধর্ম্মগুরু

সহ সৈন্যগণকে কৃপা এবং ধর্ম্মগুরুর নাম রামদাস করণ এবং প্রয়াগে আগমন ঐ

ঐ (মাঘ) শ্রীরূপ ও অনুপমের শ্রীমন্মহাপ্রভু-মিলন, প্রয়াগ-সন্নিকট আঁধুলী গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন ও তথায় ত্রিহুতের পণ্ডিত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়কে কৃপা, প্রয়াগে শ্রীরূপকে দশ দিন রাখিয়া তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাদান ও শক্তিসঞ্চার। শ্রীরূপ ও অনুপমকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ। ঐ

১৪৩৭ (মাঘ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রয়াগ ত্যাগ। ঐ

ঐ (শেষ মাঘ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাশীধামে শ্রীতপন মিশ্র ও শ্রীচন্দ্রশেখরালয়ে আগমন ও তথায় শ্রীসনাতন মিলন। শ্রীরূপ ও সনাতনের বৃন্দাবন আগমন ও শ্রীসুবুদ্ধি রায় মিলন। ঐ

ঐ (ফাল্গুন) শ্রীরূপ ও অনুপমের শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ ও গৌড়যাত্রা ঐ

ঐ (চৈত্র) কাশীতে শ্রীসনাতনকে দুইমাস যাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শিক্ষাদান ও শক্তি সঞ্চার এবং পরে বৃন্দাবনে প্রেরণ। শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী নাম দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাশীত্যাগ। ঐ

১৪৩৮ শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্ঠলনাথের জন্ম ১৫১৬

ঐ (চৈত্র) শ্রীরূপের নীলাচল ত্যাগ ও গৌড়মণ্ডল যাত্রা ১৫১৭

ঐ (শেষ চৈত্র) শ্রীসনাতনের শ্রীবৃন্দাবনে আগমন। ঐ

১৪৩৮ (শেষ বৈশাখ) শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন ও গৌড়মণ্ডলে সংবাদ প্রেরণ শ্রীরূপ ও অনুপমের গৌড়ে প্রত্যাগমন ও পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে অনুপমের দেহত্যাগ। ঐ

১৪৩৮ (জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়) শ্রীরূপের ও গৌড়মণ্ডলের ভক্তগণের নীলাচল যাত্রা ও নীলাচলে আগমন। শ্রীরূপের শ্রীযবন হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে স্থিতি ঐ

১৪৩৯ (বৈশাখ) শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আগমন ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট অবস্থান। পথিমধ্যে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১৫১৭

ঐ (জ্যৈষ্ঠ) গৌড়মণ্ডলের ভক্তগণের নীলাচলাগমন। ঐ

ঐ (জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী) পানিহাটীর দণ্ডমহোৎসব। ঐ

ঐ (আষাঢ়) শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপালিঙ্গন দানে কুষ্ঠব্যাধি হইতে আরোগ্য করেন। ঐ

ঐ দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দর লোদীর রাজ্য শেষ ও ইব্রাহিম লোদীর রাজ্যারম্ভ। ঐ

১৪৪০ শ্রীসনাতন গোস্বামীর নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাত্রা ও বৃন্দাবনে আগমন। শ্রীরূপ গোস্বামীর গৌড়মণ্ডল হইতে শ্রীবৃন্দাবন আগমন। ঐ

১৪৪০ (জ্যৈষ্ঠ) শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর গৃহত্যাগ ও নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় ঐ
১৪৪০ শ্রীকবীরের তিরোভাব ঐ
১৪৪১ গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দিন হোসেন সাহার রাজ্যশেষ ও নাসির উদ্দিন নসরৎ সাহার রাজ্যারম্ভ। ১৫১৯
১৪৪২ শ্রীবল্লভাচার্য্য কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর আবিষ্কৃত শ্রীশ্রীগোপাল জীউর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ১৫২০
১৪৪৪।৪৫ বিষ্ণুপুরাধিপতি শ্রীবীরহাম্বিরের জন্ম ১৫২২।২৩
১৪৪৫ শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের শ্রীপাট দেনুড়ে প্রকাশ ১৫২৩
ঐ চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা শ্রীলোচনদাসের আবির্ভাব।
১৪৪৬ শ্রীকবিকর্ণপুরের আবির্ভাব ১৫২৪
১৪৪৭ (ভাদ্র শুক্লা চতুর্দ্দশী) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব ১৫২৫
১৪৪৮ দিল্লীর বাদশাহ ইব্রাহিম লোদির রাজ্য শেষ ও বাবরের রাজ্যারম্ভ ১৫২৬
১৪৪৯ পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাসের আবির্ভাব ১৫২৭
১৪৫১ শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহত্যাগ ও নীলাচল যাত্রা ১৫২৯
১৪৫২ পদকর্ত্তা শ্রীজ্ঞানদাসের আবির্ভাব ১৫৩০
ঐ দিল্লীর বাদশাহ বাবরের রাজ্য শেষ ও হুমায়ুনের রাজ্যারম্ভ। ঐ
১৪৫৩ শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন ১৫৩১
ঐ শ্রীবল্লভাচার্য্যের তিরোভাব ঐ
ঐ শ্রীজাহ্নবাঠাকুরাণীর প্রতিপালিত শ্রীকানাই ঠাকুরের আবির্ভাব ঐ
ঐ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বৃন্দাবন যাত্রা ঐ
ঐ (মাঘী পূর্ণিমা) শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব ১৫৩২
ঐ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর বৃন্দাবন যাত্রা ঐ
ঐ গৌড়ের বাদসাহ নাসিরুদ্দীন নসরৎ সাহার রাজ্য শেষ ও আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহার রাজ্যারম্ভ ঐ
১৪৫৪ (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত কর্ত্তৃক চাতরায় শ্রীশ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহ প্রকাশ ১৫৩২
১৪৫৪ শ্রীকমলাকর পিপলাইয়ের মাহেশে আগমন ঐ
ঐ শ্রীতুলসীদাসের আবির্ভাব ঐ
১৪৫৫ (৩রা আষাঢ় শুক্লাষ্টমী, রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহর) শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে লীলাবেশান ১৫৩৩

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীমুরারিলাল অধিকারী
১২ এক্ মুসলমানপাড়া লেন
কলিকাতা

# শ্রীশ্রীসরস্বতী-বন্দনা

জয় জয় বীণাবাদিনী।
বীণাবাদিনী অমৃত স্যন্দিনী
চিরদিন অঘনাশিনী ॥
ফুল্লবদনা বরদা শুভদা
বেদপুরাণকলাবিদ্যাপ্রদা
জ্ঞান বৈরাগ্য ধর্ম্মার্থ মোক্ষদা।
ভক্তি প্রেমানন্দ দায়িনী ॥
সিতবরণা শ্বেতাম্বরধরা
মণি মৌক্তিক সিতপুষ্পহারা
শ্বেত মরাল বাহন সুখরা
শ্বেত শতদল বাসিনী ॥
কম্বুকণ্ঠা যাঁর কণ্ঠে কর স্থিতি
সুগীতি তরঙ্গে সে ভাসায় ক্ষিতি
( তায় ) বীণার ঝঙ্কারে মুগ্ধ চরাচরে
সে চির অমর যাবত মেদিনী ॥
(তুমি) আদ্যাশক্তি পরম পুরুষপ্রকৃতি
কটাক্ষে তোমার সৃষ্টি লয় স্থিতি
(তুমি) কৃষ্ণ প্রেয়সী রাধিকা শ্রীমতী
জয় জয় লক্ষ্মী নারায়ণী ॥
পুণ্য আর্য্য কিবা ম্লেচ্ছ যবন
দ্বিজোত্তম কিবা শ্বপচ অধম
সকলেই তব করুণা সমান
জয় ভগবতী বাণী ॥
স্বগুণে অধমে দে মা পদধূলি
অভিমানে যেন দিয়ে জলাঞ্জলি
হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম বলি
প্রেমেতে লুটাই ধরণী ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।

# ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

[ ২৩শ বর্ষ, চৈত্র ১৩৩১, বৈশাখ ১৩৩২, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা ]

## প্রার্থনা

কিহবে আমার হরি কিহবে আমার।
অশান্তি হৃদয়ে ধরি, দিবানিশি জ্ব'লে মরি,
হৃদিমাঝে অহরহ উঠে হাহাকার।
হবে নাকি শান্তিপূর্ণ হৃদয় আমার?
আর কতকাল যাবে, মুখ তুলে কবে চাবে,
কর্ম্মফলে হৃদি জ্বলে নিয়ত আমার।
তোমা বিনা কেবা আছে লয় মম ভার?
পতিত পাবন তুমি করুণা আধার।
কৃপা করি লহ দেব অভাগার ভার॥

ধন্য—ধন্য অনন্ত লীলাবিলাসি! তোমার লীলা ধন্য, তোমার সৃষ্ট এই বিচিত্র সংসার চক্র ধন্য, আর ধন্য তোমার জীব। কতকাল ধরিয়া, কত দেহে, কত রকম করিয়া যে তোমার তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি জানি না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য আজ পর্য্যন্ত তোমার এ অভিনব লীলা খেলার এক কণাও বুঝিতে পারিলাম না। অন্য কথা দূরে থাকুক যাহাদের লইয়া সংসার সাজাইয়া আছি, আমার প্রত্যেক কর্ম্মে যাহারা আমার আত্মীয় বলিয়া, বন্ধু বলিয়া, আমার অত্যন্ত নিজ জন বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদেরও মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম না। নিতান্ত সরল প্রাণে শুধু একটু শান্তি পাইব ভাবিয়া বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিশিতে

যাই কিন্তু কি জানি কেন তাহাদের নিকট ঠকিয়া গিয়া, বোকা, অপরিণামদর্শী বলিয়া পরিচিত হই। ফলে শান্তিত পাই-ই না অধিকন্তু বন্ধুত্ব বজায় রাখিতে গিয়া কপটতার আশ্রয় লইয়া প্রাণের ভাব নষ্ট করিয়া কিম্ভূত কিমাকার হইয়া ফিরিয়া আসি। ক্রমে ক্রমে এই ভাবের প্রাবল্যে প্রাণের ভাব শুকাইয়া চিত্তাবৃত্তি সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তার অসৎ অভিপ্রায়, অসৎভাব, দুরাকাঙ্খাদি সম্যক প্রকারে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসে।

এক বার দুই বার নয় বার বার এই ভাবে ঘুরিয়া—প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হওয়ায় শান্তির পরিবর্ত্তে ঘোর অশান্তিই ভোগ করিতেছি। আর যে পারিনা দয়াময়! তোমার সৃষ্ট বিচিত্র গতি সংসারের বিচিত্রতা দেখিয়া যথার্থই বড় ভীত হইয়াছি, তাই আজ আর কাহারও নিকট না জানাইয়া তোমাকে শরণাগত পালক দুঃখহারি জানিয়া তোমার শরণ লইলাম। আমাকে দেখাইয়া বুঝাইয়া—প্রাণে প্রাণে জানাইয়া দাও, কোন্ ভাবে চলিলে তোমার সৃষ্ট প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত নির্ম্মল ভাবে তোমার প্রেম, তোমার ভাব অনুভব করিয়া ধন্য হইতে পারি।

বলিতে কি প্রভু! তোমার কৃপায় একদিন এমন ছিল যাহা ভাবিলা, এখন কার অবস্থার সহিত তুলনা করিলে দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যায়। না জানি কোন্ দুর্দ্দিব বশে সে ভাব একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে অযাচিত ভাবে যাহা পাইতে ছিলাম এখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার একবিন্দু পাইতেছি না। দয়াময়! ইহার কারণ কি? যদি বাহিরের সঙ্গ আমার সকল নষ্ট করিয়া দিয়া থাকে তবে এই মুহূর্ত্তেই আমার সব সঙ্গ দূর করিয়া দাও। ধন জন, মান, বা বন্ধুত্ব রাখিলে যদি তোমার ভাবলাভে বঞ্চিত হইতে হয়, কাজ কি ঠাকুর আমার ধন জন মান বন্ধুত্বে? আমাকে সর্ব্বদা তোমার প্রাণ মাতান ভাবে মাতাইয়া রাখ, ভাব লাভের অন্তরায় যাহা কিছু আছে তাহা আপাততঃ আমার যতই প্রিয় হউক না কেন সব দূর করিয়া দাও। অন্ধের মতন আর বৃথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মোহগর্ত্তে ফেলিয়া যাতনা প্রদান করিও না। তোমার ভাব হারাইয়া পশুর ন্যায় আহার বিহারাদিতে প্রমত্ত হইয়া কি যাতনা ভোগ করিতেছি সর্ব্বান্তর্যামী তুমি কি তাহা জানিতেছ না? তোমাকে বলিয়া বুঝাইবার আর কিছু নাই, তুমি অন্তর্য্যামী তুমি নির্ম্মল, তুমি সৎ, তুমি আনন্দময়। তুমি কৃপা না করিলে আর কে কৃপা করিবে? নিরাময় নিরাপদ কোটী চন্দ্র সুশীতল তোমার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়দানে আমার তাপিত ব্যথিত তৃষিত হৃদয় শীতল কর দীনের এবার এইটীই প্রার্থনা।

# বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-মহিমা

"বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরম নির্ব্বাণহেতুনা
পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনম্॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিবার ঐকান্তিকী ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাদের জীবন, যৌবন, কুল, শীল, লজ্জা, ধৈর্য্য সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার চরণকমলে একান্ত আশ্রিতা হইয়াছিলেন, তাই ভগবান জগতে গোপীপ্রেমের অদ্ভুত মাধুর্য্য প্রকটিত করিবার জন্য রাসলীলার অভিনয় করিয়া তাঁহাদের বলবতী বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই ভগবান আবার নিজ মুখেই বলিয়াছেন "—মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"। সুতরাং সংসার তাপদগ্ধ মায়াবদ্ধ মানব যে তাঁহার ভক্তের অধরামৃত পান করিয়া অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার রাতুল চরণচ্ছায়া আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হয় এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সংসারী জীব অপরাধ শূন্য না হইলে কৃষ্ণ প্রেমের অধিকারী হয়না। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজন মানবের অপরাধব্যাধি দূরীভূত করিবার অমোঘ মহৌষধ। নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের অদ্ভুত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্তির পাঠকগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থে দুই একটী দৃষ্টান্ত তাঁহাদের সম্মুখে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভক্তমাল গ্রন্থে একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বৈষ্ণবাধরামৃত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

আচার্য্য প্রভুর বাটীর স্বল্প দূরে একঘর কামারের বসতি ছিল, প্রভুর বাটীতে রোঙা নামে একটী মার্জ্জার প্রতিপালিত হইত। জাতীয় স্বভাবানুসারে মার্জ্জারটী প্রতিবেশীগণের গৃহেও গমনাগমন করিত। একদিন বৈষ্ণব ভোজনের শেষে মার্জ্জারটী বৈষ্ণব-ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া কামারের গৃহে গমন করিয়াছিল, দৈবক্রমে সেদিন তাহার মুখে একটী উচ্ছিষ্টকণা লাগিয়াছিল, কামারবধূ যেখানে ভোজন করিতেছিল সেইখানে গিয়া বিড়ালটী বধূর অন্নে মুখস্পর্শ করিলে সেই উচ্ছিষ্টকণা মুখভ্রষ্ট হইয়া ভোজন-পাত্রে পতিত হইয়াছিল, বধূটী উক্ত উচ্ছিষ্ট-কণা সংযোজিত অন্ন ভোজন করিয়া কৃষ্ণোন্মাদিনী হইয়া হাস্য ক্রন্দন এবং হরি হরি বলিয়া আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনের ফলে কামার বধূর অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু কামারেরা তাহাকে ভূতে পাইয়াছে মনে করিয়া—ওঝা

ডাকাইয়া তৎপ্রতিকারে যত্নবান হইল। ওঝাদের প্রাণপন চেষ্টাতেও যখন ব্যাধির কিছুমাত্র প্রশমন হইল না তখন তাহারা সিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানে আচার্য্য প্রভুর শরণাপন্ন হইল। আচার্য্য প্রভু সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত ও ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া কামারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওরে মূর্খ! তোদের বধূতে ভূতের আবেশ হয় নাই, বধূটী বড়ই ভাগ্যবতী, তাই তাহার কৃষ্ণপ্রেম হইয়াছে। কিন্তু কামারেরা প্রভুর বাক্যে নিরস্ত হইল না বরং বধূটীকে ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য প্রভুকে বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিল। তখন অগত্যা আচার্য্য প্রভু জনৈক যজমানিঞা ব্রাহ্মণের একমুষ্টি অন্ন ভোজন করাইবার ব্যবস্থা দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। কামারেরা প্রভুর আজ্ঞামত সেইরূপ করিলে বধূটী প্রকৃতিস্থ হইল। ভক্তমালগ্রন্থে ঘটনাটী এইরূপই বর্ণিত আছে।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, বধূ ও বিড়াল এই দুইএর মধ্যে অধিকতর সৌভাগ্য কাহার? ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে আচার্য্য প্রভুর গৃহ পালিত বিড়ালটীরই সৌভাগ্য অসীম, পশুজন্ম পাইয়াও যে প্রত্যহ বৈষ্ণবের শেষপাত্র পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল, সেরূপ পশুজন্মও ভক্তগণের কাম্য। বধূটীরও হৃদয় অপরাধ বর্জ্জিত ছিল নতুবা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনে ওরূপ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা কি সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে কবিরাজ গোস্বামী কলিহত পাপ-তাপ-প্রপীড়িত মানবগণের শিক্ষার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন।

"ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত পদজল।
ভক্ত ভুক্তশেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেম হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
এই তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥"

এই কালিদাসের অপূর্ব্ব মহিমা কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিয়া এবারের মত ভক্তির পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

কালিদাস পরমভাগবত এবং উদার প্রকৃতি সম্পন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন প্রিয়ভক্ত ও কৃপাপাত্র ছিলেন। বৈষ্ণবরত্ন রঘুনাথদাসের ইনি জ্ঞাতি খুল্লতাত।

কৃষ্ণনাম তাঁহার জিহ্বাগ্রে বসতি করিয়াছিল, সাংসারিক সমস্ত বিষয়েই তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেন। কথিত আছে তিনি পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাশা চালিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট কালীন গৌড়-দেশে যে সকল বৈষ্ণব আবির্ভূত হইয়াছিলেন তিনি ছোটবড় জাতি নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণশূদ্র সমস্ত বৈষ্ণবকেই উত্তম উত্তম দ্রব্য ভেট দিয়া তাঁহাদের শেষপাত্র গ্রহণ করিতেন। যদি কোনও বৈষ্ণব তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট দানে সঙ্কোচ করিতেন তিনি তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া পরিত্যক্ত ভোজন পাত্র সানন্দে গ্রহণ করিয়া চাটিয়া খাইতেন। একদিন তিনি ঝড়ু নামে ভুইমালী জাতীয় জনৈক বৈষ্ণবের গৃহে সুপক্ক আম্র ভেট লইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া তিনি ঝড়ুঠাকুর ও তাঁহার পত্নীর চরণ বন্দনা করিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঝড়ু ঠাকুর কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহার আহারাদির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বিনয় নম্র বচনে নিবেদন করিয়া বলিলেন—"প্রভু! আমি অত্যন্ত নীচ জাতি। আমার ক্ষুদ্র কুটীরে আপনার ন্যায় মহৎব্যক্তির শুভাগমন হইয়াছে ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। এক্ষণে আমাকে আজ্ঞা দিউন ব্রাহ্মণগৃহে আপনার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া আমি কৃতার্থ হই।" কালিদাস তখন সাতিশয় মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—আমি পতিত অধম জীব, আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, যদি আপনার অধমের উপর বিন্দুমাত্রও অনুগ্রহ থাকে তাহা হইলে আপনার পদরজঃ আমার মস্তকে অর্পণ করিয়া জীবন পবিত্র করুন। ঝড়ুঠাকুর একপ বাক্যে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে বাক্য সংযত করিবার অনুরোধ জানাইলে তিনি শাস্ত্রোক্ত শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণব-মহিমা ও বৈষ্ণবের জাতি বিচারের নিষ্প্রয়োজনীয়তা সপ্রমান করিলেন। ঝড়ু-ঠাকুর তাহাতে জানাইলেন যে, তাঁহার কিছুমাত্র কৃষ্ণভক্তি নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ওরূপ বাক্য প্রযুজ্য নহে বরং তাহাতে তাহাকে অপরাধী করা হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে কালিদাস উক্ত বৈষ্ণব দম্পতীকে পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং গৃহ-প্রত্যাগমনের অভিলাষ জানাইলেন। ঝড়ুঠাকুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর গমন করিয়া—তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া গৃহ প্রত্যাগত হইলেন, এদিকে কালিদাস পথিমধ্যে যে যে স্থানে ঝড়ু ঠাকুরের চরণ চিহ্ন দেখিলেন সেই সেই স্থানের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত করিয়া তাঁহার বাটীর নিকটেই কোন স্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিলেন। ঝড়ুঠাকুর গৃহে আসিয়া সুপক্ক আম্রফল শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহার

ভোজনের পরে তাহার পত্নী প্রসাদ পাইয়া ভুক্তাবশিষ্ট আঁটি ও খোসা বাটীর বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। কালিদাস তখন গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া খোষা ও আঁটি গুলি চুষিয়া খাইলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হইয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেন তখন গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ প্রতিবৎসর নীলাচলে যাইয়া জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আসিতেন। কালিদাসও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত একবার তথায় গমন করিয়া দেবদুর্ল্লভ পাদোদক তিন অঞ্জলি পান করিয়া ভবতৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দের দ্বারা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন কালিদাসকে সমর্পণ করিয়া, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। পতিত পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীব-শিক্ষার জন্য ভাগ্যবান কালিদাসের দ্বারা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনের অনন্তমহিমা জগতে প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাপাত্র কালিদাসের চরণধূলির কামনা করিয়া আমরা এই স্থানেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখনীর বিরাম দিলাম।

শ্রীযদুপতি দাস।

# অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম

( ৯ )

প্রভু বলিতেছেন কিনা, তুমি ভাগ্যবান, তাই কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। কিন্তু কৃষ্ণকথা আমি ত জানি না, তুমি রামানন্দের নিকট যাও তিনিই তোমাকে প্রাণভরিয়া কৃষ্ণকথা শুনাইবেন।

প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর কথার দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া রামানন্দের আবাসে উপনীত হইলেন। সেখানে একজন ভৃত্য তাঁহাকে বসিবার আসন দিলেন। মিশ্র মহাশয় বসিয়া আছেন, একটু পরে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রায় মহাশয়ের আসিবার বিলম্ব হইতেছে কেন? ভৃত্য বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন অল্পক্ষণ পরেই তিনি আসিবেন, তিনি নিভৃত উদ্যানে দুইজন কিশোর বয়স্কা পরমাসুন্দরী দেবদাসীকে (জগন্নাথদেবের সম্মুখে যাঁহারা নৃত্য করেন ও গীতি গাহেন।) স্বরচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটকের নৃত্য গীত শিক্ষা দিতেছেন। সেখানে অপর কাহারও যাইবার অধিকার নাই।" ভালমানুষ মিশ্রঠাকুর এ কথা শুনিয়া

যেন একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "পরম বৈষ্ণব পরম পণ্ডিত ভক্ত রামরায়ের এ কিরূপ চরিত্র! তবে কি রামানন্দ ভণ্ড! একবার ভাবিলেন এমন অপবিত্র স্থান এখনই ত্যাগ করিয়া যাইবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মহাপ্রভুর আদেশ মনে পড়িল। "রামানন্দের নিকট গিয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর।" অগত্যা রামানন্দ রায়ের অপেক্ষায় তিনি সেইখানেই বসিয়া রহিলেন।

একটু পরে রামানন্দ আসিলেন। আসিয়া মিশ্র ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "ঠাকুর আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন আপনার চরণে আমার কত না অপরাধ হইয়াছে। রামানন্দের ভক্তিমাখা মুখশ্রী ও বিনয়পূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া মিশ্রের মনে খট্‌কা লাগিল। তাহার সন্দেহ অনেকটা হাল্‌কা হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "না এমন কিছু নয় আপনাকে একবার দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম। অদ্য অনেক বেলা হইয়াছে আজিকার মত বিদায় হই।" এই বলিয়া মিশ্র ঠাকুর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাম রায় কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিয়া আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন এমন সময়ে প্রদ্যুম্ন মিশ্র আসিলেন। তিনি মহাপ্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আদেশক্রমে উপবিষ্ট হইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রদ্যুম্ন! রামানন্দের মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়াছ ত? মিশ্র ইহাতে রামানন্দ ও দেবদাসীদ্বয়ের বৃত্তান্ত যাহা অবগত হইয়া আসিয়াছিলেন সমস্ত বলিলেন। দেবদাসীদ্বয়ের সহিত রামানন্দের এরূপ নির্জ্জনে উদ্যানবিহারের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণের মর্ম্মেও বড়ই আঘাত লাগিল, তাঁহারাও বলাবলি করিতে লাগিলেন তবে কি রামানন্দ রায় যোষিৎসঙ্গী? সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা পরম দয়াল মহাপ্রভু ভক্তগণের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা ভাবিতেছ তাহা ঠিক, স্ত্রীগণ প্রকৃতই কালসর্প রূপিণী, তাহাদের আকর্ষণে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। স্ত্রীগণের সহিত একত্র অবস্থান করাও ভজনের প্রতিকূল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের আকর্ষণে দেবতারাও স্থির থাকিতে পারেন নাই। আমি যে নিজেকে একজন বিরক্ত সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করি, নারীর মুখ দেখিলে এমন কি তাহাদের নাম শুনিলেও আমার মনে বিকার জন্মে।

আমি ত সন্ন্যাসী আপনাকে বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে রহুক প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥

তবহু বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির রহে কোন জন॥

জীব শিক্ষার্থ মহাপ্রভু এই স্থানে শ্রীমায়ার বলবতী শক্তি নানাভাবে ভক্তগণকে অবগত করাইলেন।

প্রভুর কথায় ভক্তগণের মনের সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। কিন্তু কৃপাময় প্রভু ভক্তগণকে অধিকক্ষণ আর সন্দেহের মধ্যে রাখিলেন না। তিনি বলিলেন রামানন্দের কথা জগতে প্রকাশ করিয়া বলিবার অযোগ্য। কারণ তাহা অতি আশ্চর্য্য কথা। রামানন্দ অতি অপূর্ব্ব রাগানুগামার্গে গোপীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মানসী সেবা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাতে তাহার মন অপ্রাকৃত এবং দেহ সিদ্ধদেহতুল্য হইয়া গিয়াছে। প্রভু বলিলেন—

রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নয় আশ্চর্য্য কথন॥
একে দেবদাসী তায় অপূর্ব্ব সুন্দরী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ হয় তাহা দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গমে তারে করায় শিক্ষন॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য! তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥

নিজেকে গোপিকাগণের কিঙ্করী চিন্তা করিয়া তাঁহাদের অনুগা হইয়া ব্রজে শ্রীমতী রাধিকার বামে শ্রীশ্রীমদনমোহন বসাইয়া তাঁহাদের মানসী সেবা ও লীলার সহায়তা করিতে হইবে। নিজেকে সখীগণের দাসী চিন্তা করা হইয়াছে, এখন সখীগণ নিরবধি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, মিলন ঘটাইতেছেন, বিরহে সান্ত্বনা দিতেছেন, বেশ করিয়া দিতেছেন, শয্যা রচনা করিয়া দিতেছেন, বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া কাঁটা প্রভৃতি সরাইয়া তাঁহাদের গমনের রাস্তা করিয়া দিতেছেন। হাস্য করিয়া, নৃত্য করিয়া, অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করিয়া, গীত গাহিয়া, তাম্বুল যোগাইয়া রক্তকমল সদৃশ পদদ্বয়ে অলক্তক দিয়া শ্রীমতীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সময়ে সময়ে প্রেম-কোন্দল করিয়া শত শত উপায়ে সখীগণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করেন। সুতরাং রাগানুগামার্গে ভজন ইচ্ছুক সাধককে

এই সমস্ত সখীগণের বা ইহাদিগের মধ্যে যে কোন সখীর দাসীরূপে নিজকে চিন্তা করিয়া তাঁহাদের সেবাকার্য্যে কল্পনায় নিজকে সহায়কারীরূপে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। চিন্তিত সখী মনে করা গেল (শ্রীমতী শশিরেখা মনে করা যাউক) শ্রীমতীর অধরে তাম্বুল যোগাইবারর ইচ্ছা করিয়াছেন অমনি তাম্বুল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে দিতে হইবে। দুর্ব্বার মনকে জাগতিক সর্ব্বপ্রকার বিষয় চিন্তা হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া এবম্বিধ ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবায় নিয়োজিত করিতে পারিলে দেহ মন সিদ্ধ ও অপ্রাকৃত হইয়া যায়। মহাপ্রভু আমাদিগকে এই সাধনার পথেই অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্দাসগোস্বামীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বদা যেন আমাদিগের স্মরণ থাকে—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

এই যে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে—ইহাই শ্রীল রামানন্দের সাধনার একমাত্র অঙ্গ ছিল। এবং সাধনায় সিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহ ও মন সিদ্ধ হইয়া ছিল। দেহ ও মন চিন্ময় তত্ত্বে অনুভাবিত হইলে ত্রিগুণ ক্ষোভ নিবারিত হয়। রাগানুগামার্গের ভজনে রামানন্দের দেহ মন কাষ্ঠ এবং পাষাণের মত প্রাকৃত বিষয়ে অনুভূতি বিরহিত হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় প্রাকৃত নারীসঙ্গ চিন্তা মনে স্থান পাওয়া অসম্ভব। তাই রামানন্দের সম্বন্ধে প্রভু বলিতেছেন—

নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য! তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥

অশীতিপর বৃদ্ধ ও অতুলনীয় গৌরভক্ত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দ চরিত্র আলোচনা করিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—আশ্চর্য্য!

বিষয়টী অমিয়-নিমাই-চরিত-গ্রন্থ সাহায্যে আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রদ্যুম্ন বলিলেন "প্রভু তোমার রামরায়কে তুমি জান, আমাদের কিন্তু তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সব ভাল লাগে না। বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতী লইয়া নির্জ্জনে তাহাদিগকে স্নান করান, অঙ্গ মার্জ্জন করান আর অভিনয় শিক্ষা

দেওয়া এ সব কি বড় ভাল কাজ হইল ?" প্রকৃত বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে প্রভুর কৃপাপাত্র ব্যতীত কেহ বুঝিবে না যে কিরূপে নাটক অভিনয় করিতে হয় তাহা দেবদাসীগণকে শিক্ষা দেওয়া শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার একটি কার্য্য। স্থূল কথায় ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। লোকে নাট্যশালা করে তাহাতে অভিনয় করিয়া উহা হইতে আনন্দ অনুভব করে। সংগীত দ্বারাও উহাই করে। লোকে পুষ্প সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে আনন্দ সংগ্রহ করে। যাহারা কৃষ্ণের অধীন যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ মমতা কি প্রীতি করেন, তাঁহাদের ইচ্ছা করে যে, তাঁহাকে এই সমুদায় আনন্দের আস্বাদ করান। যত যত ভাল ভাল দ্রব্য আছে, স্ত্রী তাহা স্বামীকে দিতে চাহেন। তাই রামরায় কবি কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ, আপনি নাটক করিয়া নাট্যশালা করিয়া কৃষ্ণকে উহা দেখাইবেন শুনাইবেন—সেই নিমিত্ত, যেন রসাভাস না হয়, অভিনয় বিশুদ্ধ হয়, তাই দেবদাসীগণকে শিক্ষা দিতেছেন। সুন্দরী ও যুবতী কেন বাছিয়া লইয়াছেন, না—তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় গোপী সাজিতে হইবে। তাঁহাদিগের রূপ না থাকিলে যে রসাভাস হইবে। যিনি কুরূপা তিনি কি শ্রীমতী রাধিকা সাজিতে পারেন ?"

"রামানন্দের এই যে ভজন ইহা সর্ব্বোত্তম, ইহা হইতে সূক্ষ্ম সুপবিত্র সুধাময় ভজন আর হইতে পারে না। এ ভজন জগতে আর কোথাও নাই, কোথাও ছিল না, কেবল বৈষ্ণবগণের মধ্যে আছে। একটি কবিতা আছে—

পূর্ণ চাঁদ আলা, বনফুল মালা,
বাতাবী ফুলের গন্ধ।
শিশির দূর্ব্বার, রস কবিতার,
পদ্ম ফুল মকরন্দ॥
সুস্বর সুরূপ, নৃত্য ও সোহাগ
সতৃষ্ণ নয়ন-বান।
প্রেমানন্দ ধার, মধু হাসি আর,
লজ্জা, আলিঙ্গন, মান॥
এই আয়োজনে, পূজে গোপীগণে,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বরে।
বলরাম দীন, নীরস কঠিন,
কি দিয়া তুষিবে তাঁরে।"

বৈষ্ণবগণ মধ্যে রসাভাস সর্ব্বপ্রকারে নিন্দনীয়। এমন কি সাহিত্যের

মধ্যেও নয়। এই জন্য নীলাচলে প্রভুকে কোন কবি কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়া শুনাইতে ইচ্ছা করিলে স্বরূপ দামোদরের অনুমোদন ভিন্ন তিনি শ্রবণ করিতে সমর্থ হইতেন না। কারণ,—

"রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥"
"স্বরূপ কহে তুমি গোয়াল পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥"
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস রসাভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তি-সিদ্ধান্ত সিন্ধুর নাহি পায় পার॥

রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন, তাঁহার সুখের জন্য একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা অভিনয়ের দ্বারা জগবন্ধুর চিত্তবিনোদন করিবেন, তাহাতে রসাভাস হইতে দিবেন কেন? তাই এ নির্জ্জনে উদ্যানে বাছাই করিয়া দুইটী দেবদাসী লইয়া আপনি ঐকান্তিক ইচ্ছার সহিত বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদিগকে নৃত্য গীত শিক্ষা দিতেছেন। এই যে অতীব আশ্চর্য্য ও অভিনব সাধন, চলিত কথায় যাহাকে আগুন বা সাপ লইয়া খেলা করা বলা যায়—মহাপ্রভু ইহা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবার আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥

স্বয়ং শ্রীগৌর ভগবান কি বলিলেন, না এরূপ ভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে যোষিৎ সঙ্গ করিতে পারে এমন ব্যক্তি এক রামানন্দ রায় ব্যতীত কেহ আছে বলিয়া তিনি জানেন না এমন কি পুরাণাদিতেও এমন কাহিনী পাঠ করেন নাই। এই কথায় প্রভুর অভিমত স্পষ্ট বুঝা যায় যে যোষিৎসঙ্গ জীবের সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। তাই তিনি অমন করিয়া ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাই সুন্দরী রমণীর পুত্র প্রভুর নিকট আসিত বলিয়া অতি সাবধান ও আত্ম প্রভুভক্ত দামোদর প্রভুকে উক্ত বালকের সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আর এই দেবদাসী প্রসঙ্গে প্রভুও একস্থানে বলিলেন

প্রকৃতি দর্শন দূরে থাকুক—উহাদের নাম শ্রবণেও আমার মনের বিকৃতি ঘটিতে পারে। স্ত্রীলোক দর্শনে কাহারও চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না।

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।

মহাপ্রভু এই কথা বলাতে আমাদের মনে একটী চিন্তার উদয় হইতেছে, এখন যেরূপ চণ্ডীদাস-রামিরজকিনী বা বিদ্যাপতি-লখিমীদেবী ঘটিত প্রণয় কাহিনী আমরা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছি তখন যদি উহা প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে স্বয়ং মহাপ্রভু নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন। এবং—

চণ্ডীদাস্ বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
রায় রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

ইহা হইতে পারিত না। অর্থাৎ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী তাঁহার ভজনের অঙ্গ হইত না। অথবা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যদি ঐরূপ অপ্রাকৃত দেহ মন লইয়া যোষিৎ সঙ্গ করিতেন তাহা মহাপ্রভুর অগোচর থাকিত না। কিন্তু ঐ ঘটনা সত্য নহে। তাই মহাপ্রভু বলিলেন এরূপ ঘটনা জগতে একবার ঘটিল, তাহা রামানন্দের জীবনে। এমন কি পুরাণ ইতিহাসেও এমন বৃত্তান্ত তিনি পাঠ করেন নাই। আর কৃপাময় প্রভু জীবকে সাবধান করিবার জন্য বলিলেন এমন কি অপ্রাকৃত দেহ মন লইয়া যোষিৎসঙ্গ করিবার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁহারও নাই।

রামানন্দ যে জগন্নাথ বল্লভ নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে মূর্ত্তিমান ব্রজরস প্রস্ফুট ছিল। আমরা এই স্থানে ঠাকুর লোচন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদে তাঁহার একটী গানের মাধুর্য্য উপভোগ করিব।

যুবতী মনোহর ও না বেশ গো।
অবনী মণ্ডলে সখি চাঁদের উদয় যেন
সুধাময় রূপের বিশেষ গো॥
চূড়ার উপরে শোভে নানা ফুলদাম গো
তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা।
যেন, চাঁদের উপরে চাঁদ উদয় করিল গো
ললাটে চন্দনবিন্দু রেখা॥

সঘনে দোলয়ে রামে মকর কুণ্ডল গো
কুলবতীর কুল মজাইতে।
উহার, নয়ন কুসুম-শর মরমে পশিল গো
ধৈরজ ধরিতে নারে চিতে ॥
এমন সুন্দর রূপ কোথা হ'তে এলো গো
মনমোর ভুলিল দেখিয়া।
লোচন মজিল সই ওরূপ সাগরে গো
কিবা সে নাগর বিনোদিয়া ॥

রামানন্দ যখন নিভৃত উদ্যানে দেবদাসীদ্বয়কে লইয়া নৃত্য গীত শিক্ষা দিতেন তখন তিনি আর বিদ্যানগরের শাসনকর্তা বা জগন্নাথ বল্লভ নাটক রচয়িতা থাকিতেন না। তিনি একজন ব্রজদাসী মাত্র। দেবদাসীদ্বয় গোপিকা আর তিনি তাঁহাদের সহচরী মাত্র। তখন ইহ জগতের সমস্ত স্মৃতি তাঁহার চিত্তক্ষেত্র হইতে বিদূরিত হইয়া নিত্য লীলাময়ী গোপিকাগণের হাব-ভাব, নৃত্য, গীত, কটাক্ষ তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইয়া তাঁহাকে গোপী ভাবে সম্পূর্ণ রূপে অনুপ্রাণিত করিত। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" কথানুসারে তাঁহার দেহে তখন ব্রজ গোপিকার আবির্ভাব হইত তিনি আর রামানন্দ রায় থাকিতেন না, তিনি তখন একজন গোপিকামাত্র। আর তিনি সেই অপ্রাকৃত দেহ মন লইয়া দেবদাসীদ্বয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান ও গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতেন। এই সময়ে তাঁহার স্পর্শে তাহাদের দেহেও ব্রজভাব সঞ্চারিত হইত। এই রকম অবস্থায় তাহারা দেহ-দর্শক যোগ্য অভিনয়ের সমস্ত অঙ্গ নিখুঁত ভাবে শিক্ষা করিয়া লইল।—

তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥
সঞ্চারি, সাত্ত্বিক, স্থায়ি ভাবের লক্ষণ।
মুখ নেত্রে অভিনয় করয়ে প্রকটন ॥
ভাব-প্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথ আগে দোঁহে প্রকট দেখায় ॥

মহাপ্রভু ভক্তগণের সন্দেহ নিরসনের জন্য স্পষ্ট করিয়া বলিলেন রামানন্দের ন্যায় অধিকারীর পক্ষে যোষিৎসঙ্গ আদৌ দোষনীয় নহে এবং তাঁহার

বাক্যের পরিপোষক স্বরূপ রাসলীলার ফল শ্রুতি "বিক্রিড়িতং—" প্রভৃতি শ্লোকটী পাঠ করিলেন। চরিতামৃত হইতে উহার বৃঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল,—

ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদরোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেম ভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥

রামরায় সতত এই রাসলীলার অনুধ্যানেই বিভোর থাকিতেন। রাসলীলা পাঠে, রাসলীলা স্মরণে প্রাকৃত কাম ধ্বংস হইয়া শ্রীশ্রীরাধা মাধবের প্রেমে হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ স্থলে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই পরম গম্ভীর রাসলীলা লইয়া হস্ত কুণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করিবার বাসনা আজ-কাল অনেক লেখকের মধ্যে দেখা যাইতেছে। "গৌরাঙ্গ সেবকে" এই রাসলীলার জের অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে বহুদিন ধরিয়া বহু অপসিদ্ধান্ত পূর্ণ এবং অবৈষ্ণবীয় প্রবন্ধ তাহাতে স্থান পাইয়াছে।

রামানন্দের মন রাসলীলা স্মরণে ও কুঞ্জ সেবা মাধুর্য্যে একেবারে অপ্রাকৃত হইয়া ছিল। তাই মহাপ্রভু বলিলেন,—

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশ।
যেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহনিশ॥
তার ফল কি কহব কহনে না যায়।
নিত্য সিদ্ধ সেই, প্রায় সিদ্ধ তার কায়॥
রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥

রামানন্দ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর নিকট এই সমস্ত পরম সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাক্য এবং তাঁহার অত্যুন্নত চরিত্রের বার্তা জ্ঞাত হইয়া ভক্তগণ আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু বিস্তৃত ভাবে রামানন্দ চরিত্র আলোচনা করিয়া ভবিষ্য ভক্তগণেরও তৎসম্বন্ধে কিছু সন্দেহ করিবার রাখিয়া যান নাই। আর এক কথা দেবদাসীদ্বয় তাঁহার ভজন সাধনের অঙ্গ ছিল না।

তিনি জগন্নাথ বল্লভ নামক স্বীয় ক্ষুদ্র নাটক খানির অভিনয় শিক্ষা দিবার জন্য অল্প কিছুদিন মাত্র তাহাদের সাহায্য লইয়া ছিলেন ইহাই আমরা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সহজিয়া গ্রন্থকারেরা তাঁহার পরম পবিত্র চরিত্রের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অশিষ্ট প্রকৃতি ভজনে তাঁহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া শত শত সরল চিত্ত নর নারীর নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে সুসিদ্ধান্তের দ্বারা রামানন্দ চরিত্র আলোচনা করিয়া মহাপ্রভু প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে বলিলেন "মিশ্র, তোমার যদি কৃষ্ণ কথা শুনিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তুমি পুনরায় রামানন্দের নিকট যাও।

আমিও রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণ কথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাও তথা॥

মহাপ্রভুর কথায় মিশ্রঠাকুর সত্বর রামানন্দ সমীপে গমন করিলেন। রামানন্দ তখন বহিঃপ্রকোষ্ঠে ছিলেন। মিশ্র তাঁহাকে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন—

প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা হেথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা॥

রামানন্দ বলিলেন বড় ভাগ্যের কথা যে, আপনি কৃপা করিয়া এ অধমের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে আসিয়াছেন। বিশেষ মহাপ্রভু যখন আপনাকে পাঠাইয়াছেন। আপনার যাহা যাহা প্রশ্ন আছে বলুন। ইহাতে মিশ্র প্রথমে বলিয়া ছিলেন যে, আপনি বিস্তানগরে মহাপ্রভুকে যে ভাবে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া ছিলেন আমাকে তাহাই শোনান কিন্তু পরে নিজকে সামলাইয়া বুঝি করিয়া বলিলেন—

অন্যের কি কথা তুমি প্রভুর উপদেষ্টা।
আমি ত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা॥
ভালমন্দ আমি কিছু বুঝিতে না জানি।
দীন দেখে কৃপা করি কহিবে আপনি॥

তাহার পর শ্রীল রামরায় মহাশয় কৃষ্ণকথায় যে তরঙ্গ উঠাইলেন তাহার আভাস মাত্র চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়। যথা—

তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিল।
কৃষ্ণকথা রসামৃত সিন্ধু উথলিল।

আপনি প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা অন্ত ॥
বক্তা শ্রোতা কহে শোনে দোঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি কাঁহা জানিবে দিন শেষে ॥

এ সেই কৃষ্ণকথার তরঙ্গ—যাহার আশ্রয়ে প্রভুর শেষ দ্বাদশ বর্ষের লীলা প্রধানতঃ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল—

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ বেদনায় প্রভু রাখয়ে পরাণ ॥

রামানন্দ সমীপে এই অনন্ত বিসারি কৃষ্ণকথারূপ সুধা সাগরে নিমজ্জিত হইয়া মিশ্র ঠাকুর যখন মহাপ্রভুর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহার বদন অতীব প্রফুল্ল—চরণ চলিতে নাহি চলে। সমস্ত অঙ্গে পুলক নেত্রে অশ্রুধারা বহিতেছে। প্রভু একটু হাসিয়া বলিলেন "মিশ্র, কৃষ্ণকথা শুনিয়াছ ত ? মিশ্র এ কথার উত্তরে আর কি বলিবেন, রামানন্দের সুখ্যাতি তাঁহার মুখে আর ধরে না। তিনি বলিলেন রামানন্দ মানুষ নহেন, তিনি যেন মূর্ত্তিমান কৃষ্ণপ্রেম। প্রভু আজ আপনার কৃপায় কৃষ্ণকথা সুধার্ণবে অবগাহন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। মিশ্রের কথায় ভক্তগণেরও চক্ষু উন্মিলীত হইল। রামানন্দ মাহাত্ম্য এক্ষণে তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিলেন।

মিশ্রঠাকুর মহাপ্রভুর সভায় আর একটী গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন রামানন্দ আমাকে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণকথা বক্তা করি না জানিও মোরে ॥
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র ॥
মোর মুখে কহে কথা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাহার ॥

অতঃপর মিশ্র অতি সরল ও সুমধুর ভাবে স্বীয় হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন—

যে সব শুনিলু কৃষ্ণ রসের সাগর।
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর ॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি ॥

এ কথায় মৃদুহাস্য করিয়া—

প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুখে দেন আনি॥
মহানুভবের এই মত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনি কহায়॥

কৃপানিধি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগুণ প্রকাশিত করিতে ভালরূপই জানিতেন। তাই বিনয়ের খনি রামানন্দ তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া ভক্তগণকে উপভোগ করাইলেন। রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ, বিষয়ী, কিন্তু তিনি কৃষ্ণভক্ত থাকায় প্রভু তাঁহার কোন দোষই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাকে ধর্মোপদেষ্টার পদে অধিষ্ঠিত রাখিয়া নিজ ভক্তগণ সহ শ্রোতা হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের গর্ব্ব নাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাই হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য, সনাতন দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস, রূপ দ্বারা ব্রজরস প্রেমলীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাতে পারে যার এক বিন্দু॥—

অতঃপর আমরা শ্রীল রামানন্দের জগন্নাথ বল্লভ নাটক সম্বন্ধে সামান্য মাত্র আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অবশ্য তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। যদি প্রভু শক্তি দেন ও কৃপা করেন পরে আলোচনা করিব। রামরায়ের গ্রন্থ অফুরন্ত ব্রজ রসের উৎস। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার হৃদয়ে রাধা প্রেমের যে উচ্চতম তত্ত্ব প্রতিফলিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহারই নিদর্শন আমরা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাই। অজয় তটের অমর কবি জয়দেবের উৎকণ্ঠিতা রাধার সহিত একাসনেই রামানন্দের রাধা স্থান পাইবার যোগ্য। আর সেই বিরহ ব্যথিতা সজল নয়ন রাধার চিত্র সজীব করিয়া বিপ্রলম্ভরস মগ্ন জলধিতটে গম্ভীরা গৃহে সমাসীন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর স্মৃতি হৃদয় মথিত করিয়াই প্রতি নিয়ত আমাদের প্রাণে জাগিতেছে।

রসিক ভক্তগণ তাহার গ্রন্থ আস্বাদ করিয়া বুঝিবেন অল্প কথায় প্রেমতত্ত্বের গূঢ় গম্ভীর ব্যাপার প্রকটে তিনি কি প্রকার সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। পরম প্রেমিক রামানন্দের জয় দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

দীন শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

# পাগলের খেয়াল

জনৈক বাবাজীর কাছে একখানি খাতা ছিল, তিনি আমার নিকট রাখিয়া যান, কিন্তু এতাবৎ আর লইতে আসেন নাই। ঐ খাতার মধ্যে এই সব কথা লেখা আছে। আমি আর উহা রাখিয়া কি করিব, ভক্তির পাঠকগণকে ঐ খাতাখানি হইতে মধ্যে মধ্যে পাগলের খেয়াল তুলে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

( ধ্রুব নিয়ম )

১। সূর্য্য পূর্ব্বদিক হইতে উদয় হইবেই।

২। ধুমকেতু ঠিক সময়ে আসিবেই।

৩। জল সর্ব্বদা নিচু দিকে যাবেই।

৪। চুম্বকের টান উত্তর দিকে হইবেই।

৫। ধ্রুবতারা স্থির থাকবেই।

৬। সমুদ্র কখনও বেলা ভূমি ছাড়াইবে না।

৭। জ্ঞানীর কখনও ভেদ বুদ্ধি হইবে না।

৮। প্রকৃত ভক্তের কখনও অভিমান থাকিবে না।

৯। সাধুর বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না।

১০। নিতাই চাঁদকে ডাকিলে পাওয়া যাইবেই।

( নিয়মের ব্যতিক্রম বা সবস্থানে এক নহে। )

১। মানুষ মারিলে ফাঁসি হয়, আবার মানুষ মারিলে "কাইসার ই হিন্দ" পুরস্কারও পায়।—( যুদ্ধে )

২। বিষেতে মানুষ মরে আবার বিষেতেই বাঁচে।—( ঔষধে )

৩। মাতা সন্তানকে প্রাণদিয়ে রক্ষা করে, আবার মাতাই সন্তানকে ভক্ষণ করে।—( সাপে )

৪। সন্তানে মাকে প্রতিপালন করে, আবার সন্তানে মাকেই ভক্ষণ করে।—( কাঁকড়া )

৫। গ্রহ উপগ্রহ সবই ঘুরে বেড়ায়, আবার স্থিরও থাকে।—( ধ্রুবতারা )

৬। জলে আগুন নেবে, আবার জলে আগুন হয়ও।—( বাড়বানল )

৭। জলে শরীর ঠাণ্ডা হয়; আবার জলে শরীর পোড়েও।—( বরফে )

৮। দিনে তারা দেখা যায় না, আবার দেখা যায়ও।—( পূর্ণসূর্য্যগ্রহণে )

৯। স্তনই জীবের জীবন, আবার স্তনই মৃত্যু। ( বুঝে দেখ )

১০। হিন্দু শাস্ত্র বলে মৃত্যু সকলেরই হইবে, আবার অমরও আছে।—( বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, মার্কণ্ড প্রভৃতি )

১১। আহারে শরীর পোষণ হয়, আবার নাশও হয়।—( ঔদারীকের )

১২। বীজ হইতে গাছ পাতা হয়, আবার পাতা থেকেও গাছ হয়।—( হিমসাগর গাছ ফণী মনসা গাছ )

১৩। মৃত্তিকা ভিন্ন গাছ হয় না, আবার হয়ও।—( পায়গাছ আলগলতা )

১৪। হিন্দু শাস্ত্রে এক স্বামীর নিয়ম, আবার পঞ্চ স্বামীও আছে।—( দ্রৌপদীর )

১৫। আগুনে সব পোড়ায়—আবার পোড়ায়ও না।—( সীতাদেবী )

১৬। মিথ্যা কহিবে না উপদেশ দিয়া, আবার শ্রীকৃষ্ণই মিথ্যা কহাইয়াছেন।—( যুধিষ্ঠিরকে )

১৭। হিন্দু কাহারও অন্ন খায় না, কিন্তু ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া মহাপ্রসাদ খায়।—( পুরীধামে )

১৮। টাকার জন্যে সবাই পাগল—আবার তা ছোঁয়ও না।—( ভক্তে )

১৯। সুন্দরী স্ত্রীলোক পাবার জন্যে দুনিয়া ব্যস্ত, আবার ফিরেও দেখে না।—( নিতাই দাস। )

ক। শিশুকালটা পবিত্র ভাবে কাটিয়ে যেই যৌবনে পড়িলাম, অমনি মনের ভিতর নানা অপবিত্র ভাব জমে জমে কালি পড়িতে লাগিল। সেই কালিগুলোই ক্রমে ক্রমে জমাট হ'য়ে, জ্যান্ত হ'য়ে, কাল মিশ মিশে রং হ'য়ে শেষে মুখের চারি ধারে গোঁপ দাড়ি রূপে প্রকাশ জাগিয়ে দিলে।

খ। হারমোনিয়মে একজন বাজাচ্ছিলো ভৈরবী সুর। মাদ্রাজী একজন "নাইড়ু মাইড়ু" করে' তার ভাষাতে ভৈরবী গান গাইলে, মুসলমান একজন "গোলেমা ইন্‌সান" প্রভৃতি বোলে উর্দ্দু ভাষাতে ভৈরবী গাইলে, বাঙ্গালী একজনও "অই ভুবন মন-মোহিনী" বলে' ভৈরবী ছাড়লে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। পরস্পরের ভাষা না বুঝতে পারলেও হারমোনিয়মের ভৈরবীসুরের সঙ্গে সকলেরই মিল হ'য়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ আমার কি হারমোনিয়ম?

গ। শাক্ত, শৈব, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি যেন ধর্ম্মের পথ। সব

ও নাই যেন স্কুল। নানা ছাত্র নানা স্থানে পড়চে। সকলেরই লক্ষ্য এল, এ পাস। যে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে তার সঙ্গে ফার্ষ্ট ক্লাসের ছেলের মিল হয় না, সকলেরই বই বা পাঠ আলাদা। এ মিল হবে কবে? যখন সব ছাত্র এম, এ পড়বে, নতুবা কখনই হবে না। পরস্পরে পরস্পরের ভাব বুঝতে পারবে না।

শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট।

# নগর ভ্রমণান্তে গৃহে প্রত্যাগমন কীর্ত্তন।

( প্রেমকণ্ঠ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় দ্বারা গীত )

নগর ভ্রমণ করে' গৌর এল ঘরে।
আমার গৌর এল ঘরে—আমার নিতাই এলো ঘরে।
ঘরে ঘরে নাম বিলায়ে—গৌর এল ঘরে॥
ঘরে ঘরে প্রেম বিলায়ে—গৌর এল ঘরে।
গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এলো ঘরে॥
ধেয়ে গিয়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে॥
বলে—আমার কে এলোরে? আমার বাপ ঘরে এলোরে।
বামকরে চিবুক ধ'রে, অনিমিখে চাঁদ বদন চেয়ে;—
বলে—"আমার কে এলোরে?
আমার বাপ এলো বাপ এলো, বাপের ঠাকুর এলোরে,
আমার আঁধার ঘরের মাণিক এলো, আমার আধার ঘর হইল আলো।
আর আয় প্রতিবাসিনী তোরা দেখা বালো, আমার আধার ঘরের মাণিক এলো,
এল শচীর নয়ন তারা,—আয় আয় প্রতিবাসিনী দেখবা তোরা।
একি খেলারে?—গৌরের অঙ্গ পানে চেয়ে বলে,
কেন দেখি সোণার অঙ্গ ধূলা মাখা—একি খেলারে।
বল কেবা দিয়েছে?—
বল নিমাই তোর সোণার অঙ্গে, কে ধূলা দিয়েছে?
একবার চেয়েও কি সে দেখে নাই? ধূলা দেবার আগে একবার
দেখলে ধূলা দিতে নারিত।—অমনি ধেয়ে এসে বুকে ধরিত।

"এস আমার বাপ বিশ্বম্ভর" বলে' ধেয়ে এসে হিয়ায় ধরিত।
"আমার হিয়ার মাণিক ওখানে কেন?"—
"আমার বাপ বিশ্বম্ভর" বলে'—ধেয়ে এসে হিয়ায় ধরিত।
"ও বাপ নরহরি   তুই কোথায় ছিলি?"
শচী মাতা কেঁদে বলে ;—
"ও বাপ নরহরি তুই কোথায় ছিলি?"
পরাণ পুতুলি ফেলি, নরহরি তুই কোথায় ছিলি?
আমি যে তোর হাতে হাতে সঁপে দিলাম। সংকীর্ত্তনে যাবার বেলায়,—
"দেখোরে বাপ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে।"
আমি প্রাণ তোমার হাতে দিলাম, আমার এই শূন্য দেহ ঘরে রইলো,
"আমার পরাণ পুতুলি গোরা ধূলায় পড়ে পাছে।"
তার এই কি প্রতিফল?—ও বাপ নরহরি বল বল?
তার এই কি প্রতিফল?"
অভিমানে শচীমাতা বলে,—আর যেতে দিব না,
সঙ্কীর্ত্তনে বিশ্বম্ভরে আর যেতে দিব না,
দুঃখিনীর বাছনী আমার,—ঘরে বসে খেলা করবে,
মনে হ'লে চেয়ে দেখিব। দুঃখ পাসরা বদন খানি—
মনে হ'লে চেয়ে দেখিব।"
এতবলি ধূলা ঝেড়ে, শচীমাতা গৌর কোলে করে।
ভেসে যায় ভেসে যায়,—বিশুদ্ধ বাৎসল্যময়ী মা আমার ভেসে যায়
স্তন ক্ষীরে আঁখি নীরে ভেসে যায় ভেসে যায়।
বাম উরুতে বসাইয়ে, দক্ষিণ করে চিবুক ধ'রে,—
অনিমিখে চাঁদ বদন চেয়ে বলে ;—
"আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ সোণা।
তোমারে পেয়েছি কত করিয়ে কামনা॥"
ওরে ও দুখিনীর বাছনি;—দুখিনী মায়ে দুঃখ দিওনা,
ঘরে বসে খেলা কর। তোমার খেলার সাথী লয়ে,
যখন যা চাইবে তাই দিব। ঘরে বসে খেলা কর।
আমার চোখের আড়াল হ'য়ো না। ওরে আমার নয়নমণি!
আমি দিবসে আঁধার দেখি, (যদি) ও চাঁদ মুখ না দেখি।

এত বলি ধূলা ঝেড়ে, শচীমাতা গৌর কোলে করে।
হরি বোল হরি বোল। সবাই মিলে—হরি বোল,
শচী মায়ের কোলে গৌর হরি—হরি বোল হরি বোল। (মাতন)
এত বলি ধূলা ঝেড়ে, শচী মাতা গৌর কোলে করে।
নরহরি বসাওল রত্নাসন পরে।
মুখ পদ পাখালিল সুশীতল নীরে।
ধীরে ধীরে মুছাওল পাতল চীরে।
নানাবিধ সেবা ক'রে শ্রান্তি দূর করে।
চামর ঢুলায় নরহরি।
গোরা রসের বদন হেরি,—চামর ঢুলায় নরহরি।
তার দুনয়নে বহে বারি।
প্রেম ধারায় ধিক্ মানিছে;—অনুরাগে নরহরি;
বলে—"দূরে যারে প্রেমবারি,—আমি এখন তোরে চাই না।
বলে—দূরে যাবে প্রেম-বারি—তুই হলি গৌর সেবার অরি।
বলে দূরে যারে প্রেম বারি—আমি এখন তোরে চাই না।
আমি বদন হেরি আর চামর করি।" ( মাতন )
ধীরে ধীরে মুছাওল পাতল চীরে॥
রাতুল চরণ হিয়ায় ধরে,—মনে মনে গণেরে;
"কতনা লেগেছে;—এই কমল হ'তেও কোমল পদে,—
এই নদীয়ার কঠিন মাটী—কতনা লেগেছে !!
মনে করি এই নদীয়া জুড়ি হউক মোর হিয়া।
তাহাতে গৌরাঙ্গ নাচুক পদ পশারিয়া॥
মনে করি আমার হিয়া হউক শিরিষ কুসুম জিনি।
তাহাতে নাচুক আমার গোরা গুণমণি॥
মনে করি আমার হিয়া হউক ননীর সুসর।
তাহাতে নাচুক আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
মনে করি ঐ নদীয়া জুড়ি আমার এ দেহ বিছাই।
পরাণ গৌরাঙ্গ চাঁদে তাহাতে নাচাই॥
হরি বোলে নেচে যাবে—
আমার বুকের উপর দিয়া; গৌর, হরি বোলে নেচে যাবে।" ( মাতন )

ধীরে ধীরে মুছাওল পাতল চীরে।
শচী মাতা আনি দিল ক্ষীর ননী সরে।
বলে "বাপ নরহরি খাওয়াও রে।
মুখখানি শুকায়ে গেছে, কত বেলা হ'য়েছে, কিছু খায় নাই—
দণ্ডে দশ বার খায়, কত বেলা হ'য়েছে—কিছু খায় নাই।
ও বাপ নরহরি খাওয়াও রে। গৌর তোমার হাতে খেতে ভালবাসে।
নর হরি যতন করি খাওয়ায় গোরা রে।
বলে প্রাণ গৌর খাওহে, ক্ষীর সর নবনী খাও,
মায়ের বাৎসল্য প্রেমে মাখা ক্ষীর সর নবনী খাও,
মায়ের প্রীতিতে গোরা ভোজন করে।
বলে "নরহরি আবার দাও।—বড় মিঠা লাগছে॥
না জানি কি সুধা আছে—বড় মিঠা লাগছে॥"
মায়ের প্রীতিতে গোরা ভোজন করে॥
উঠিল আনন্দ রোল, শচীর আঙ্গিনায়।
বাৎসল্য প্রেমের ভোজন-বিলাস দেখে; উঠিল আনন্দরোল
সবাই বলে "হরি বোল।" (মাতন)
মুখ পাখালিয়া দিল সুশীতল নীরে।
ধীরে ধীরে মুছাওল পাতল চীরে॥
অবশেষ বাটি দিল সব পরিকরে।
অবশেষ পেয়ে সবে নাচে প্রেম ভরে॥
(বলে) জয় শচী দুলালিয়া, নদীয়া বিনোদিয়া, জয় নিতাই রঙ্গিয়া।
এই কৃপা কর মোদের গৌরাঙ্গ শ্রীহরি,
আর কিছু চাহি না, ও প্রাণের গৌর হরি! আর কিছু চাই না।
আর আমাদের ভুলাওনা, দিয়া মায়ার খেলনা॥
এই কৃপা কর মোদের গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমায় না পাসরি॥
তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা।
এই করো জন্মে জন্মে যেন ভৃত্য হই তথা॥
বিহার ভূমিতে জনম পাব, দাসানুদাসের সঙ্গ পাব।
উচ্ছিষ্ট ভোজী হ'য়ে রব।

দিশি দিশি শুনতে পাব, তোমা দোঁহার গুণ গাথা
"হা নিতাই গৌরাঙ্গ বলে, পাগল হয়ে বেড়াইব ॥ ( মাতন )
আয়রে তোরা লুট্‌বি কে আয়।
আমার দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায় রে॥
আমার শ্রীগৌরাঙ্গ সুধার আধ'রে।
আমার নিতাই চাঁদ তার অঙ্গ আধা রে॥
চাঁদে চাঁদে মিশে দুটি চাঁদ
বৃষভানুকুলচাঁদ নন্দকুলচাঁদ।
শকতি হ'লো তম নাশিতে।
একা নন্দকুলচাঁদের শকতি হ'লো না তম নাশিতে।
তাই হ'লো মিশিতে, ভানুকুলচাঁদের সনে,
চাঁদে চাঁদে মিলে দুটি চাঁদ ; আসি উদয় হ'ল নদীয়ায়॥
এনেছে নিতাই প্রেম অমিয়া,
কিশোরী ভাণ্ডার লুটিয়া।
দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া,
পতিত পাষণ্ডি খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
বলিছে নিতাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
বিনামূলে যাবো বিকাইয়া,
তোদের পাপ তাপের বোঝা নিয়া॥ ( মাতন )
কেঁদে বেড়াইছে নিতাই মালি, মাথায় ল'য়ে প্রেমের ডালি,
কে নিবি আমায় কিন্‌বি বলি, আয় কলিহত জীব বলি,
আচণ্ডালে কোলে তুলি, কাঁদিছে নিতাই ফুলি ফুলি,
প্রেমের ডালি দিবরে ঢালি, আয়রে গৌর হরি বলি।
গৌর হরিবোল হরিবোল হরি বোল হরি বোল। * ( মাতন )

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

---

* চাতরা হরিসভায় কীর্ত্তন কালে সংগৃহীত।

# শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ

( ৪ )

নবদ্বীপ। তুমি লেখাপড়া জান, আর আমি মূর্খ, তোমাদের বিজ্ঞান শাস্ত্রেই না বলে যে, সবই এক নিয়মের অধীন? সেটা যদি সত্য হয়, তবে এটা হবে না কেন?

আনন্দ। তুমি কি বলিতেছ? আমি কিন্তু বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না।

নবদ্বীপ। তোমরা হয়তো ঈশ্বর মান না; কিন্তু নিয়ম ত মান, বিজ্ঞান ত মান। বিজ্ঞানের মতেই ত বলিয়া থাকে যে, যে নিয়মে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, প্রভৃতি ঘুরচে বা আপন আপন স্থানে স্থির থাক্‌ছে ঠিক সেই নিয়মেই গাছের পাতা মাটিতে খ্‌সে পড়চে।

আনন্দ। এতো ঠিক কথা, ইহাকে বলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

নবদ্বীপ। তা যাহাই হউক, মনে কর তুমি না হয় একটা চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, কারণ তুমি কত বড় উকিল, কত টাকা পয়সা রোজগার কর, তোমার এত বড় বাড়ী, কত গাড়ী ঘোড়া, চাকর চাকরাণী তোমার দাপে খাট্‌চে, কাজেই তুমি না হয় তেম্নি মস্ত বড়। আর আমি ভিক্ষুক, পেটের দায়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই। আমি না হয় একটী ছোট গাছের পাতা; কিন্তু আমরা যে দুই জনেই সংসারে ঘুরছি, এর কারণ কি এক নয়?

আনন্দ বাবুর মুখখানি একটু আরক্তিম হইল। বিস্ফারিত নেত্রে নবদ্বীপ দাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "আমিতো কাছারিতে যাই টাকার জন্যে, তুমিও কি আমার কাছে সেই জন্যে আস?"

নবদ্বীপ। হয় তুমি আমাকে ঠকাবার জন্য এ কথাটী বলছ, না হয় তুমি তোমার মনের ভাব ঠিক করিয়া বুঝিতে পার নাই।

আনন্দ। কেন? টাকা বই কাছারিতে আর কি আছে?

নবদ্বীপ। টাকার জন্যই যদি যাও তবে টাকা পাইয়াই চুপ ক'রে বসিয়া থাক না কেন?

আনন্দ। টাকা রোজগার করি অভাব পূরণের জন্য।

নবদ্বীপ। তাহা হইলেই দেখ টাকার জন্য কাছারিতে যাও না, অভাব পূরণের জন্য যাও।

আনন্দ। বেশ তাহাই না হয় হইল।

নবদ্বীপ। এই অভাবটা কি বল দেখি?

আনন্দ। খাওয়া দাওয়া, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা।

নবদ্বীপ। এই খাওয়া পরা, খাওয়ান পরানই কি শেষ না ইহার পশ্চাতে আরও কিছু আছে?

আনন্দ। আর কি থাকবে?

নবদ্বীপ। বেশ করে ভেবে দেখ, আমরা খাই পরি বা স্ত্রীপুত্রাদিকে খাওয়াই পরাই কেন?

আনন্দ। তাহাতে আমার সুখ হইবে মনে করি।

নবদ্বীপ। তা হলে ভেবে দেখ ভাই! তুমি যাবতীয় কার্য্য কর কিসের জন্য।

আনন্দ। তা সুখের জন্য বটে।

নবদ্বীপ। আমিও আমার সুখের জন্য তোমার নিকট আসি। তোমার নাম "আনন্দ চন্দ্র" শুনে আনন্দের একটু কিরণ পাইবার জন্য আসি।

এই সময়ে ভৃত্য মুড়ি লইয়া আসিলে আনন্দ বাবু বলিলেন—"এই নাও তোমার মুড়ি এসেছে।" নবদ্বীপ দাদা আনন্দে উৎফুল্ল ভাবে ব্যগ্রতা সহকারে মুড়ির পাত্রটী হাতে লইয়া বলিলেন "বা বেশ মুড়ি হ'য়েছে। দেখ ভাই! আমার একটা গোঁড়ামী আছে। এটা হয়তো তোমার ভাল লাগিবে না, কিন্তু কি করি সংস্কার বা স্বভাব ছাড়া বড়ই মুস্কিল। আমার একটী তুলসী পত্র চাই; কারণ এই মুড়ি গুলি ভোগ না হইলে আমার খেয়ে সুখ হবে না। বোধ হয় এখানে পাওয়া কঠিন হবে?"

আনন্দ। তা পাওয়া যাবে না কেন? দ্বারে তুলসী পাতা নিয়ে আয়তো?

বলিবা মাত্র ভৃত্য তুলসী পত্র আনিতে গেল; আনন্দ বাবু চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া নবদ্বীপ দাদা বলিলেন—"কি ভাই! তুমি কি ভাবচো? আমার এই ভগবান্‌কে নিবেদনটা কুসংস্কার মাত্র, এই না?"

আনন্দ। ঠিক ঐ কথাটা না হইলেও অনেকটা ঐরূপ বটে; কারণ যাহার অস্তিত্ব আমরা ধারণা করিতে পারি না বা যাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা পর্য্যন্ত আমাদের দুঃসাধ্য তাঁহাকে আবার আবেদন নিবেদন কি?

নবদ্বীপ। অতি সত্য কথা, প্রকৃতই তাঁহার অস্তিত্ব ঠিক করা আমাদের দ্বারা হয় না।

আনন্দ। তবে আবার এই সব করা কেন?

নবদ্বীপ। অচ্ছা ভাই! তোমার পিতা কি বর্ত্তমান?

আনন্দ। না।

নবদ্বীপ। তাঁর কথা তোমার বেশ মনে আছে?

আনন্দ। আছে বৈ কি?

নবদ্বীপ। তোমার পিতামহকে তুমি দেখেছ কি?

আনন্দ। না।

নবদ্বীপ। প্রপিতামহকে বোধ হয় দেখনি?

আনন্দ। না।

নবদ্বীপ। এঁদের বিষয় তুমি কি বিশ্বাস কর?

আনন্দ। কিরূপ বিশ্বাস?

নবদ্বীপ। এই একদিন এঁরা জীবিত ছিলেন—এক সময় তোমার মত পয়সা রোজগার করিতেন। তোমার প্রপিতামহের পুত্র তোমার পিতামহ পিতামহের পুত্র তোমার পিতা, আবার তাহার পুত্র তুমি ইত্যাদি।

আনন্দ। হাঁ তা করি বইকি?

নবদ্বীপ। কেন, কোন যুক্তি বা প্রমাণ অনুসারে তোমার প্রপিতামহের অস্তিত্ব বিশ্বাস কর?

আনন্দ। ( একটু চিন্তা করিয়া ) আমি নিজে এবং চারিদিকের মানব সমাজই এই বিশ্বাসের প্রমাণ।

নবদ্বীপ। তাহা হইলে কোন অপ্রত্যক্ষ বিষয় অন্য প্রত্যক্ষ বিষয় দেখে বিশ্বাস করা যেতে পারে, এটা স্বীকার কর?

আনন্দ। হাঁ তা করতে হয় বৈ কি?

নবদ্বীপ। তবে ঈশ্বর সম্বন্ধে ঐটা কর না, বা করাটাকে কুসংস্কার বলে' মনে কর কেন।

আনন্দ। কেন? কিসে?

নবদ্বীপ। নয়তো কি? অপ্রত্যক্ষ তোমার প্রপিতামহ বা পিতামহের কথা প্রত্যক্ষ মানব সমাজ এবং তোমার নিজেকে দেখে বিশ্বাস করিতে পার, আর পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ, অধঃ প্রভৃতি যে দিকে দেখ প্রত্যক্ষ সর্ব্বদা আনন্দময়ের প্রকাশ দেখেও তাঁকে বিশ্বাস কর না? প্রত্যক্ষ বাদ স্বীকার করিতে হইলে সর্ব্বত্রই স্বীকার করা দরকার। কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্ম হইতে পারে

কি ? এই যে স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী, গিরি নদী, আকাশ পাতাল, গ্রহ নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য, তরু লতা, পত্র পুষ্প প্রভৃতি পরিবেষ্টিত বৈচিত্র্যময় অপূর্ব্ব মহিমান্বিত এই জগৎ, ইহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে মানিতে পার না কেন ? কেহ মানিলেও সেটা কুসংস্কার বলিয়া মনে হয় কেন ?"

আনন্দ বাবু আলবোলার নলটী মুখে দিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাদার কথা শুনিতেছেন, আর ক্রমে যেন কি রকম অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

নবদ্বীপ দাসকে সামান্য অকিঞ্চিৎকর ভিক্ষুকের পরিবর্ত্তে সুশিক্ষিত জ্ঞানী বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ভৃত্য তুলসী পত্র লইয়া আসিলে নবদ্বীপ দাস তাহার নিকট হইতে তুলসী লইয়া মুড়িগুলি ভোগ দিতে লাগিলেন।

আনন্দ। আচ্ছা তোমরা যখনই কিছু খাও, তখনিই কি ভগবানকে ভোগ দিয়া খাও ?

নবদ্বীপ। হাঁ! আমার গুরুদেবের আদেশ। সাধ্যমত তাঁহার আদেশ পালনের চেষ্টা করি। তিনি বলেন—"অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদ্ বিষ্ণোরনিবেদিতং ॥"

আনন্দ। আচ্ছা এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি ?

নবদ্বীপ। ভাই, তুমি সুশিক্ষিত এবং আধুনিক সভ্যতার পক্ষপাতী। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটা কি আধুনিক সভ্যতার লক্ষণ নয় ? আমরা সংসারে সকল বিষয়ে এমন কি নিজের স্ত্রী পুত্র পরিবার, চাকর বাকরের নিকট হইতে কোনও সাহায্য পাইলে অমনি হাতে হাত দিয়া ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া থাকি। আর যাহার দয়ায় মাতৃগর্ভে আহার পাইয় ছিলাম, আবার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যে দয়াময় দয়া করিয়া আমাদের আহারের জন্য মাতৃ স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, আবার প্রতিদিন জীবনের কত প্রকার উত্থান পতনের মধ্যে নিরন্তর যাহার কৃপায় এ দেহ ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি, যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের আহার, তৃষ্ণার জল, শীতে আতপ, গ্রীষ্মে বাতাস যোগাইতেছেন, তাঁহার প্রতি অন্ততঃ প্রতিদিন আহারের সময় একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাটা কি বিশেষ বর্ব্বরতা বা পাগলামী হইল ? ভাই! একটু চোক বুজে ভেবে দেখ তিনি না দিলে কেহ কিছু দিতে বা খেতে পারে কি ? এই কদিন আমি তোমার নিকট দু'টি মুড়ি খেতে চাহিতেছি, তুমি দিতে পারিলে কি ? আমরা হয় ত মনে করিব, তোমার ন্যায় একজন বড় লোক মনে করিলে আমার মত ভিখারীকে মুড়ি কেন যাহা ইচ্ছা খাওয়াইতে পারে;

কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল। ভগবান না দিলে তুমি কোন ছার! একজন সম্রাটও কাহাকে এক কপর্দ্দক দিতে সমর্থ হন না। আজ তিনি দিয়াছেন তাই তাঁহার প্রদত্ত দয়ার দান তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রসাদ স্বরূপে গ্রহণ করা কি মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য নয়?

আনন্দ। এই কৃতজ্ঞতা স্বীকারই কি তোমাদের ভোগ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য?

নবদ্বীপ। কোন বিষয় জান্তে বা বুঝতে হ'লে সে বিষয় তুমি গ্রহণ কর আর নাই কর তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু একটু স্থির চিত্তে সে বিষয়টীর মর্ম্ম গ্রহণ করা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কোনও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি আমার কিছু জানতে বা বুঝতে ইচ্ছা হয়, আর প্রথম থেকেই যদি সে বিষয়ে অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া সেটা কিছু নয় এই সিদ্ধান্ত মনে স্থির করে, তবে সে ধর্ম্মমতে যতই সত্যতা থাক্ না কেন—সে মত যতই বিশুদ্ধ হউক না কেন, ঐ সকল অনর্থের মূল অহঙ্কারই তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে দেয় না। আমরা যদি অহঙ্কারের উচ্চ মঞ্চ হইতে নামিয়া বসিতে পারি, তাহা হইলে এ সংসারের প্রত্যেক বিষয় হইতেই কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করিতে কিম্বা আনন্দ পাইতে পারি। তাহা না করিয়া কেহ বিদ্যার, কেহ ধনের, কেহ পদ মর্য্যাদার, কেহ রূপের, কেহ জ্ঞানের এবং কেহ সাধনের অহঙ্কার মদে মাতাল হইয়া হিতাহিত জ্ঞান শূন্য ভাবে নিরন্তর ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিয়া থাকি। তাই বলি দাদা! তুমি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হও চাই নাই হও, তাহাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু একটু শুদ্ধ চিত্তে অর্থাৎ অবজ্ঞাহীন ও অহংকার হীন হইয়া সরলতার সহিত প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর, নিতাই বুঝাইয়া দিবেন। এই সনাতন ধর্ম্মের উপর বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর তোমার অত্যন্ত অশ্রদ্ধা, কিন্তু আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি এ সম্বন্ধে তুমি কি কিছু আলোচনা ক'রেছ বা শাস্ত্রাদি কিছু পড়ে'ছ? অন্ততঃ টাকা রোজগারের জন্য আইন গ্রন্থাদি যেরূপভাবে আলোচনা ক'রেছ বৈষ্ণব শাস্ত্রাদি সেরূপও কিছু আলোচনা করিয়াছ কি? যদি বা খুব বেশী প'ড়ে থাক সেও কতকগুলি বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত পণ্ডিতের সঙ্কীর্ণ মতামত আলোচনা করিয়া হৃদয়টাকে শূন্য ক'রে ব'সে আছ, এবং সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা শূন্য হইয়া আচারে, বিচারে, আহারে, ব্যবহারে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া আত্মসুখের লালসায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছ।

আনন্দ। কথাটা বড় মিথ্যা নয়। আমি সাধ্যমত সরল অন্তঃকরণে তোমার কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিব। আচ্ছা ভগবানকে ভোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য কি স্পষ্ট করিয়া বল।

নবদ্বীপ। অন্য কারণ তুমি বিশ্বাস করিবে কি ?

আনন্দ। বিশ্বাস যোগ্য হইলে কেন বিশ্বাস করিব না।

নবদ্বীপ। কার বিশ্বাস যোগ্য ?

আনন্দ। আমার।

নবদ্বীপ। তুমি কে ?

আনন্দ। আমি মানুষ।

নবদ্বীপ। মানুষ বলিলেই কি তুমি কে বলা হইল ? বেশ বুঝে দেখ।

আনন্দ। এ আর বোঝা বুঝি কি ? আমি মানুষ ছাড়া আর কি ?

নবদ্বীপ। মানুষত বটেই তবে মানুষ বলিলে তুমি কি বুঝ, আমি তাহাই জিজ্ঞাসা করি অর্থাৎ মানুষের লক্ষণ কি ?

আনন্দ। ভাই ! আমি এ সমস্ত বিষয় কখনও আলোচনা করি নাই। আচ্ছা তুমিই বল।

নবদ্বীপ। তুমি একজন উচ্চ শিক্ষিত, তাহাতে আবার আইন ব্যবসায়ী। প্রতিদিন কত আইনের অভিপ্রায় লইয়া বড় বড় জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথা ঘুরাইয়া দাও, আর সামান্য মানুষের লক্ষণটা বলিতে অত ভাবিতেছ ? আমাদের শাস্ত্র বলে—মানুষ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে গঠিত অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও মহৎ এই চব্বিশটী বস্তু দ্বারা আমাদের এই দেহটী গঠিত হইয়াছে, কেমন নয় কি ?

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

# আলোচনা

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব লেখক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট মহোদয় শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বহুদিন যাবৎ নানা ভাবে নানা প্রবন্ধাদি লিখিয়া শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি বিধানে যত্নপর আছেন। প্রচলিত বৈষ্ণবপত্রিকাদির পাঠকগণ তাঁহার পরিচয় সর্ব্বদাই পাইয়া থাকেন। ভট্টমহাশয়ের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

বর্ত্তমানে তিনি বৈষ্ণব মাসিক ও সপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট একটী নিবেদন লিখিয়া "ভক্তি" পত্রিকায় প্রকাশের জন্ম পাঠাইয়াছেন, আমরা তাঁহার নিবেদনটী নিম্নে মুদ্রিত করিয়া দিলাম, আশা করি এ বিষয় যাঁহার যেমন সামর্থ্য তিনি তদ্রূপ সাহায্য করিয়া ভট্টমহাশয়ের প্রার্থনা পূরণে যত্নবান হইবেন। ভট্ট মহাশয়ের নিবেদনগুলি এই—

১।—প্রতি মাসে বৈষ্ণব ব্রতদিনাদির এবং বৈষ্ণব পর্ব্ব বা উৎসব কোন্ স্থানে ও কোন্ তারিখে হইবে তাহার একটি মাসিক তালিকা।

২।—বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন যে যে গ্রন্থ বা পত্রিকা প্রকাশিত হইবে তাহার তালিকা, গ্রন্থের নাম, প্রাপ্তিস্থান ও মূল্য।

৩।—প্রসিদ্ধ ভক্তগণের কলিকাতায় আগমন সংবাদ ও ঠিকানা।

৪।—ভক্তগণের তিরোভাব সংবাদ।

৫।—বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ যে কোন সংবাদ বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় কোন পত্রিকাদিতে বা গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৬।—শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল চিত্র প্রায়ই নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়, সেগুলির সংবাদ অনেক সময় অনেকে জানিতেও পারেন না, ঐ সব চিত্রের কথা কোন্ মাসে কোন্ পত্রিকায় বাহির হইয়াছে তাহার সংবাদ।

৭।—বঙ্গে এবং বঙ্গের বাহিরে কোথায় কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছেন তাহার একটি তালিকা এবং কোনও স্থানে নূতন শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ ঠিকানা।

৮।—বঙ্গে বা বঙ্গের বাহিরে যত হরিসভা, ভাগবত গৃহ বা শ্রীগৌরাঙ্গ সভা আছে তাহার ঠিকানা। এটি বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়াই মনে হয়। আশা করি এ বিষয় সকলেই চেষ্টা করিবেন।

৯।—ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভক্তের নাম ও ঠিকানা যথাঃ—

(ক) যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাল বক্তৃতা করেন।

(খ) যাঁহারা ভাল কীর্ত্তন করেন।

(গ) যাঁহারা ভাল মৃদঙ্গ বাদক।

(ঘ) যাঁহারা ভাগবতের কথকতা করেন। বিশেষতঃ যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার কথকতা করেন।

(ঙ) শুনা যায় অনেক স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিষয় অভিনয় সম্প্রদায় হইয়াছে ঐ সকল অভিনয়কারী সম্প্রদায়ের বিবরণ অর্থাৎ উহা যাত্রা, অপেরা থিয়েটার বা পাঁচালী অথবা অন্য কোনও রকমের। এই সকল সম্প্রদায়ের নাম ও ঠিকানা।

(চ) বিশেষভাবে বৈষ্ণব জগতের উন্নতি করিয়াছেন বা করিতেছেন এরূপ বর্ত্তমানে প্রকট ভক্তগণের নাম ও ঠিকানা

১০।—বৈষ্ণব গ্রন্থের একটি তালিকা। তন্মধ্যে যেগুলি ছাপা হইয়াছে তাহার প্রাপ্তিস্থান ও মূল্য। আর যেগুলি ছাপা হয় নাই তন্মধ্যে কতকগুলির হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় আর কতকগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না তাহার তালিকা।

১১।—ইংরাজী বা অন্য কোন্ ভাষায় কি কি বৈষ্ণব গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে।

১২।—বাংলা ভিন্ন অন্য কোন্ কোন্ ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে তাহার বিবরণ গ্রন্থের নাম প্রাপ্তিস্থান ও মূল্য।

১৩।—শ্রীপাটের তালিকা। কোন্ জেলায় কতগুলি শ্রীপাট আছে তাহার নাম, ডাকঘর, মহান্ত বা গোস্বামীপ্রভুদিগের নাম। বিশেষতঃ যাতায়াতের পথের বিবরণ।

১৪।—যে সকল শ্রীপাটের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় প্রশ্ন।

১৫।—কোন্ গ্রন্থালয়ে বৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহ পাওয়া যায় তাহার নাম ও ঠিকানা।

১৬।—কোন্ স্থানে মহাপ্রভুর ও তাঁহার পার্ষদগণের উত্তম চিত্র পাওয়া যায় তাহার ঠিকানা।

১৭।—কোন্ পঞ্জিকাখানি বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুকূল তাহার নাম।

১৮।—এ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতের যতগুলি সংস্করণ হইয়াছে তাহার নাম ও মূল্য এবং প্রাপ্তিস্থান।

১৯।—এমন অনেক বৈষ্ণব উৎসব আছে যাহা পঞ্জিকার বৈষ্ণব পর্ব্বদিনের তালিকায় নাই অথচ অনেক লুপ্ত শ্রীপাটের উদ্ধার সাধিত হইয়া তথায় নিয়মিতভাবে উৎসব হইতেছে ঐ সকল মহোৎসবের তিথি বা তারিখ পঞ্জিকাতে ছাপিবার জন্য পঞ্জিকাকারগণকে অনুরোধ করা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় এই কয়টী বিষয় লিখিয়া আরও লিখিবেন আশা দিয়াছেন। প্রশ্নচ্ছলে যেগুলি তিনি লিখিয়াছেন এগুলির যথাযথ উত্তর পাওয়া খুব যে কষ্টসাধ্য তাহা নয়, তবে একের চেষ্টায় যতশীঘ্র এসব না হইবে সকলের সম্মিলিত চেষ্টা হইলে অতিশীঘ্রই এসব উত্তর তিনি পাইতে পারেন। আশাকরি পাঠকগণ নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে ভট্টমহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরগুলি দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। পত্রিকা সম্পাদকগণের নিকটও বিশেষভাবে আমাদের নিবেদন যে, তাঁহারাও যদি এইভাবে নিজ নিজ পত্রিকায় ভট্টমহাশয়ের আবেদন প্রচার করেন এবং যাঁহার যতটুকু উত্তর দিবার সামর্থ্য আছে তিনি তাহা প্রকাশ করেন তাহা হইলে অচিরেই লেখকের আশা পূর্ণ হইতে পারে।

পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ কিছু সংবাদ পাঠাইতে চান। তিনি দয়া করিয়া "ভক্তি" সম্পাদকের নামে পত্রিকার ভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন, আমরা "ভক্তি" পত্রিকায়ই ক্রমান্বয় উহা প্রকাশ করিব।

* * *

বৈষ্ণব-সাহিত্যিক প্রবীন লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় লিখিয়াছেন—"অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট ফ্রান্স দেশীয় জনৈক পণ্ডিতের সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। হিন্দু মাত্রেরই উহা দেখিবার জিনিস, একজন ভিন্ন ধর্ম্মী আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশের জন্য যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা দেখিলে নিজেদের লজ্জা বোধ হয়। মুদ্রিত গ্রন্থের অক্ষর, কাগজ, আকার, ছাপা সবই সুন্দর। শুনিলাম গ্রন্থ মুদ্রনে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, বর্ত্তমানে উহার মূল্য ১৪ শত টাকা, তাহাও উপস্থিত ক্রয় করিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। অমূল্য বাবুর বাড়ীতে যে খণ্ড খানি দেখিলাম উহাতে ৩য় স্কন্ধের ৩য় অধ্যায় পর্য্যন্ত আছে। এই খণ্ড খানি ৭৩২ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, ভূমিকাই তন্মধ্যে ১৪৩ পৃষ্ঠা। এক পৃষ্ঠায় মূল সংস্কৃত শ্লোক অপর পৃষ্ঠায় তাহার ফরাসী অনুবাদ। গ্রন্থ খানির আকার ১॥ ফুট লম্বা ১ ফুট চওড়া ৬।৭ ইঞ্চি উচ্চ। প্রত্যেক পৃষ্ঠার চারিধারে ১॥০ ইঞ্চি করিয়া নানাবিধ লতা পাতা আঁকা বর্ডার। পাঠকগণ একবার গ্রন্থের আকারটি দেখুন।

১৮৪০খৃষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত "এম, ইউজিন বুরনুফ" ( M. Eugene Burnouf ) সাহেব এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটী লাইব্রেরীতে ১৩৫৩এ নম্বরে এই গ্রন্থ আছে, কেহ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন। উক্ত সাহেব যখন এই গ্রন্থ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন তখন অনেকেই তাঁহাকে এই কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন। এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন যে পৌত্তলিক হিন্দুর শাস্ত্র মুদ্রিত করিতে চেষ্টা না করিয়া বাইবেল মুদ্রিত কর। কিন্তু নিরপেক্ষ পণ্ডিত কাহারও নিষেধ গ্রাহ্য করেন নাই অধিকন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে শ্রীগ্রন্থে ভগবানের লীলা ও বাক্য লেখা আছে তাহা আমি আমার যাবতীয় অর্থ ও সামর্থ দিয়া প্রকাশ করিব।

উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, রুষ ভাষাতেও শ্রীমদ্ভাগবত ছাপাহইয়াছে তাহাও নাকি উক্ত সোসাইটীতে আছে। এত গেল বাহিরের, তারপর আর একখানি দেখিলাম ৺ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত। এখানি বঙ্গদেশের সর্ব্ব প্রথম মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবত। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তুলট কাগজে পুঁথির আকারে। এখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পত্তি। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যতগুলি শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্করণ বাহির হইয়াছে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকটে সকলগুলিই দেখিলাম। মনে হইল বিদ্যাভূষণ মহাশয় যেন শ্রীমদ্ভাগবতের হাট মিলাইয়া বসিয়াছেন। এরূপভাবে গ্রন্থ সংগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম স্বর্গীয় দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের যে একটী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমানে পাওয়া যায়না বলিয়া তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনাথবন্ধু

ভট্টাচার্য্য সেই ভাবের সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ভার দিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও যাহাতে বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধার হয় তাহার জন্য এই বিরাট আয়োজন করিয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শ্রীমান্ অনাথ বন্ধুর অর্থব্যয়ে শ্রীমদ্ভাগবত যেভাবে ছাপা হইতেছে তাহাতে মনে হয় এতদিন পরে বাঙ্গলায় একখানি বিশুদ্ধ পাঠের শ্রীমদ্ভাগবত মুদ্রিত হইতেছে। আমরা শ্রীভগবানের নিকট বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ও উদ্যোক্তার কার্য্য সাফল্য প্রার্থনা করি। খণ্ডাকারে মাসে মাসে গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আশাকরি শীঘ্রই গ্রন্থের মুদ্রন শেষ হইবে এবং ভাগবত-রস-পিপাসু ভক্তগণের পিপাসা নিবারণ হইবে। এ সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

# শ্রীগুরু-স্তোত্র

ভবসাগর তারণ কারণ হে!
রবি-নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে!
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

হৃদি কন্দর তামস ভাস্কর হে!
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে!
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

মনবারণ শাসন অঙ্কুশ হে!
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে!
গুণগান পরায়ণ দেবগণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

কুল কুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে!
হৃদিগ্রন্থি বিদারণ কারক হে!
মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে!
সুখশান্তি বরাভয় দায়ক হে!
ত্রয় তাপ হরে তব নাম গুণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

অভিমান প্রভাব বিমর্দ্দক হে!
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে!
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

তব নাম সদা শুভ সাধক হে!
পতিতাধম মানব পাবক হে!
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে!
ভব রোগ বিকার বিনাশক হে!
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে।

শ্রীশিশিরকুমার রক্ষিত।

# বিরহিণী

হে সখি! শ্যামচাঁদ কই এলনা—
বৃথায় কাটানু সারা বিভাবরী—
শ্যামের আশায় বসিয়া।
বৃথায় গাঁথিনু মালা সযতনে
শ্যাম-গলে দিব বলিয়া॥
বৃথায় বাঁধিনু সুচারু কবরী
শ্যামের তৃপ্তি লাগিয়া।
বৃথায় আমার রতন ভূষণ
হৃদয়ে ধরিবে বলিয়া॥
বৃথায় আমার জীবন যৌবন
যদি না মিলন লভিল।
বৃথায় লেপিনু অগুরু চন্দন
অভিসার বৃথা হইল॥
ম'জেছি ম'রেছি শ্যামের পীরিতে
সহিতে যাতনা পারিনা।
মনোচোরা সে যে চতুর লম্পট—
(জানে) কতই শঠতা ছলনা॥

সখি! শ্যামচাঁদ কই এলনা—
সারানিশি ঝু'রি নয়ন সলিলে
কাহার কুঞ্জেতে ম'জেছে।
আমার কপাল ভেঙ্গেছে সজনী
তাইতে বিদয় হ'য়েছে॥
যদি লাগ পাই শুধাইব তারে
ভাগ্যবতী কেবা রমণী।
যাহারে পাইয়া ভুলেছে আমারে
মোরে ক'রে কুলত্যাগিনী॥

রাজার ঝিয়ারী হইয়া যেদিন
রাখালের প্রেমে ম'জেছি।
বুঝেছি কপালে লেখা আছে দুঃখ
রাধা কলঙ্কিনী হ'য়েছি॥
বুঝেও বুঝেনা পোড়া মন মোর
কি করি উপায় বলনা।
বিরহ অনলে দহিছে হৃদয়
সখি, আর প্রাণে বাঁচিনা॥

সখি! শ্যামচাঁদ কই এলনা—
এমন চাঁদিনী রজনী লো সখি
মলয় সমীর বহিছে।
শ্যামচাঁদ যদি ক্ষণেক আসিত
মদনে হৃদয় দহিছে॥
বহিতে পারিনা যৌবনের ভার
তাহাতে সফল হইত।
নিরাশ হৃদয়ে আশার আলোক
ক্ষণেকের তরে ভাতিত॥
কি দোষ ক'রেছি শ্যামের চরণে
কিবা অপরাধ হ'য়েছে।
অবলা বলিয়া কিছু দয়া নাই—
পাষাণে হৃদয় বেঁধেছে॥
যদি দয়া হয় তব হৃদে সখি
মিটাও মনের বাসনা।
শ্যামচাঁদে ত্বরা আনিয়া হেথায়
ঘুচাও বিরহ যাতনা॥

শ্রীযদুপতি দাস।

# মূড়গ্রামের গোস্বামী-বংশ।

বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমাধীন কেতুগ্রাম থানার ৪৫ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত মূড়গ্রাম নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে শ্রীশ্রীবসু-জাহ্নবা-জনক সূর্য্যদাস পণ্ডিতের বংশধর কয়েকঘর গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহের সহিত বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই গোস্বামিদিগের মূড়গ্রামের আদিপুরুষ এই গ্রামের জনৈক ধনবান জমিদার কায়স্থ শিষ্যের দ্বারা শ্রীপাট অম্বিকা-কালনা হইতে আনীত হইয়া মূড়গ্রামে স্থাপিত হয়েন এবং তথায় শ্রীশ্রীরাধারমণ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনা কতকালের তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করা যায় না, তবে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটকালেই যে ইহা ঘটিয়া থাকিবে এইরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। মূড়গ্রামে "নিত্যানন্দতলা" নামে একটা স্থান বহুকাল যাবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে; প্রবাদ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু একবার এই গ্রামে আগমন করিয়া এইস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করায় এই গ্রাম বহুকাল যাবৎ অভিশপ্ত ছিল। অনুমান ১৬৭০ হইতে ১৬৮০ শকাব্দের মধ্যে এই বংশে শ্রীনিতাই সুন্দর গোস্বামী প্রভু আবির্ভূত হয়েন। ইনি চিরকুমার এবং সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। বাল্যেই ইঁহার বৈরাগ্যোদয় হইলে ইনি গৃহত্যাগ করিয়া কিছুকাল শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করতঃ শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং তথায় দীর্ঘকাল ভজন সাধনের পর সিদ্ধিলাভ করিয়া একবার মূড়গ্রামে প্রত্যাগমন করেন। সেই সময় শ্রীশ্রীরাধারমণ দেব তাঁহাকে রাত্রিতে অন্নভোগের ব্যবস্থা করিতে স্বপ্নাদেশ করেন। তদবধি শ্রীবিগ্রহের রাত্রিতে অন্নভোগের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিছুকাল মূড়গ্রামে বাস করিয়া নিতাই সুন্দর পুনরায় বৃন্দাবন গমন করেন এবং তথায় ধীরসমীরকুঞ্জে শ্রীশ্রীগৌরী দাস পণ্ডিতের বাম পার্শ্বে সমাধি গ্রহণ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীগৌরসুন্দর গোস্বামীর পুত্র পঞ্চানন গোস্বামী। পঞ্চানন গোস্বামীর পুত্র শ্রীচৈতন্যচরণ গোস্বামী বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার অলৌকিক সিদ্ধি ও শক্তির অনেক কথা এখনও শুনা যায়। একদিন ইনি শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের সেবাদি সমাধা করিয়া শ্রীমন্দিরের জগমোহনে বসিয়া মালাজপ করিতেছেন এমন সময় গলিত কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্ত জনৈক লোক আসিয়া তাঁহার নিকট কাতর-নিবেদন করিল "প্রভু আপনার শ্রীচরণোদক পান করিলে আমার ব্যাধি আরোগ্য হইবে।" গোস্বামী প্রভু বলিলেন "তুমি অনেক

গোহত্যা করিয়াছ, সেই অপরাধে তোমার এই মহাব্যাধি হইয়াছে ; যাহা হউক, শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের জন্য তুমি এখন গোশালা হইতে গাভী দোহন করিয়া আন।" গলিতকুষ্ঠগ্রস্ত লোক দুগ্ধ ভাণ্ড ধারণ করিতে অক্ষম। সে গোস্বামীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তিনি তাহাকে একমুষ্টি ছাই দিয়া উহা হস্তে মর্দ্দন করিতে বলিলেন। গোপ এইরূপ করিবামাত্র দশটি অঙ্গুলী ফুটিয়া বাহির হইল। এই গোপের বংশধরগণ অদ্যাপি গৌরবের সহিত শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের সেবার জন্য গাভীদোহনের কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরণ গোস্বামীর তিন পুত্র যথাক্রমে রাধা গোবিন্দ গোস্বামী, গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী ও দোলগোবিন্দ গোস্বামী। এবং তিন কন্যা, প্রথম কন্যা শ্রীপাট কেঁচুনিয়ার শ্রীশ্রীজাহ্নবা প্রতিপালিতা শ্রীঠাকুরদাস ঠাকুর গোস্বামীর বংশে, দ্বিতীয় কন্যা শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য শাখা পাঁচতোপীবাসী শ্রীশ্যামাদাস ঠাকুরের বংশে এবং তৃতীয় কন্যা গৌরীপুরে শ্রীশ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সার্দ্ধ চব্বিশ শাখার অন্যতম গোস্বামী বংশে প্রদত্ত হয়েন। শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ গোস্বামীর বংশধরগণ বর্ত্তমান সময়ে মুড়াগ্রামে বাস করিতেছেন। এই আড়ম্বর শূন্য গোস্বামী পরিবার কি গাঢ় অনুরাগের সহিত ইঁহাদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধারমণদেবের সেবা করিয়া আসিতেছেন তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। রাধারমণ যেন তাঁহাদের পরিবারের একজন ঘরের ছেলে। শ্রীঅঙ্গনের ধূলা লইয়া গোস্বামী বংশের যে কেহ প্লীহাস্থানে চাপিয়া দিলে উহা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া যায়।

এই গোস্বামীগণ শালী গ্রামের বাৎস্য গোত্রীয় বোষাল এবং শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের বংশ ও শ্রী গৌরীদাস পণ্ডিতের পরিবার। ইঁহাদের গুরু প্রণালী যথা ১। শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, ২। বিষ্ণুদাস গোস্বামী, ৩। অনন্তাচার্য্য গোস্বামী ৪। মধুসূদন গোস্বামী, ৫। রামচন্দ্র গোস্বামী, ৬। কৃষ্ণানন্দ গোস্বামী ৭। গৌরসুন্দর গোস্বামী, ৮। গোবিন্দ মণি ঠাকুরাণী, ৯। বিনদ মণিঠাকুরাণী।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য শাখা পাঁচতোপীর শ্রীশ্যামাদাস ঠাকুর বংশীয় আমার পিতৃদেব শ্রীনন্দদুলাল ঠাকুর মহাশয় উপরিউক্ত সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য চরণ গোস্বামীর দৌহিত্র।

শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের প্রাচীন শ্রীমন্দির ভূমিসাৎ হইলে, সন ১৩০০ সালে আমার পিতৃদেব বর্ত্তমান পাকা শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য শাখা শ্যামদাসের পরিচয় আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমুরারিমোহন অধিকারী।

# রামকেলী সংস্কার। *

বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত, বৈষ্ণব জগতের গুপ্ত বৃন্দাবন নামে পরিচিত তীর্থরাজ রামকেলীর নাম সম্ভবতঃ কাহারও অবিদিত নাই। এই স্থানে চারি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শুভাগমন করতঃ তদানীন্তন গৌড়েশ্বরের দবীরখাস ও সাকরমল্লিক উপাধিধারী দুই প্রধান ব্রাহ্মণ আমাত্যকে কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিয়া ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই দুই মহাত্মাই নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণেতা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনের পুনরাবিষ্কর্ত্তা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী নামে পরিচিত হন। এই রামকেলী গ্রাম উক্ত গোস্বামীদ্বয়ের পূর্ব্ব বাসস্থান বলিয়া বৈষ্ণবগণের পরম আদরের বস্তু, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ পবিত্রীকৃত ও যে বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া মহাপ্রভু উক্ত গোস্বামিদ্বয়কে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই কেলীকদম্ব বৃক্ষটীকে অদ্যাপি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে বলিয়া ইহা পবিত্র তীর্থস্বরূপে পরিগণিত। এই তীর্থক্ষেত্রে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর বহুবিধ পুণ্যকীর্ত্তি বিরাজিত ছিল। কিন্তু কালের প্রভাবে এখন তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত। কেবলমাত্র সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ ও রূপসাগর নামক একটী প্রকাণ্ড সরোবর শ্রীভ্রষ্ট হইয়া বিদ্যমান আছে। মদনমোহন জিউর শ্রীমন্দির এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত এবং রূপসাগর জঙ্গল ও কর্দ্দম পরিপূর্ণ। অথচ মেলা ও উৎসবের সময় নানা দিগদেশাগত সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর এই কদর্য্য জলই ব্যবহার করিতে হয়। এই সরোবরটীর এখন সংস্কার না করিলে অদূর ভবিষ্যতে ইহা একেবারে সংস্কারের অযোগ্য হইয়া যাইবে এবং গৌরবমণ্ডিত একটি প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। রূপসাগরের পঙ্কোদ্ধার বহুকাল যাবত না হওয়ায় রামকেলীর ন্যায় একটী অতি

---

* রামকেলীর সংস্কার সমিতির নিকট হইতে এক নিবেদনপত্র প্রচারের জন্য আমরা পাইয়াছি, প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ যাহাতে বজায় থাকে, লুপ্তপ্রায় তীর্থসকল যাহাতে উদ্ধার হয় তাহার জন্য সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করা উচিত। বৈষ্ণব জগতে যথার্থই যেন আজ কাল তীর্থাদি সংস্কার জন্য এক সাড়া পড়িয়াছে। অনেক কৃতবিদ্য সংস্কার বিষয়ে হাত দিয়া থাকেন। রামকেলী সম্বন্ধে যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণই অগ্রণী হইয়াছেন, আশা করি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শীঘ্রই রামকেলীর সংস্কার সুসাধিত হইবে। আমরা উক্ত সমিতির নিবেদন পত্রখানি মুদ্রিত করিলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মাগণের এ বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (ভঃ সঃ)

প্রাচীন বহ্নিকু গ্রাম ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর হইয়া প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। বিগত চারি শতাব্দীর অধিক কাল যাবত যে মহতী মেলা ও মহোৎসব প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভাগমনের পুণ্য স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে, জলাভাব ও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তাহাতেও যাত্রী সমাগম ক্রমশঃই কম হইতেছে। যে কেলীকদম্ব বৃক্ষটী শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র স্মৃতির জীবন্ত ও ঐতিহাসিক চিহ্ন তাহাও যথোচিতরূপে সুরক্ষিত নহে। এই প্রাচীন হিন্দু-কীর্তিসমূহের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলে, হিন্দু মাত্রেরই প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে অনতিবিলম্বেই যে এই অমূল্য স্মৃতিগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক, ইহা বলাই বাহুল্য। এতদর্থে আনুমানিক ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ও সৎকার্য্যে সদা উন্মুক্তহস্ত ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত ইহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। আমরা আশা করি এই কার্য্যে নিশ্চয়ই যথোচিত সাহায্য পাইব। সাধারণের আশ্বাসবাণী পাইলেই আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

এতদ্‌কল্পে প্রদত্ত অর্থ নিম্ন স্বাক্ষরকারী স্থানীয় জমিদার যদুনন্দন চৌধুরী গ্রহণ করিবেন।

শ্রীগোলাপলাথ ঘোষ ও শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ। অমৃতবাজার পত্রিকা।
রায় বাহাদুর শ্রীঅম্বিকা প্রসাদ সেন ( এম, এ, ম্যাজিষ্ট্রেট )
শ্রীযদুনন্দন চৌধুরী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, স্থানীয় জমিদার
[ চেয়ারম্যান, ইংরেজবাজার মিউনিসিপালিটী ]
শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী এম, এ, বি, এল উকিল
রায়সাহেব শ্রীপঞ্চানন মজুমদার ( বি, এল, সরকারী উকীল,
( চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড )
শ্রীযুটুবিহারী দাস [ নাটা ক্ষ্যাপা ]
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ( সম্পাদক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও
শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনী )
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। সম্পাদক বসুমতী
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী উকীল, সভার সভাপতি
শ্রীরাইকিশোর প্রামাণিক, মোক্তার
শ্রীরমেশচন্দ্র বাক্‌চী বি, এল উকীল ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক
সভার সদস্য এম, এল, সি,
শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ( কলিকাতা )
শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক কবিরাজ ( কলিকাতা )

# ভক্তি

[ ২৩শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ১০ম সংখ্যা ]

## প্রার্থনা

বিষয় স্রোতেতে ভেসে,	ঘুরি ফিরি দেশে দেশে,
কালবশে অবশেষে কোন্ ধামে যাই।
কোথা গেলে পাব শান্তি,	ঘুচিবে বিষয় ভ্রান্তি,
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ ল'য়ে ভাবি সদা তাই॥
রূপ বিদ্যা কিবা জ্ঞান,	কিবা ধন কিবা মান,
ক্রমে ক্রমে তৃণ হেন মনে সব হয়।
যবে সেই পদে ভক্তি,	হবে মোর অনুরক্তি,
সেইদিন দয়া ক'রে দাও দয়াময়॥

দয়াময়! আড়ালে থাকিয়া এমন করিয়া আর কতকাল নাচাইবে। মায়ার কুহকে পড়িয়া হতজ্ঞান হইয়া যদিও তোমার অসীম দয়ায় বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, যদিও তোমাকে আপন বলিয়া ভালবাসিতে পারিতেছি না, তাই বলিয়া কি তুমিও ভুলিয়া থাকিবে? তোমার ভক্তমুখে শুনিতে পাই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ হইলেও তুমি সাধিয়া যাচিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ভালবাস—কৃপাকর আর করিবেই বা না কেন, তোমার যে দয়াময় নাম তাহাতো মিথ্যা হইতে পারে না? আমি অভিমান বশতঃ গর্ব্বভরে বলিয়া থাকি আমিই করিলাম, কিন্তু নর্ত্তকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন পুতুল কোন কাজই করিতে সমর্থ হয় না সেই রূপ তুমি যদি জীবের অন্তরে থাকিয়া না করাও বা না বলাও তাহ হইলে জীবের কিছু করে না বলে। জীবমাত্রই যে তোমার শক্তিতে তোমার সাধ্য কি যে সে ইচ্ছায় চালিত—পালিত। কিন্ত এক বিবেক শূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান হারা হইয়া তুমি

তুমি যে সর্ব্বনিয়ন্তা তাহা ধারণা করিতেও পারিতেছি না। বৃথা অভিমানের বোঝা হৃদয়ে লইয়া আমার আমার করিয়া জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছি। অনেক ভাবে অনেক প্রার্থনা করিয়াছি, এইবার এইমাত্র প্রার্থনা করি, যেন তোমাতে নদীর প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভক্তি থাকে। আর প্রার্থনা যাঁহারা তোমার অমৃতোপমভাবে হৃদয়কে নির্ম্মল করিয়াছেন আমি যেন নিরন্তর সেই সকল নির্ম্মল হৃদয় পরম ভাগবতগণের সঙ্গলাভে জীবন ধন্য করিতে পারি। আমাকে অসৎ সঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়া নিজ কৃপাগুণে সৎসঙ্গ লাভের যোগ্য পাত্র করিয়া দাও, তাঁহাদের সঙ্গে তোমার গুণানুবাদ-রূপ অমৃত-রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত ও তোমার ভাবে মত্ত হইয়া থাকি। কৃপাময় দীনহীনে কৃপা কর।

---

# ত্যাগ-ধর্ম্ম।

ভোগে মৃত্যু, ত্যাগে অমৃত,—ভোগে বন্ধন, ত্যাগে মুক্তি,—ভোগে দুঃখ, ত্যাগে শান্তি, ইহাই ভারতের সনাতন শিক্ষা। সনাতন-ধর্ম্ম যুগে যুগে বেদে পুরাণে এই শিক্ষাই ভারতকে দিয়া আসিতেছেন।

জড়বাদ ভারতে কখনও স্থান পায় নাই,—ঋষিগণ আধ্যাত্ম বাদকেই আদর করিয়াছিলেন। "যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাম্"—যাহা আমাদিকে অমৃতের আস্বাদন দিতে পারিবে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ইহাই হইল ভারতীয় উপনিষদের চরম উপদেশ।

জড়বাদীর সংসর্গে এখন আমরা সে উপদেশ, সে শিক্ষা ভুলিতে বসিয়াছি। আমরা মরিতে বসিয়াছি। আমরা অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃতের সন্ধান ছাড়িয়া যাহা মর, যাহা বন্ধনের নিদান, তাহার পাছে পাছেই ছুটিয়াছি। আমরা কি করিতেছি? হায়! আমাদিগের পরিণতি কোথায়?

যাহারা আপাতমধুর ভোগসুখের প্রলোভন দেখাইয়া আমাদিগকে আধ্যাত্ম-চিন্তা ভুলাইয়াছে, তাহারা আমাদিগের পরম শত্রু। যাহাদিগের শিক্ষার দীক্ষার আমাদিগের জড়ের তৃষ্ণা জাগিয়াছে কেমন করিয়া কে তাহাদিগকে বন্ধু বলিবে? ত্যাগধর্ম্মী ভারত আজ তাই ভোগের পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু

সনাতন অনভ্যাস তাহাদিগের পদে পদে অন্তরায়। হায় হতভাগা! আজ তুমি পিশাচীর পানে চাহিয়া কাঁদিতেছ—তাহাকে সুন্দরী সুখময়ী ভাবিয়া লাভ করিবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছ? ঐ শুন পিশাচীর মোহ-আবরণ উন্মোচন করিয়া ঋষি তোমাকে তারস্বরে তিরস্কার করিতেছেন—আর কেন জাগো জাগো—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

আমি সেই তমসার পরপারবর্ত্তী মহাপুরুষের সন্ধান পাইয়াছি। তাঁহাকে জানো, তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর। মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিবে। আর তোমার অন্য পন্থা নাই।

শুনিবে না কি সে দিব্যদৃষ্টিতে মধুর আহ্বান? জাগিবে না কি—হে আধ্যাত্মদ্রষ্টা আর্য্যগণের বংশধর! এখনও তুচ্ছ মরণশীল বিলাসিতার চাকচিক্য লইয়াই মজিয়া থাকিবে?

কাঞ্চনের প্রলোভনে তুমি আজ পশুর মত বর্ব্বর সাজিয়াছ,—ন্যায় অন্যায় বিচার ভুলিয়াছ। কামিনীর প্রলোভনে তুমি আজ অসংযত বিলাসী বাবু। এই কি তোমার পরিণাম! এই কি তোমার চরম কাম্য!!

ফিরিয়া এস তোমার ত্যাগমন্ত্র মুখরিত তপোবনে। সেখানে এখনও বিবেকানন্দের মুখে শুনিতে পাইবে—"ত্যাগই ধর্ম্মের প্রথম সোপান।" উপনিষদের ত্যাগ ফল সেখানে ফুটিয়া আছে। গন্ধে দিক্‌চক্রবাল আমোদিত করিয়া বলিতেছে—

"ন মেধয়া ন প্রজয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"

এই ত্যাগের বাণীই ভারতের মুক্তি মন্ত্র। জড়ীয় ভোগ বাসনার বন্ধন কঠোর-বৈরাগ্য অস্ত্রে ছেদন করিয়া কে আজ মৃত্যুঞ্জয় হইবে? সুখে টলিবে না, দুঃখে টলিবে না, শীতে মরিবে না, আগুনে পুড়িবে না। শাশ্বত সনাতন জীবন লাভ করিবে। (পল্লীবাণী)

# কবে ন'দেবাসী হ'ব ।

হায়! হায়!! হেনদিন হবে কি আমার ।
নিরখিব নবদ্বীপ ব্রহ্মাণ্ডের সার ।
নরকের কীট আমি ঘৃণিত অধম ॥
হেন নিত্যধাম মুই পাব কি দর্শন ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গের পদরজ কণা ॥
পরশে পরম সুখ পাবে কি এ জনা ॥
ন'দে রজে পদরজ আছে মাখা মাখি ।
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হায় কবে হব সুখী ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ চাঁদে খুঁজিয়া বেড়াব ।
সীতানাথে হেরিবারে আকুলী হইব ॥
উর্দ্ধশ্বাসে কবে যাব শ্রীবাসের বাস ।
নিরখিব স্থান প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস ॥
গৌর-গরবে কবে নাচিয়া নাচিয়া ॥
ভ্রমিব এই নিত্যধামে মুই অভাগিয়া ॥
এমন সৌভাগ্য মোর উদয় কি হবে ।
গৌরাঙ্গ ভকত যত সঙ্গী করি লবে ॥
গদাধর গৌরীদাস শ্রীবাস গোবিন্দ ।
দীনে দয়া কর প্রভু মুরারি মুকুন্দ ॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
কৃষ্ণদাস শিবানন্দ কোথায় শ্রীধর ।
কেশে ধরি লহ মোরে নদিয়া নগর ॥
পুরাও "মঙ্গলার" এই মন অভিলাষ ।
জন্মে জন্মে হই যেন ন'দেবাসী দাস ॥

"হরিবোল" গ্রন্থকার
শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ গুহ শাস্ত্রী।

# মণি-মন্দির

[ মণি-মন্দির লেখক পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ভুলুয়া বাবার সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক পরিচয় দিবার আর আবশ্যক হইবে না। শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী, শ্রীশ্রীব্রজমাধুরী, হরিবোলঠাকুর, উচ্ছ্বাস-তরঙ্গিনী, সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া সাধারণের মধ্যে তিনি বিশেষ ভাবেই পরিচিত হইয়াছেন। গ্রন্থা'দ পাঠ করিয়া মুখস্থকরা কথা বলিয়া অনেকে লোকের নিকট বাহাবা পাইয়া থাকেন সাধারণ লোকের কথা অপেক্ষা তাহা প্রণিধান যোগ্য বটে কিন্তু যিনি নিজ সাধন-লব্ধ জ্ঞানদ্বারা সত্য-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া জনসাধারণে তাহা প্রকাশ করেন তাঁহার সে বাক্য যে সর্ব্বোপরি গ্রহণীয় এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ইনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ, ছাত্র জীবনে সাধু ভক্ত-সঙ্গ লোলুপ, প্রৌঢ় জীবনে ভগবচ্চরণে অর্পিত মন প্রাণ লইয়া রামপ্রসাদাদির ন্যায় সাধনরত। ইহাঁর লেখার এক বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা বা ভাবের সঙ্কীর্ণতা বা কোন সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ ইহাঁর লেখায় নাই। যাহা সত্য, যাহা সৎ তাহাই ভক্তিরসপূর্ণ সরল ভাষায় লিখিত। আমরা পূর্ব্বে ইহাঁর লিখিত ব্রজমাধুরীর ২।১টী পদ পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি, এক্ষণে ইহাঁর লিখিত অপ্রকাশিত "মণি-মন্দির" হইতে কিছু কিছু প্রকাশ করিব। পাঠকগণ আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হউন। ] (ভঃ সঃ)

*　　*　　*　　*

যে সকলকে সম্মান করে সে সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়, যে পরের নিন্দা করে সে সর্ব্বত্র নিন্দিত হয়। যে না ডাকিলেও নিজে যাইয়া বিপন্নের উপকার করে পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাহারই উপকার করে। আবার যে পরের অপকার করে ইচ্ছা না থাকিলেও পর কর্ত্তৃক তাহার অপকার ঘটিয়া থাকে। যে পরের মনে ব্যথা দেয় সে কালক্রমে নিজের মনেও ব্যথা পায়। যে পরের সুখের জন্য ব্যাকুল সে না চাহিলেও পর কর্ত্তৃক সুখপ্রাপ্ত হয়। চারিদিক জঙ্গল বেষ্টিত মাঠের মধ্যে যেরূপ ধ্বনি করা যায় ঠিক তাহাই যেমন প্রতিধ্বনি রূপে শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ভাল মন্দ যেমন কর্ম্মকরা যায় কাল ক্রমে ঠিক তাহাই

আবার নিজ স্কন্ধে আসিয়া ফলপ্রদান করে, অতএব কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে তাহার পরিণাম সহ্য করিবার শক্তি আছে কি না বিচার করিয়া তবে কর্ম্মে অগ্রসর হওয়া উচিত।

* * * *

পৃথিবীর সমস্ত জীবই আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ ত কত অগণ্য পথে আনন্দের জন্য উধাও হইয়া গমন করিতেছে কিন্তু মায়ার এম্‌নি কুহক যে, আনন্দময় পরমেশ্বরের পরম আনন্দময় সাধনার দিকে কেহ লক্ষ্য করিতেছে না। যেখানে আনন্দের সমুদ্র মানুষ সেখানে ভুলিয়াও একবার যাইতে ইচ্ছা করে না, কেবল দুঃখপূর্ণ গৃহরূপ কারাগারে আবদ্ধ রহিয়া হায় হায় করিতেছে। মানুষ চায় চিনি কিন্তু কি দুর্দ্দৈব চূণের কারখানায় যাইয়া বৃথা গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে।

* * * *

যেমন আগুনের নিকট বসিলে শরীর উত্তপ্ত হয়, বরফের নিকট বসিলে শরীর শীতল হয়, সেইরূপ সেই আনন্দময় পরমেশ্বরের নিকট যে যত বসিতে পারিবে সে তত আনন্দময় হইবে।

* * * *

কোন্ পথে পরমেশ্বরের নিকট যাইয়া বসিতে পারা যায়? সত্য ও অহিংসাই সেই পরমেশ্বরের নিকটে যাইবার একমাত্র পথ।

* * * *

অনিষ্টকারিকে কোন্ ব্যক্তি ক্ষমা করিতে পারেন? যিনি সেই ক্ষমা-ময় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি। আর যিনি সর্ব্বত্র তাঁহার মঙ্গলময় বিধান উপলব্ধি করিতে পারেন তিনি।

* * * *

সংসারে সকলেই ভয়ে অস্থির। গরীব লোক বড় লোকের উৎপাতের ভয়ে অস্থির, বড় লোক জমিদারের ভয়ে অস্থির, জমিদার রাজার ভয়ে অস্থির, রাজা-মহারাজা সম্রাটের ভয়ে অস্থির, সম্রাট আবার প্রজা-বিদ্রোহ বা অন্যান্য সম্রাটগণের আক্রমণ আশঙ্কায় অস্থির।

* * * *

অন্যদিকে পিতা, মাতা পুত্র ও কন্যাগণের অমঙ্গল ভয়ে অস্থির, গৃহস্থ চোর

ডাকাতের ভয়ে অস্থির, চোর ডাকাত ধরা পড়িবার ভয়ে অস্থির, এইরূপে যে দিকে অনুসন্ধান করি সেই দিকেই দেখি সকলেই একটা না একটা ভয়ে অস্থির। অতএব নির্ভীক কে? যে নির্দ্দোষ সে-ই নির্ভীক। আর যে সংসার ছাড়িয়া নির্ব্বাসনা হইয়া সেই অভয় দাতা পরমেশ্বরের নাম সার করিয়াছে সে-ই নির্ভীক।

ক্রমশঃ

# নবদ্বীপে লক্ষ্মণের শক্তিশেল চিত্র।

রামায়ণের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, ত্রেতাযুগে রাম-রাবণের যুদ্ধ কালীন লক্ষ্মণ শক্তিশেল আহত হইলে ভগবান রামচন্দ্র প্রাণপ্রিয় অনুজ লক্ষ্মণের দেহ ক্রোড়ে লইয়া অবিরত অশ্রুধারায় ধরাতল সিক্ত করিয়াছিলেন, পরে হনুমান কর্তৃক আনীত গন্ধমাদন পর্ব্বত-জাত মহৌষধির গুণে লুপ্তচেতন লক্ষ্মণের পুনর্ব্বার চেতন সঞ্চারিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাবতারে ইহার একটী অনুরূপ চিত্র ভক্ত পাঠকগণকে দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।

হাড়াই পণ্ডিতাত্মজ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মথুরায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির মূর্ত্তি প্রকট না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তথায় বাস করিবেন ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, এদিকে বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যখন নবদ্বীপে ভক্তিযোগ ও নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন নানাস্থান হইতে তাঁহার ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন, নিত্যানন্দপ্রভু ও তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সত্বর নবদ্বীপ আগমন করিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে অতিথি হইলেন, মহাভাগবতোত্তম নন্দনাচার্য্য প্রকাণ্ড শরীরধারী অবধূত বেশী নিত্যানন্দ প্রভুকে পাইয়া পরমানন্দে তাঁহাকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া সযত্নে রক্ষা করিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন অন্তরে জানিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন কোন মহাপুরুষ নবদ্বীপ ধাম পবিত্র করিবার জন্য

আগমন করিয়াছেন।" হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে অবজ্ঞা দিলেন তাঁহারা যেন নবদ্বীপ ধাম তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন কোথায় তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে উভয়ে তিন প্রহর ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া উক্ত মহাত্মার কোনই উদ্দেশ না পাইয়া মহাপ্রভুর নিকট গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন।

গৌরাঙ্গাবতারে নিত্যানন্দ চরিত বড়ই গূঢ়, ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই নিত্যানন্দ তত্ত্বজ্ঞাতা। নিত্যানন্দপ্রভুর আন্তরিক ইচ্ছা মহাপ্রভু যদি নিজে আসিয়া তাঁহাকে ধরাদেন তবেই তিনি ভক্ত সমাজে ধরা দিবেন। ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের বাসনা কখনই অপূর্ণ রাখেন না। মহাপ্রভু তখন ভক্তগণকে বলিলেন—"তোমরা আমার সঙ্গে এস, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব"। ভক্তগণ মহোল্লাসে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে করিতে মহাপ্রভুর অনুগমন করিলেন। মহাপ্রভু সকলকে লইয়া একেবারে নন্দনাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া সকলে দেখিলেন জনৈক দিব্য দেহ জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ সহাস্য বদনে নীরবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু উক্ত পুরুষকে নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার প্রাণের ঈশ্বরকে চিনিয়া স্তম্ভিত হইয়া মৌনাবলম্বী হইয়া রহিলেন, মহাপ্রভু অন্তরে সমস্ত জানিয়া ভক্ত সমাজে নিত্যানন্দ চরিত জানাই বার এক অভিনব উপায় সৃজন করিলেন। তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে একটী ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তির আদেশ দিলেন, শ্রীবাস পণ্ডিতও মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া একটী কৃষ্ণ ধ্যান শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। শ্লোক উচ্চারিত হইবা মাত্র নিত্যানন্দ প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু তখন পণ্ডিতকে পুনঃ পুনঃ উক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তাহাতে নিত্যানন্দপ্রভু কখনও অচেতন কখনও সচেতন, কখন ও ক্রন্দন, কখনও ভূমি শয্যা, কখনও বা ভীষণ সিংহনাদ ইত্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, পরে ধরাতলে তিনি এরূপ আছাড় খাইয়া পরিতে লাগিলেন যে, মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাহা দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইলেন যে তাঁহার হাড়গুলিই বা চূর্ণ হইয়া যায় এবং তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তাঁহারা বাহুবেষ্টনী দ্বারা ধরিতে যত্নবান হইলেন, কিন্তু কেহই সক্ষম হইলেন না। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। বিশ্বম্ভরের কোল পাইবামাত্র নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার প্রাণ তাঁহার প্রাণের দেবতাকে সমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস এ চিত্র দেখিয়া গাহিলেন—

"ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তি হত লক্ষণ যে হেন রাম কোলে॥
প্রেম-ভক্তিবাণে মূর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কান্দে গৌরচন্দ্র॥"

ভক্ত পাঠকগণ! একবার হৃদয় ভরিয়া নবদ্বীপের এই চিত্র—করুণরসাত্মক মনোহর চিত্র অবলোকন করুন। ভাগবতোক্ত শ্লোকই এক্ষণে শক্তিশেল এবং মৃতসঞ্জীবনী হরিনাম মহামন্ত্রই চেতনা সঞ্চারের মহৌষধি।

এদিকে গদাধর পণ্ডিত বিশ্বম্ভর কোলে নিত্যানন্দকে দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিতেছেন আর বলিতেছেন—আজ একি বিপরীত দেখিতেছি! যে অনন্ত বিশ্বম্ভরকে ধারণ করেন আজ তার গর্ব্বচূর্ণ—তিনি আজ বিশ্বম্ভরের কোলে। নিত্যানন্দের অগাধ গূঢ়চরিত হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই দুষ্কর। গদাধর নিত্যানন্দজ্ঞাতা তাই তিনি তাঁহার প্রভাব সম্পূর্ণ অবগত। নিত্যানন্দ কৃপা না হইলে মহাপ্রভুর কৃপাকণা লাভে কেহই সমর্থ হয় না। মহাত্মা শ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ভক্তপ্রবর শ্রীরামদাস বাবাজী এক্ষণে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" গানে বৈষ্ণব সমাজে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" গান ভজনের মূল মন্ত্র। আগে নিতাই পরে গৌর, আগে রাধা পরে শ্যাম ভজনের ব্যবস্থা তিনি প্রচার করিয়াছেন, নিত্যানন্দ ভজিলেই গৌরাঙ্গ লাভ হইবে আবার রাধা ভজিলেই কৃষ্ণ মিলিবে অথবা নিত্যানন্দ ভাবে গৌরাঙ্গ আর রাধা ভাবে কৃষ্ণলাভ জীবের পক্ষে সুলভ। প্রেমদাতা পরম দয়াল নিত্যানন্দ চরিত্রের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাওয়া পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় দুরাশা মাত্র, তজ্জন্য তাঁহার কৃপাভিখারী হইয়া যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

শ্রীযদুপতি দাস।

# দশটী শাস্ত্রোক্ত উপদেশ।

## ( শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাসদেব কথিত )

১। নিন্দা শূন্য হৃদয়ে নম্রভাবে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম সকলকে প্রণাম ও বন্দনা করিবে।

২। জগতে দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ জানিবে।

৩। নিজেকে তৃণ লতা হইতেও নীচ মনে করিয়া সর্ব্বসাধারণ জীবকে উচ্চ স্থানে সম্মান করিবে।

৪। "জীবে দয়া, নামে রুচি, এবং বৈষ্ণব সেবন" প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়া আচারণ করিবে।

৫। শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নাম মন্ত্র, গুরু, বৈষ্ণব ইঁহাদিগকে এক বস্তু বলিয়া জানিবে।

৬। শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত বস্তু মহাপ্রসাদ জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করিবে। মহাপ্রসাদ স্পর্শ দোষে দুষ্ট হইতে পারে না।

৭। কায়মনোবাক্যে প্রাণি মাত্রে কখনও উদ্বেগ দিও না।

৮। যথালাভে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে।

৯। মর্কট বৈরাগ্য করিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা কখনও করিবে না।

১০। নাম সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু। কলিকালে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনাই শাস্ত্রানুমোদিত পন্থা। একজ সর্ব্বদা নাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে।

## প্রেম।*

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

প্রেম শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্রই আজকাল সাধারণ মানবের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এরূপ হইবার কারণ কি? প্রেম বলিতে কি অবৈধ প্রেমই বুঝায়? অর্থৎ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিজ বধূর সঙ্গে প্রেম, আচার্য্য বাবুর সহিত বৃদ্ধ

* প্রবন্ধটীর নাম প্রেম কিন্তু লেখক প্রেমের কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না. বিশেষতঃ তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার সকল গুলি সর্ব্ববাদী সম্মতও না হইতে পারে। আমরাও ইহার সকলগুলির সহিত একমত বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। কেবল লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য এটি প্রকাশ করিলাম (ভঃ সঃ)

রাক্ষসীর প্রেম, এবং কুকুরের সহিত গুপ্তবাবুর প্রেম,—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কুলবধুর সঙ্গে প্রেম, অথবা পাঠক মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রেম; এবম্প্রকার লঘুর সঙ্গে গুরুর প্রেম, ঠাকুরের সঙ্গে কুকুরের প্রেম, কুকুরের সঙ্গে ঠাকুরের প্রেম ইত্যাদি প্রেমকেই এখনকার প্রেমিক প্রেমিকাগণ প্রেম বলিয়া জানেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেম উক্ত প্রকার হেয় বা ঘৃণার পদার্থ নহে। উক্ত প্রকার প্রেম বা ভালবাসাকে রাক্ষসী মায়া বা পাশববৃত্তি বলিয়া বোধ করা সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। প্রণয় বা প্রেম আহা। আহা!! কি মধুর শব্দ! প্রেম শব্দটি যেন সুধা দ্বারা নির্ম্মিত। প্রেমামৃত রসে ঘৃণা বিষ প্রয়োগ করা পশুত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। আহা! প্রেম শব্দটি উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই হৃদয় গ্রন্থি গলিয়া আনন্দে শিথিল হইয়া পড়ে। এবং তখন আর আমাতে আমি থাকি না, কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে আত্মহারা হইয়া যাই সে ভাব লেখনী দ্বারা লিখিয়া বাক্য দ্বারা বলিয়া অপরকে বুঝাইতে পারি না। আমার পাঠক পাঠিকাগণ যদি যথার্থ প্রেমিক প্রেমিকা হন, তাহা হইলে তাঁহার ভাবে আমার ভাবে ঐক্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন—কথা ঠিক কি না। আর আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি পাঠক পাঠিকাগণ উপরোক্ত প্রেমিক প্রেমিকা না হন তাহা হইলে স্বভাব অভাবে আমার ভাবটি ভাবান্তরে স্থাপন করিবেন।

ইহাই কি প্রেম? প্রেম কি রূপ? প্রেম কি যৌবন? প্রেম কি? কামিনীর কৃষ্ণকুন্তল না অশীতিপর তাপসের পিঙ্গল জটাজাল প্রেম কি শুধু যৌবনের চঞ্চল কটাক্ষ না একটা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র? প্রেম কি কেবল যৌবনের সহচর? কিম্বা দীর্ঘশ্বাস, হা হুতাশ ও হৃদয় বেদনার অধিষ্ঠাতা? এই কি প্রেম? যদি তাহাই হয় তবে এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত প্রেমে নিয়মিত ও প্রেমের পূবায় পূরিত সেই বিশ্ববিরাট প্রেম ত অর্ব্বাচীনের প্রলাপ মাত্র! তাহাই যদি হয় তাহা হইলে প্রেমের নাম এই জগৎ হইতে চিরতরে লুপ্ত হউক! কিন্তু তাহাই কি ঠিক? কখনই নহে। প্রেম সৎ, প্রেম চিৎ, প্রেমই আনন্দ। অনিত্য জগতের অনিত্যতাই প্রেম। সচ্চিদানন্দ প্রেমের বিকাশ সর্ব্বত্র। এক কথায় প্রত্যেক অনুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণব্রহ্ম চিন্ময় পর্য্যন্ত প্রেমের ডোরে আবদ্ধ। তখন অন্য পরে কা কথা! এই সনাতন ধর্ম্মই প্রেম। প্রেম সমস্ত নিয়ম ও ক্রিয়ার মূল ধর্ম্মেরও আদি এবং মূল প্রেম। প্রেমই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য! কিছুতেই প্রেমের হাত এড়াইবার যো নাই। সকল জিনিসের সার বস্তু প্রেম। সর্ব্ব পদার্থের পদার্থত্বই প্রেম। এখন বুঝিলেন প্রেম কি? প্রেম

ও কাম দুটো খুব পাশা পাশি কি না। সেইজন্য কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন "কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।" মানুষ বুদ্ধি থাকিলে কাম আর ভগবদ্বুদ্ধি থাকিলেই প্রেম। কিন্তু এ সমস্তের মূলে মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলে এসব হয় না। প্রেম কি তাহা বুঝান, এই পাগল, অধম ও অক্ষম লেখকের পক্ষে অসম্ভব—তবে অতি সামান্য মাত্রায় পাগলের পাগলামী শ্রবণ করুন।

প্রেম অতি দুর্লভ ( বস্তু ) স্বর্গীয় পদার্থ। ধরণীবাসী নর নারীগণ ব্যবহার দোষে স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্পটী বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ, তাহার শ্রী, সৌরভ ও গৌরব এককালে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। হায়!! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ছার মানব জাতীর ঘৃণিত জীবনে সহস্রশ্র ধিক্! আর কি বলিব। হৃদয়—ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি প্রেম, কি ঘৃণিত মানবকে অর্পণ করিবার বস্তু? এযে দুর্লভ পদার্থ! এ অমূল্য ধনের গৌরব বা আদর পশুতে কি জানিবে? ইহার গৌরব বা আদর স্বর্গীয় দেব দেবী ভিন্ন অন্যে জানিবার বা বুঝিবার অধিকারী নহে। তবে যাঁহারা দেব লোক ছাড়িয়া মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছেন এরূপ দেব জাতীয় মানব অবশ্যই প্রেমের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম, অন্যে নহে।

প্রেম একটি মাত্র বস্তু। একটি বস্তু একজন ভিন্ন দুই ব্যক্তিকে কখনই অর্পণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু এখনকার প্রেমিক প্রেমিকাগণ এক প্রেমকে বহু শাখা প্রশাখায় বিভাগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ আচার্য্য বাবুর দুই পত্নী এবং অসংখ্য উপপত্নী কিন্তু বাবুর সকলের সঙ্গেই সমান প্রেম, আহা! লোকটা কি প্রেমিক কলিকালের কৃষ্ণ অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন প্রেমিকের গুণের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

তাই বলি প্রেম সামান্য বস্তু নহে। মনে করুন আমি একজন রমণী আজ যদি জনৈক মানবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমার হৃদয়ের অমূল্য নিধি প্রেম, তাঁহার করে অর্পণ করিয়া হৃদয় ভাণ্ডারটি শূন্য করিয়া বসিলাম, কিন্তু—প্রেমরূপ গুরুভার অমূল্য নিধি, দুর্ব্বল নর কতদিন বহনে সক্ষম? যদিন তাহার পিপাসার শান্তি না হয়, যেমন কোন ব্যক্তি পিপাসিত হইয়া এক ঘটি জল লইয়া পান করিতে করিতে যেমন পিপাসার শান্তি হইল অমনি ঘটিটি ত্যাগ করিল, মানবেরও প্রেম পিপাসা ঠিক জল পিপাসার ন্যায়। পিপাসিত ব্যক্তি জল পাইবার জন্য প্রথমে সংস্র চেষ্টাও আনচান করে, কিন্তু জলপান করিয়া যেমন পিপাসার শান্তি হয়, তখন

পূর্ব্বের পিপাসার কষ্ট আর৷ স্মরণ হয় না। অতএব রত্নাকর ভিন্ন যেমন অন্য কোন এরূপ জলাশয় নাই যে নদীর বেগ ধারণ করে,—সেই মত ঈশ্বর স্বরূপ রত্নাকর ভিন্ন, প্রেমরূপ নদীর স্রোত, অন্য কেহই ধারণে সক্ষম নহে। মানব-প্রেম ক্ষণভঙ্গুর বা অস্থায়ী। তাহার কোটী কোটী প্রমান নানা শাস্ত্রে, পুরাণে, উপন্যাসে শুনিতে পাওয়া যায়। মানবের যে প্রেম সে প্রেমের অপর নাম—কাম, প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা।

এ স্থলে অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মানব প্রেম যখন কাম বা কামনা অর্থাৎ ইচ্ছার অধীন এবং ক্ষণভঙ্গুর, তখন লোকে জানিয়া শুনিয়া, ভুক্তভোগী হইয়াও এমন সুধাসিক্ত বস্তুর অপব্যবহার করে কেন?

হে মানব হায়! গাঁথি প্রেম-হার,
দিলাম তোমার গলে,
তুমি দুরাচার! কি বুঝিবে তার,
দলিলে চরণতলে।
তুমি হ'তে হায়! কুড়াইয়া তায়,
ধুইয়া নয়ন জলে,
ঈশ্বর চরণে, অর্পিনু যতনে,
যতনে লইয়া তু'লে।
ইতি পূর্ব্বে যার, ছিল না বাহার,
পড়িয়া তোমার করে,
এবে দেখ তায়, কিবা শোভা পায়,
প্রেমিকে অর্পণ করে।
তুমি নরাধম, প্রেমের মরম,
কেমনে জানিবে হায়।
সুধার সুতার কি জানে ছাতার,
চকোরেতে যাহা খায়।
নিঃস্বার্থ সরল প্রেমেতে গরল
অর্পণ করিয়াছিলে,
নাহি জান শেষে, আপনি সে বিষে,
জ্বালায়ে মরিবে জ্বলে।
অতএব নর মম বাক্য ধর,
প্রেমিকে অর্পহ প্রেম,

ভ্রম অন্ধকার, থাকিবে না আর,
হইবে মঙ্গল ক্ষেম ॥

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত দীন—
শ্রীশিশিরকুমার বক্সী।

# শ্রীহরিনাম

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন ॥

নাম নামীর ভেদ নাই। আর এইরূপ অপূর্ব্ব নাম-মাহাত্ম্যের এমন পবিত্র ঘোষণা চারি শত বৎসরের পূর্ব্বে জীব শ্রবণ করে নাই। ভবরোগ মহৌষধি হরিনাম মহামন্ত্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বপ্রথমে জগদ্বাসীর সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

যেরূপ নাম নামীতে ভেদ নাই সেইপ শ্রীভগবান ও তাঁহার ভক্তেও প্রভেদ নাই। ভগবান ভক্তের ভক্তিতে অনুগত হইয়া ভক্ত-হৃদয়ে বদ্ধ থাকেন। এমন কি তিনি ভক্তের গৌরব বাড়াইয়া বলিয়াছেন—"আমার ভক্ত আমা অপেক্ষাও পূজনীয়।" নাম ও নামী যে অভেদ তাঁহার শাস্ত্রবাক্য এই,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বা নাম নামিনোঃ ॥

অর্থাৎ নাম ও নামীর ভেদ না থাকায়, চৈতন্য রসমূর্ত্তি সর্ব্ববিধ শক্তি পূর্ণ মায়া গন্ধ বর্জ্জিত, নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণি সদৃশ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥

ইহাতে বুঝা গেল নামেতে নামীর শক্তি পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই অবিরাম নাম সঙ্কীর্ত্তনের ফলে পূর্ণভাবে ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। আর তখন নামরূপ শ্রীহরি নামী রূপে ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া ধরা দিবেন। কারণ ভক্তির পরিপক্কাবস্থায় ভক্ত তখন প্রেমভরে টলমল করিতেছেন। তখন তাঁহার দৃষ্টিতে স্থাবর-জঙ্গমের সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরিত হন।

"মহা ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তার কৃষ্ণের স্ফুরণ॥"

প্রেমই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ, প্রেমই জীবের একমাত্র কাম্য। নাম হইতে ভক্তি। ভক্তি নববিধা আর এই নব বিধাভক্তি হইতে পরিপূর্ণ শান্তি—শ্রীকৃষ্ণ প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥
অনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥

শ্রীভগবান তখন সেই প্রেমিকের চিত্তক্ষেত্র আপনার প্রিয় রম্য স্থান নির্ব্বাচন করিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার নিজ মুখের ঘোষনা,—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

অর্থাৎ হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠেও বাস করি না, যোগীদের হৃদয়েও বাস করি না। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি।

সুতরাং এমন নাম চিন্তামণির আশ্রয়ে যে সকল ফল লভ্য হইবে, সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে।

একবার হরিনামে যত পাপ হরে।
জীবের সাধ্য কি যে তত পাপ করে॥

কথাটী খুবই সত্য কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বুঝিবার আছে। শাস্ত্রে যে হরিনাম মধুরাদপি মধুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আস্বাদ করিবার সময় বুঝিতে হইবে তাহা মধুর লাগিল কি তিক্ত লাগিল। যদি মধুর লাগে তবে জানিবে

তোমার সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হইয়াছে। নতুবা বুঝিতে হইবে কোনরূপ অপরাধ হেতু নামে অনুরাগ জন্মে নাই। এই নামে অনুরাগ জন্মান অতীব ভাগ্যের কথা ত বটেই অধিকন্তু বড়ই সাধনারও কথা। তাই প্রভু আটটী শ্লোক রচনা করিয়া জীবকে প্রথমে তাহাতে সিদ্ধ হইয়া—শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিতে বলিলেন, তখন নামে অনুরাগ আপনি আসিবে। নতুবা হাম বড়া ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাকে আপনি "বৈষ্ণব" বলিয়া জগতে ঘোষণা করিলে চলিবে কেন? কথাই ত আছে—

"বৈষ্ণব হইব বলি মনে ছিল সাধ।
"তৃণাদপি" শ্লোকেতে পড়ে গেল বাধ॥

এই তৃণাদপি শ্লোক যেন বৈষ্ণব ধর্ম্মের দ্বার। এই দ্বারিকে তুষ্ট করিতে পারিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার জন্মে। আর তখনই দেখিবে নামে অনুরাগ জন্মিয়াছে।

নাম হইতে তখন প্রাণে প্রেমের উৎস ছুটিবে। আর নাম জপিতে জপিতে হৃদয় যেন ভগবৎ প্রেমে অধীর হইয়া উঠিবে। এই মধুরাদপি মধুর নামে কি যে তন্ময়তা আছে তাহা দীন আমি কিরূপে বর্ণনা করিব। এখন আসুন পাঠক আমরা অমর বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করি।—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥"

দীন—
শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা

# বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা

( বঙ্গাব্দ ১৩৩২, চৈতন্যাব্দ ৪৪০—৪৪১ )

## বৈশাখ

| | |
|---|---|
| একাদশী…… | ৬ই রবিবার |
| অক্ষয়তৃতীয়া…… | ১৩ই রবিবার |
| জহ্নুসপ্তমী… | ১৭ই বৃহস্পতিবার |
| একাদশী… | ২১এ সোমবার |
| শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত… | ২৪এ বৃহস্পতিবার |
| শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোলযাত্রা… | ২৫এ শুক্রবার |

## জ্যৈষ্ঠ

| | |
|---|---|
| একাদশী… | ৪ঠা সোমবার |
| একাদশী… | ২০এ বুধবার |
| শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা… | ২৩এ শনিবার |

## আষাঢ়

| | |
|---|---|
| একাদশী… | ৩রা বুধবার |
| শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা… | ৯ই মঙ্গলবার |
| শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা… | ১৭ই বুধবার |
| শয়নৈকাদশী… | ১৮ই বৃহস্পতিবার |

( রাত্রি ২।৫৫ মিঃ গতে শ্রীহরির শয়ন, চাতুর্ম্মাস্যব্রতারম্ভ )

| | |
|---|---|
| একাদশী… | ৩২এ বৃহস্পতিবার |

## শ্রাবণ

| | |
|---|---|
| শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রারম্ভ… | ১৫ই শুক্রবার |
| একাদশী… | ১৬ই শনিবার |
| শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ… | ১৭ই রবিবার |
| শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন ও শ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা | ১৯এ মঙ্গলবার |
| শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত… | ২৭এ বুধবার |

( পরদিন প্রাতে ৭।৫৮ মিঃ মধ্যে পারণ )

ভাদ্র

| | |
|---|---|
| শ্রীরাধাষ্টমীব্রত··· | ১১ই বৃহস্পতিবার |
| পার্শ্বৈকাদশী··· | ১৪ই রবিবার |
| ( মধ্যাহ্নে শ্রীবামনদেবের অর্চ্চনা ও সন্ধ্যায় শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন ) | |
| একাদশী··· | ২৮এ রবিবার |

আশ্বিন

| | |
|---|---|
| শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব··· | ১১ই রবিবার |
| একাদশী··· | ১২ই সোমবার |
| শ্রীকৃষ্ণের শরৎরাসযাত্রা | ১৫ই বৃহস্পতিবার |
| একাদশী··· | ২৭এ মঙ্গলবার |

কার্ত্তিক

| | |
|---|---|
| অন্নকূট ও গোবর্দ্ধনযাত্রা··· | ১লা রবিবার |
| গোপাষ্টমী··· | ৮ই রবিবার |
| একাদশী··· | ১১ই বুধবার |
| ( সায়ংকালে শ্রীহরির উত্থান, চাতুর্ম্মাস্যব্রত সমাপন ) | |
| শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা··· | ১৪ই শনিবার |
| একাদশী··· | ২৬এ বৃহস্পতিবার |

অগ্রহায়ণ

| | |
|---|---|
| একাদশী··· | ১০ই বৃহস্পতিবার |
| একাদশী··· ( অরুণোদয়বিদ্ধাহেতু ) | ২৬এ শনিবার |
| ( ব্রজমণ্ডলে বিদ্ধা না হওয়ায় তথায় ২৫এ ; শুক্রবার একাদশী হইবে ) | |

পৌষ

| | |
|---|---|
| একাদশী··· ( অরুণোদয় বিদ্ধা ও পক্ষবর্দ্ধিনী ) | ১১ই শনিবার |
| শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকযাত্রা··· | ১৪ই মঙ্গলবার |
| একাদশী··· | ২৬এ রবিবার |

মাঘ

| | |
|---|---|
| বসন্তপঞ্চমী, শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন··· | ৪ঠা সোমবার |
| মাকরী-সপ্তমী ( শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব ) | ৬ই বুধবার |
| ভৈমী একাদশী··· | ১০ই রবিবার |

| | |
|---|---|
| শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব... | ১২ই মঙ্গলবার |
| একাদশী... | ২৬এ মঙ্গলবার |
| শিবরাত্রিব্রত... | ২৮এ বৃহস্পতিবার |

ফাল্গুন

| | |
|---|---|
| একাদশী, আমর্দ্দকীব্রত... | ১১ই মঙ্গলবার |
| শ্রীগৌরপূর্ণিমা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব... | ১৫ই শনিবার |
| শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, ৪৪১ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ... | ঐ |
| একাদশী... | ২৬এ বুধবার |

চৈত্র

| | |
|---|---|
| একাদশী... | ১১ই বৃহস্পতিবার |
| একাদশী... | ২৬এ শুক্রবার |

দ্রষ্টব্য :—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা যতিধর্ম্মপরায়ণা ( বিধবা ) দ্বিজপত্নীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে। কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে ১৬১নং হ্যারিসন রোড্, কলিকাতা এই ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিতে হয়।

আচার্য্যগণের মতানুসারে
শ্রীরাধাকিঙ্কর গোস্বামী
সম্পাদক "শ্রীভাগবত-ধর্ম্মমণ্ডল"

## প্রশ্ন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণার্থ যখন নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া কাটোয়া যাইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন তখন তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—

"সর্ব্বকাল তোমরা সকল মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমি সব আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সঙ্কীর্ত্তন সুখ রঙ্গে॥

এই মত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দরূপ হইব আমার॥

চৈতন্য ভাগবত—মধ্যখণ্ড—ষড়বিংশ অধ্যায়।

এদিকে শচীমাতা তাঁহার নয়নের মণি বিধবার একমাত্র সম্বল অন্ধের যষ্ঠি সোনার চাঁদ বাছার সন্ন্যাস গ্রহণের বার্ত্তা লোক পরম্পরা শ্রুত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রবোধার্থ কতকগুলি গোপ্য কথা বলিলেন—

আরো দুই জন্মে এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য মহাপ্রভুর আরও দুই অবতারের কথা অন্য কোনও শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় কি না? যদি থাকে তবে উক্ত গ্রন্থাদির নাম এবং কখন ও কোথায় তিনি পাপতাপাক্রান্ত কলির জীবের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন বা হইবেন। কোনও ভক্ত পাঠক যদি ইহার মীমাংসা এই শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত করেন তাহা হইলে আমার অদম্য কৌতূহল পিপাসা চরিতার্থ হয় এবং তদ্বারা আমার ন্যায় অধম যদি কেহ থাকেন তাঁহারও উপকার হয়।

শ্রীযদুপতি দাস।

# গান

বাহার চৌতাল

সারাটী বিশ্বে মধুর দৃশ্যে তোমারই মাধুরী হে।
এরাই আমায় মনে করে দেয়,
যখন, ভুলে যাই আমি তোমারই হে॥
হ'য়ে, বিষয়ে মগন রহি অচেতন, তব নাম নাহি স্মরি হে।
সুখের আশায় হেথায় সেথায় বৃথা সদা ঘুরে মরি হে॥
তখন তুমিই আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া আদরে করে ধরি হে।
সকলই ভুলাও পাশে টেনে লও
দাসী করে লও তোমারই হে॥
ভ্রমে ভুলে আমি ওগো হৃদিস্বামি যেতে চাই তোমা ছাড়ি হে।
আমার, ঘুচায়ে আঁধার বুঝাও প্রাণাধার
কেহ, তোমা বিনা আর নাহি হে॥

( "স্নেহলতা" )

# শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রদাস প্রসঙ্গ

আনন্দ। আরও একটু পরিষ্কার করিয়া না বলিলে হইবে না।

নবদ্বীপ। পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়—অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়—অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; পঞ্চ ভূত—অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; পঞ্চ তন্মাত্র—অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ।

আনন্দ।—হাঁ এটি বেশ বুঝা গেল।

নবদ্বীপ।—তারপর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মহৎ এই চারিটি। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা বৃত্তি বিশেষের নাম মন। নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি বিশেষের নাম বুদ্ধি। অহঙ্কার অর্থাৎ আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান। তার পর মহৎ।

আনন্দ।—মহৎটা কি?

নবদ্বীপ।—যাহা বলা যায় না বা বুঝান যায় না, কিন্তু বুঝা যায়। দেখান যায় না, কিন্তু দেখা যায়। আস্বাদন করান যায় না, কিন্তু করা যায়।

আনন্দ।—ঐ টাইত গোলযোগের কথা। যাহার কোন প্রমাণ প্রয়োগ নাই এবং যেটা কাহাকেও দেখান যায় না, বুঝান যায় না, বা বলা যায় না, সেটা বিশ্বাস করি কি করিয়া?

নবদ্বীপ।—সেটা ঠিক কথা। আচ্ছা, তুমি যখন অঘোরে নিদ্রা যাও, সে সময়ে তোমার কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়; মন বুদ্ধি প্রভৃতি কাহারই কার্য্য থাকে না; কারণ তখন তোমাকে কেহ গালাগালি দিলে বা প্রশংসা করিলে তুমি বুঝ না বা হর্ষ বিষাদাদি কোনই ক্রিয়া হয় না। এমন কি সে সময় তোমাকে ব্যাঘ্র বা সর্প আক্রমণ করিতে আসিলেও তোমার বুদ্ধি শক্তি দ্বারা তুমি আত্মরক্ষা করিতে পার না। অথচ তুমি থাক এবং তোমার জ্ঞান থাকে। এ কোন্ জ্ঞান বল দেখি?

আনন্দ।—তখন যে আমার কোনও রূপ জ্ঞান থাকে ইহার প্রমাণ কি?

নবদ্বীপ।—যদি তোমার জ্ঞান না থাকে তবে নিদ্রা ভঙ্গের পর নিদ্রা কালীন সুখ দুঃখের স্মৃতি হয় কিরূপে? অর্থাৎ তুমি নিদ্রা হইতে উঠিয়াই বলিলে—"ভাই! আজ বড়ই সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম এবং কোনই বাহ্য স্মৃতি ছিল না।" ইত্যাকার জ্ঞান ত থাকে?

আনন্দ।—এই জ্ঞানকেই কি মহৎ বলে ?

নবদ্বীপ।—না, ঠিক তাহা নয়, এ জ্ঞানকে চৈতন্য অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য পদার্থ বলে।—মহৎ শব্দের অর্থ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাই শাস্ত্রে উহাকে অব্যক্ত বলিয়াছেন। উহা কেবল অনুভূতি গম্য। আমি নিতান্ত মূর্খ, আমি এ বিষয়ের কি বলিব ? তাহাতে আবার তুমি একজন শিক্ষিত লোক—বাল্যকাল হইতে পাশ্চাত্য ভাষা অভ্যাস করিয়া তাহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছ। কেবল ভাষা অভ্যাস নহে, সেই জাতীয় আচার ব্যবহার প্রভৃতি অভ্যাস ও আচরণ করিতেছ তোমাকে বুঝাইয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তবে আমার গুরুদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছি বা শ্রুত বস্তু যতটুকু ধারণা করিয়াছি, তাহা বলিলে যদি তোমার তৃপ্তি হয় বলিতে পারি।

আনন্দ।—তাহা ত বলিবে, আগে একটী কথার উত্তর দিতে হইবে। ইংরাজী বা কোনও অন্য দেশীয় ভাষা বা আচার ব্যবহারের উপর তোমরা এত ঘৃণা ভাব প্রকাশ কর কেন ?

নবদ্বীপ।—কে বলে আমরা ঘৃণা করি ? আমার কথার ভাবে যদি তোমার সেরূপ ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বোধহয় আমার নিজের মনের ভাব ভাষায় ঠিক ব্যক্ত করিতে পারি নাই। আমরা কোন ভাষা বা ভাষাকে ঘৃণা করিতে পারি না। কারণ আমার গুরুদেবের আদেশ বা শিক্ষা তাহা নহে।—কারণ তিনি বলেন একমাত্র অহঙ্কারে মোহিত নিজের নীচ প্রবৃত্ত ছাড়া এসংসারে—ঘৃণা করিবার আর কিছুই নাই। জগতে দৃশ্য অদৃশ্য যাবতীয় পদার্থই ভগবৎ প্রকাশ। আমরা যদি কাহাকেও ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করি তবে আমাদের অধর্ম্ম হয়।

আনন্দ।—তবে তুমি আমাকে বা আমার আচার ব্যবহারকে এত ঘৃণা কর কেন ?

নবদ্বীপ।—তোমাকে বা তোমার আচার ব্যবহারকে যদি আমি ঘৃণাই করিব, তবে কি তোমার নিকট থেতে আসি ?

আনন্দ।—তুমি আমাকে ঘৃণা কর না ?

নবদ্বীপ।—আমার তো বিশ্বাস তাই; অন্ততঃ ঘৃণা না করিবার সাধ্য মত চেষ্টা করি।

আনন্দ।—তোমার কথায় অনেক সময় পাশ্চাত্য ভাষা বা আচার ব্যবহারের প্রতি একটা কটাক্ষ আছে বলিয়া বোধ হয়।

নবদ্বীপ।—কখনই নয়। তবে যে কথাটা কটাক্ষ বলিয়া তুমি ধরিয়াছ, সেটা কেবল স্বধর্ম্ম ত্যাগের প্রতি অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বান্তর্য্যামী মঙ্গলময় ভগবান্ যে স্থানে যে কালে যেই অবস্থায় যাহাকে জন্ম দিয়াছেন, তদুচিত আচরণ, ধর্ম্ম বা কার্য্য কলাপ পরিত্যাগ করা কখনই মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। আমরা নিজ নিজ বিদ্যা বুদ্ধির অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিজেদের মন গড়া একটা উন্নতি কল্পনা করতঃ অপরের আচার ব্যবহার বা ধর্ম্মের যে অনুকরণ করিতে যাই সেইটী কি কখনও হিতকারী হইতে পারে? সেই কথাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন্—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্ম ভয়াবহঃ॥

আনন্দ।—তুমি কি বলিতে চাও ইংরাজী শিক্ষা বা পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সারবত্তা নাই?

নবদ্বীপ।—কে এরূপ কথা বলিল? এমন কোন ধর্ম্ম বা ব্যবহার হইতে পারে না, যাহার সারবত্তা নাই। তবে কি জান, দেশ কাল পাত্রানুসারে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা দরকার। বাতের রোগীকে কুইনাইন খাওয়াইলে চলিবে কেন?—স্বধর্ম্ম ত্যাগ বা ত্যাগের উপদেশ সম্পূর্ণ ভ্রমজনক।

আনন্দ।—স্বধর্ম্মে যদি কোনরূপ ভ্রম থাকে, তবুও সেই ভ্রম কি আচরণ করিতে হইবে? পিতা পিতামহাদি হয় ত সংস্কার বা অজ্ঞানতা বশতঃ কোনও কার্য্য আচরণ করিয়া গিয়াছেন, আমি যদি সেইটী না করি তাহা হইলেই কি আমার স্বধর্ম্ম ত্যাগ হইল।

নবদ্বীপ।—প্রথম দেখিতে হইবে সেই যে আচরণ সেটী আধুনিক না প্রাচীন। যদি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের আদিষ্ট পন্থা হয় তবে নিশ্চয়ই সে পথ অভ্রান্ত; আমি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বা ক্ষুদ্র জ্ঞানে সে বস্তু ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই আমার ভ্রম মনে হয়। কারণ পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক নিজেরা আচরণ করিয়া তাহার দোষ গুণ অনুভব করতঃ তবে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি সামান্য জ্ঞানে তাঁহাদিগের আশয় কি বুঝিব? এই ভগবানকে নিবেদন করিয়া আহার করার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বুঝিবার পূর্ব্বে আমাদের আহার করার উদ্দেশ্যকে বুঝা দরকার। আচ্ছা তুমিই বল দেখি, আমরা আহার করি কেন?

আনন্দ।—আহার করি দেহেরপুষ্টি সাধনের জন্য।

নবদ্বীপ।—শুধু কি দেহেরই পুষ্টি সাধন? সঙ্গে সঙ্গে মন বা আধ্যাত্মিক শক্তির নয় কি?

আনন্দ।—আহারের সঙ্গে মনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি না আমি বুঝিতে পারি না।

নবদ্বীপ।—কেন ভাই, একটু চিন্তা করিয়া দেখ দেখি! আহারের সহিত মনের কত নিকট সম্বন্ধ!! একদিন যদি তুমি ঠিক সময়ে আহার করিতে না পাও তোমার মন কতদূর চঞ্চল হয়; আবার আহার করিবামাত্র মনটী কেমন শান্ত ভাব ধারণ করে? এই তৃপ্তি অনুভব কে করে?

আনন্দ।—ঠিক কথা, দেহের সহিত মনের বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বটে; কারণ আমাদের দেহের কোনও রূপ বৈপরীত্য ঘটিলে মনের স্থিরতা রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

নবদ্বীপ।—তাহাহইলে বুঝা গেল, আহার দ্বারা যেমন দেহের পুষ্টি সাধন হয় তেমনি মনেরও হইয়া থাকে।

আনন্দ।—তা হইলই বা, তহাতে ভগবানকে নিবেদনের কি হইল?

নবদ্বীপ।—আচ্ছা, এই দেহ ও মনের পুষ্টি বলিলে আমরা কি বুঝিব?

আনন্দ।—দেহের পুষ্টি বলিলে দেহ সবল, সুস্থ ও নীরোগ বুঝায়, আর মনের পুষ্টি বলিলে,—মনের শান্ত অবস্থাকে বুঝায়।

নবদ্বীপ।—মনের শান্ত অবস্থা কাহাকে বলে?

আনন্দ।—শান্ত অবস্থা অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির তাড়না বিহীন নির্ব্বিকার অবস্থা।

নবদ্বীপ।—অন্য উদ্দেশ্য যাহা আছে তাহা তোমার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে বুঝান আমার মত লোকের পক্ষে সহজ নহে। আর বুঝাইলেও তুমি বিশ্বাস করিবে কি?

আনন্দ।—সঙ্গত কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না?

নবদ্বীপ।—মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি বল দেখি?

আনন্দ।—খাওয়া দাওয়া, মৌজ করা অর্থাৎ আহার বিহারাদি।

নবদ্বীপ।—আহার বিহার ছাড়া মানব জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই কি?

আনন্দ।—আর কি থাকিবে?

নবদ্বীপ।—তাহা হইলে মনুষ্য জীবনে ও পশুতে পার্থক্য কি?

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট।

# ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

[ ২৩শ বর্ষ, আষাঢ় ১৩৩২, ১১শ সংখ্যা ]

## প্রার্থনা

হে বিপদবারণ মধুসূদন! এক একবার মনে হয় সর্ব্বদাই তোমাকে ভাবি, সর্ব্বদাই তোমাকে ডাকি, সর্ব্বদাই তোমার মধুময় ভাবে বিভোর থাকি কিন্তু জানি না অনন্ত-লীলা-বিলাসী তোমার কি ইচ্ছা, মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। হৃদয়ে অলক্ষিত ভাবে কতরকম বাধা বিঘ্ন যে লুকাইয়া আছে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। যেমন তোমাকে ভাবিব মনে করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, অমনি তাহারা নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। নানাবিধ চিন্তা আসিয়া যেমন অন্তরে অন্তরে বিক্ষেপ জন্মায় সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক ব্যাপার আসিয়াও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে অতিশয় চঞ্চল করিয়া দেয়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এখন আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, তোমার কৃপাভিন্ন আমার নিজ শক্তিতে সাধন ভজন বা তোমার স্মরণ মনন কিছুই হইবে না। তাই প্রার্থনা নদীর বেগ যেমন নানাবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, কাহারও নিন্দা বা স্তুতির অপেক্ষা রাখে না, হে দয়াময়! তুমি কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া আমার হৃদয়ের বেগ সর্ব্বদা সেইরূপ তোমার প্রতি রাখ, যতই বাধাবিঘ্ন আসুক না কেন যেন সাধন ভজনের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত না হয়। আমি অতিশয় দুর্ব্বল, তোমার কৃপাশক্তি না পাইলে কিছুতেই তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিব না। শক্তি দাও, আমি তোমার বলে বলীয়ান্ হইয়া তোমার ভাবের, তোমার মহিমার, তোমার অচিন্ত্য প্রভাবের বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া তোমাকেই একমাত্র আশ্রয় বুঝিয়া তোমার ভাব লাভে ধন্য হই। দয়াময় দীনহীন কাঙ্গালকে দয়া কর।

# অভাগা

এ জগতে কোলে নিতে কেহতো আমার নাই,
সকলে চরণে দলে সবে করে দূর ছাই।
মরমে অনন্ত জ্বালা ল'য়ে বুক ভরা ব্যথা,
কার কাছে যাব নাথ! কেহতো কহে না কথা।
পৃথিবীর এক কোণে এ অভাগা পড়ে আছে.
সুধাবার কেহ নাই কেহতো আসে না কাছে।
আকুল পরাণ ল'য়ে সকলের মুখ চাই,
কেহতো আমার পানে ফিরেও চাহিতে নাই।
লুটায়ে যাহার আমি পড়ি চরণের তলে,
উপহাসি সেই পুন চলে' যায় পায়ে দলে'।
কেহতো আসে না কাছে জ্বালিতে আশার আলো,
আজনম দুঃখী বলে' কেহতো বাসে না ভালো।
কেহতো সান্ত্বনা বুলি বলে নাকো একবার,
মুছাতে আসে না প্রভু! এ দীনের আঁখিধার।
সকলে ত্যজেছে মোরে কেহতো আমার নয়,
তুমিও অভাগা দেখে ত্যজিবে কি দয়াময়?
ছোট বড় তব কাছে পায়গো সমান স্নেহ,
দিবে না কি কোল প্রভু! জুড়াতে তাপিত দেহ?
লও যদি লও নাথ! ত্বরা ও প্রশান্ত কোলে,
জগৎ জুড়াবে ওগো! এ চির অভাগা ম'লে॥

শ্রীশিশিরকুমার বড়ুয়া।

## "বারাণসী ধামে শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অন্বেষণ।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত তাঁহার মাণিকতলার বাসায় বসিয়া নানা বিষয়ের আলাপ

করিতেছিলাম। তখন তিনি "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, মহাপ্রভু বারাণসী ধামে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া, যাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে দেখিতে পাই, সেই প্রকাশানন্দ সম্বন্ধে কাশীতে আমরা কোন নিদর্শনই পাই নাই। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্বেষণ করিয়াও, প্রকাশানন্দের কোন তত্ত্ব, এমন কি ঐ নামে কোন সন্ন্যাসী যে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। কথাটা শুনিয়া অবধি মনটা কেমন ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে একবার তীর্থ ভ্রমণের পথে কাশীতে গিয়াছিলাম। তখন মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় কোন কথাই আমার জ্ঞাত ছিল না। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থই বোধহয় তখন পাঠ করি নাই সুতরাং তথায় মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অন্বেষণের স্পৃহাও জাগে নাই। ভবিষ্যতে আর কখনও কাশীধামে গিয়া এ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করিতে পারিব কি না তাহাও শ্রীগৌর ভগবানই জানেন।

গত ১৩২৩ আশ্বিন সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দত্ত উপর্য্যুক্ত প্রবন্ধটীর অবতারণা করিয়া আমাদের ঈপ্সিত তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন দেখিলাম, উক্ত প্রবন্ধের সারাংশ এই স্থানে সংগৃহীত হইল।

অনুমান ইংরাজী ১৫১৫ বা ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে চৈতন্যদেব কাশীধামে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময়ই বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানে চৈতন্যদেব বৈদ্য-জাতীয় চন্দ্রশেখর নামক কোন বাঙ্গালীর বাসায় থাকিতেন এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর পিতা তপন মিশ্র নামক একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ অর্থাৎ ভোজন করিতেন। গ্রন্থ দেখিয়া এইরূপ বুঝিতে পারিতেছি। সে আজ প্রায় ৪০০ বৎসরের পুরাতন ঘটনা (১) সুতরাং দুই এক দিনে বাহির করা দুঃসাধ্য, ইহাদের ঠিকানা বাহির করিতেও কিছুদিন সময় লাগিবে।

"পুরীধামে চৈতন্যদেব বহু কাল ছিলেন, তাই জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার চরণ চিহ্ন আছে। শ্বেত গঙ্গার দক্ষিণে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বাটীতে ষড়্ভুজ মহাপ্রভুর চিত্রপট দেখিয়াছি, কাশীমিশ্রের বাটীতে প্রভুর ব্যবহৃত কন্থা, করঙ্গ ও কাষ্ঠ পাদুকা রক্ষিত আছে। টোটা-গোপীনাথের

(১) চরিতামৃত, আদি লীলা ৭ম পরিচ্ছেদ ও মধ্য লীলা ২৫শ পরিচ্ছেদ দেখুন।

অঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের তিরোধানের চিহ্ন স্বরূপ স্বর্ণরেখা আজিও বিদ্যমান আছে। জগন্নাথ বল্লভ বাগানে, ঠাকুর হরিদাসের সিদ্ধ বকুল মঠেও কিছু কিছু চিহ্ন আছে। সে সব দেখিয়া আসিয়াছি। শৈব ও শাক্ত প্রধান কাশীধামে, বৈষ্ণবদের কিছু পাইব কি? কাশীতেতো কেবল শিবলিঙ্গেরই ছড়াছড়ি। বিন্দু-মাধব ব্যতীত অপর কোন বৈষ্ণব বিগ্রহ এখানে তখনও দেখি নাই।

শুনিলাম, সেতুয়া বাবার মঠে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন। ভাবিলাম রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি যেখানে যেখানে আছেন, সেই সকল স্থানগুলিতে গিয়া অনুসন্ধান করিব, কোনও না কোন তথ্য মিলিতেও পারে। তাই পরদিন প্রাতে বেড়াইতে গিয়া সেতুয়া বাবার মঠে ও বিন্দু-মাধবের মন্দিরে সন্ধান আনিতে গেলাম, কিন্তু কিছুই পাইলাম না।

বৈকালে গোপালজীর মন্দিরের নাম শুনিয়া সেখানে সন্ধান করিতে গেলাম। এ মন্দিরটী গুজরাট দেশীয় ধনী মহাজনদিগের ঠাকুর-বাটী। তথা গোপালজী, মুকুন্দজী ও শ্রীনাথজী নামে তিনটী কৃষ্ণমূর্ত্তি আছেন। অতি সমারোহের সহিত পূজার্চ্চনা হয়। সোণারূপার ছড়াছড়ি নানা কারুকার্য্যেরও অভাব নাই। আরতির সময়ে দর্শকের বড় ভীড় হয়। শুনিলাম, ঠাকুরদের প্রসাদ বাকি বিক্রয় হইয়া থাকে। এটি হিন্দুস্থানীদিগের ঠাকুর বাটী। তাঁহারা চৈতন্যদেবের কোন খবরই রাখেন না। ক্ষুণ্ণমনে বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন গোপাষ্টমী, কাশীর পিঞ্জরাপোল বা গোশালা দেখিতে গেলাম। গাভী ও বৎসগণকে সজ্জিত ও রঞ্জিত করিয়া সেদিন উৎসব হইতেছিল, তথাকার অধ্যক্ষকে চৈতন্যদেবের নানা নাম—গৌরাঙ্গ, নিমাই, গোরাচাঁদ, নদের চাঁদ, ও বিশ্বম্ভর প্রভৃতি শুনাইয়া ফল পাইলাম না। পরিশেষে যখন "মহাপ্রভু বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, "খতন বট মহল্লায় মহাপ্রভুর গাদী বা মঠ আছে, সেখানে গেলে কৃষ্ণমূর্ত্তিও দেখিতে পাইবেন।"

আমরা অনেক খুঁজিয়া ক্ষুদ্র একটি গলির ভিতর মহাপ্রভুর মঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীটি একতালা, ক্ষুদ্র হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দালানে রাধাবিহীন কৃষ্ণ মূর্ত্তি রহিয়াছেন, নাম মদনমোহন। পূজারী ঠাকুর কিঞ্চিৎ প্রণামী পাইয়া আমাদিগকে মহাপ্রভুর গাদী ও গম্ভীরা প্রভৃতি দেখাইলেন গাদীটিতে বেশ ধোপদস্ত শয্যা বিছান, তাকিয়ার উপর একছড়া ষোটা হরিনামের মালা রক্ষিত। গম্ভীরাটি অতি ক্ষুদ্র গৃহ। শুনিলাম, সেখানে বসিয়া মহাপ্রভু ধ্যান করিতেন। আমি পুরুষোত্তম ধামে কাশী মিশ্রের বাটীতে

তাঁহার আর একটি গম্ভীরা দেখিয়াছি। সেটিও এইরূপ গবাক্ষাদি বর্জ্জিত ক্ষুদ্র গৃহ। এখানেও গম্ভীরা দেখিয়া, চৈতন্যদেবের নিদর্শন পাইলাম বলিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলাম। পূজারী ঠাকুর অবশেষে দ্বারের উপর ঝুলান একখানি চিত্র দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখুন মহাপ্রভু ও তাঁহার পুত্রেরা রহিয়াছেন।"

আমি তো চিত্র দেখিয়া অবাক! মহাপ্রভুর দাড়ি, গোঁপ, জটা, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে চারিটি পুত্র! সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কোন মহাপ্রভু?" পূজারী বলিলেন "বল্লভাচার্য্য।" তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। কাশী, চুণার প্রভৃতি স্থানের লোকেরা বল্লভাচার্য্যকেই 'মহাপ্রভু' বলিয়া থাকেন, সুতরাং নিরাশ হইয়া পুনরায় অনুসন্ধানে বাহির হইলাম।

পথে দুইটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পরস্পর বলাবলি করিয়া যাইতেছিল, "আজ গোপাষ্টমী রাধারমণের বাটীতে সন্ধ্যার সময় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইবে, শুনিতে যাইব।

আমি জানিতাম রাধারমণ বৃন্দাবনের ঠাকুর। এখানে রাধারমণের নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সিদ্ধ মাতা মহল্লায় রাধারমণের মন্দির আছে। সন্ধান করিয়া সেই ঠাকুর বাটীতে গেলাম; সেখানকার পূজারী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র এবং প্রকাশানন্দের বাটী এখানে কোথায় ছিল, অথবা আজিও বিদ্যমান আছে কি না?" পূজারীরা একবাক্যে বলিলেন, তাঁহারা এ সকল নাম কখনও শুনেন নাই, বাটী জানা ত দূরের কথা।

পুনরায় নিরাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় একজন গৈরিক বসন ধারী দীর্ঘাকার সৌম্যমূর্ত্তি গৌরকান্তি পুরুষ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন, এবং আমাদিগকে ডাকিয়া উপরকার গৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলাম, কক্ষটি বেশ প্রশস্ত, বিস্তৃত শতরঞ্জের উপর বসিয়া ১০।১৫ জন যুবা, বৃদ্ধলোক—কেহ বেদান্ত, কেহ পাতঞ্জল, কেহ পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেছেন। আমাদের আহ্বানের কর্ত্তা জটাজুট মণ্ডিত অথচ গুম্ফ-শ্মশ্রু বিহীন সন্ন্যাসী ঠাকুরটি মধ্যে কম্বলাসনে বসিয়া উহাদিগকে নিজ নিজ পাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন। গৃহের চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে ব্রাকেট দেওয়া। তাহাতে বহু সংখ্যক মুদ্রিত পুস্তক ও বস্ত্রাবৃত পুঁথি সাজান রহিয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে বসিয়া অনেকক্ষণ আলাপ হইল, তিনি বেশ বাঙ্গালা কহিলেন; যে সকল কথাবার্ত্তা হইল তাহার মর্ম্ম এই—

"বুঝিয়াছি, আপনারা চৈতন্যদেবের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য নিয়ে অনুসন্ধান লইতেছিলেন। দুঃখের কথা বলিব কি, আমি বহুদিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও এ বিষয়ের কিছুই ঠিকানা করিয়া উঠিতে পারি নাই। এখানে "যতন বট" বলিয়া একটা মহল্লা আছে। পূর্ব্বকালে সেখানে একটি সুবৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। চৈতন্য দেব বৃন্দাবনে যেমন আম্লীতলায় বসিয়া ভক্তগণের সহিত আলাপ করিতেন, এখানেও সেইরূপ ঐ বটতলায় বসিয়া জন সাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সেই জন্য তাঁহার নামানুসারে ঐ বৃক্ষটীর নাম চৈতন্য বট হইয়াছিল। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে "চৈঠনবড়" বলে। "যতন বট" শব্দটি তাহারই অপভ্রংশ মাত্র। যবন বিপ্লবে যখন বিশ্বেশ্বর বিন্দুমাধব প্রভৃতি দেবতার সুরম্য মন্দিরগুলি ভিন্নাকার হইয়া মসজিদে পরিণত হইয়াছে, তখন প্রকাশানন্দের মঠ বা তপন মিশ্রের বাটী এই চারিশত বৎসরে কোথায় মিশিয়া গিয়াছে, তাহা জানার সম্ভাবনা কি? আর, বাঙ্গালী বৈদ্য চন্দ্রশেখর এখানে মুহুরীগিরি চাকরী করিতেন; হয় তো তিনি কোন ভাড়াটিয়া বাসায় থাকিতেন, তাঁহার ঠিকানা পাইবেন কি করিয়া? আপনারা চরিতামৃত হইতে কেবল প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা পর্য্যন্তই জানিয়াছেন। তাহার পর কি হইল তাহা হয় ত জানেন না। কাশীতেই সনাতন গোস্বামীর সহিত তাঁহার সখ্যতা হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী হয়। তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া সনাতন গোস্বামীর সহিত একত্রে মদনমোহন জীর মন্দিরে থাকিতেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মাহাত্ম্য বিষয়ক শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শেষে সিদ্ধি লাভের ( দেহত্যাগের ) পর শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে সনাতন গোস্বামীর সমাধির নিকটে তাঁহার সমাধি হইয়া ছিল। কাঞ্চিতনগর যেমন শিবকাঞ্চিত বিষ্ণুকাঞ্চিত নামে দুইটি পৃথক খণ্ডে বিভক্ত, কাশীতেও সেইরূপ অসীসঙ্গম হইতে বিন্দুমাধবের মন্দির পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভাগটা শিব কাশী এবং বিন্দুমাধবের মন্দির হইতে বরুণাসঙ্গম পর্য্যন্ত উত্তর ভাগটা বিষ্ণু কাশী, পূর্ব্বকালের লোকেরা এইরূপই মনে করিতেন। চৈতন্য দেব এই বিষ্ণুকাশী মধ্যে "যতন বটের" নিকট কোনও স্থানে থাকিতেন, ইহাই আমার অনুমান। এখন যেখানে আওরাংজেবের মসজিদ, পূর্ব্বে সেখানে বিন্দুমাধবের মন্দির ছিল। আওরাংজেব মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া মসজিদ গড়িয়া ছিলেন। তাহার পরে, মসজিদের নিকট নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া

বিন্দুমাধবকে পুনঃ স্থাপন করা হয়। নিকটেই পঞ্চগঙ্গা ঘাট। বোধ হয় যতন বটও ইহার অনতি দূরেই ছিল। চৈতন্য চরিতামৃতে আপনি দেখিতে পাইবেন, যতন বটের সন্নিহিত পঞ্চগঙ্গা ঘাটে শ্রীচৈতন্য দেব স্নান করিতেন। এতদ্ভিন্ন আমি আর কিছু বলিতে পারি না।"

পরদিন প্রাতে যতন বটের সন্ধানে গিয়া দেখিলাম একটি ছোট বেদীর উপর দুইটি নিমগাছ আছে। স্থানীয় বৃদ্ধ লোকেরা আমাদিগকে বলিল যে, পূর্ব্বে সেই বেদীর উপর অতি পুরাতন একটি বটবৃক্ষ ছিল, তাহা ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ঝড়ে বিনষ্ট হইয়াছে। এখন যে দুইটি নিম গাছ আছে সে দুইটি ২০।২৫ বৎসরের অধিক পুরাতন বলিয়া বোধ হইল না।

"ইহাই আমার চৈতন্যদেবের পদাঙ্ক অন্বেষণের বিফল প্রযত্ন। তাহার পর আর আমি কাশী যাই নাই। শুনিয়াছি আজ কাল যতন বট মহল্লায় নাকি চৈতন্যদেবের একটি মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। সেটি আমি চক্ষে দেখি নাই।"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাদের বাঙালীর ঘরের ঠাকুর। তাঁহার জন্মস্থান নবদ্বীপ তাঁহার চিহ্ন একপ্রকার কিছুই নাই বলিলেই হয়। গোস্বামী প্রভুরা বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পিতৃবংশ পরিচয়টাও ঠিক মত দিতে পারেন না। এই যে প্রভু কাশীতে এতদিন রহিলেন। সনাতনকে শিক্ষা দিলেন এবং প্রকাশানন্দকে আত্মসাৎ করিলেন কিন্তু আজ তথায় তাঁহার কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তগণের এ সম্বন্ধে চেষ্টিত হওয়া উচিত নহে কি ?

উপযোগী বোধে এ স্থানে অপর একটি বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। হুগলী জেলায় বৈদ্যবাটীতে গঙ্গার উপর "নিমাই তীর্থ" ঘাটটীর উৎপত্তি বিবরণ কি ? শুনিয়াছি শ্রীগৌরাঙ্গদেব কোনও সময়ে তীর্থ ভ্রমণের পথে একবার এই স্থানে পদার্পণ করিয়া একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন। তদবধি এই স্থান তীর্থরূপে পরিগণিত। প্রভু কোন সময়ে কোথায় গমন করিবার পথে এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন আশা করি শ্রীপত্রিকায় তাহা অচিরে আলোচিত হইতে দেখিব। আজ এই পর্য্যন্ত।

বৈষ্ণব দাসানুদাস

ডাঃ—শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

# ঘনশ্যাম-নরহরি কৃত ভক্তিরত্নাকর।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থ সমূহ যদি স্তরে স্তরে বিভক্ত করিতে হয়, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী তদীয় ভক্ত বিরচিত গ্রন্থ সমূহকে আদি স্তরের এবং শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতির অব্যবহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থ সমূহকে দ্বিতীয় স্তরের এবং তৎ পরবর্ত্তী অর্থাৎ ইংরেজ আমলে রচিত গ্রন্থকে তৃতীয় স্তরের বলা যাইতে পারে।

প্রথম স্তরের বাঙ্গালা গ্রন্থ মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, লোচন দাস ও জয়ানন্দ কৃত দুই খানা চৈতন্য মঙ্গল, অদ্বৈত প্রকাশ প্রভৃতি প্রধান।

দ্বিতীয় স্তরের প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ, প্রেমবিলাস; তদ্ব্যতীত কর্ণানন্দ, অনুরাগবল্লী, জগদীশচরিত্র বিজয়, সুবল মঙ্গল, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি বহু গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব সমাজে এ সকল গ্রন্থই আদরনীয় ও প্রমাণ্য। কিন্তু প্রামান্য হইলেও অল্লাধিক রূপে প্রত্যেক গ্রন্থেই কোন না কোন লীলা যে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাবে চিত্রিত হয় নাই, তাহা নহে; লীলার বিভিন্নতা বা ঘটনার অভিনবত্ব প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু না কিছু আছে; অন্যথায় একই গ্রন্থে যদি বর্ণীত সমস্ত লীলার সমাবেশ সম্ভব হইত, তবে বিষয়াভাবে অন্যের আর লেখনী ধারণের আবশ্যকতাই থাকিত না। কিন্তু যখন একই লীলা দুই গ্রন্থকারের গ্রন্থে ঠিক বিপরীত ও বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তখনি বিচার ও মীমাংসার প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং সে মীমাংসা, কিম্বা সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গ্রন্থান্তরেরই সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়।

ঘনশ্যাম—নামান্তর নরহরি কৃত ভক্তি-রত্নাকরের নাম ও প্রভাব বৈষ্ণব সমাজে খুব প্রবল। অনেকেই ইহা প্রামান্য গ্রন্থ মধ্যে গণ্য করেন। এমন কি শ্রীবৃন্দাবনের ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব-বৃন্দ মধ্যেও ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ হওয়ার কথা অবগত আছি। এই গ্রন্থখানি দ্বিতীয় স্তরের হইলেও, শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যতীত অন্য যে কোন বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে অল্প মাত্র নহে। বৈষ্ণব সমাজে ইহার তাদৃশ প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যই বুঝা যায় যে, গ্রন্থখানা বর্ণনার মাধুর্য্য, সঠিক লীলা সন্নিবেশ ও রচনা চাতুর্য্যাদি গুণেই এই

উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কেবল বয়সের প্রাচীনত্বই সর্ব্বত্র প্রধান্য প্রাপ্ত হয় না, যে পরবর্ত্তী গ্রন্থে অধিকতর সতর্কতা সহকারে সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে লক্ষিত হইবে, তাহার সম্মান আপনা হইতেই হইয়া থাকে।' বৈষ্ণব সমাজে ভক্তিরত্নাকরের এত মান ও আদরের ইহাই কারণ বলিয়া বোধ হয়। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে গ্রন্থের বয়স অপেক্ষা বর্ণনীয় ঘটনার সত্যতা ও সমীচীনতাই অধিক আদরনীয় হইয়া থাকে বলিতে হইবে।

ভক্তিরত্নাকর কার বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সূপকার ছিলেন অনেকদিন। বৃন্দাবনের বিভিন্ন লীলাস্থানের তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপেরও প্রত্যেক স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন। এ সকল বর্ণনা পাঠে যে কেবল বৈষ্ণব পাঠকই মুগ্ধ হন এমন নহে; তাহার ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট।

বিগত পৌষ সংখ্যা "ভক্তি"তে "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রদ্ধেয় ভক্তিসম্পাদক মহাশয় ঐ বিষয়ে এই অযোগ্যকে আলোচনার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাই আমার এই প্রচেষ্টা, আলোচনা মাত্রই প্রতিবাদ নহে।

প্রাগুক্ত দ্বিতীয় স্তরের সুপ্রচারিত গ্রন্থ প্রেমবিলাসের রচনা কাল ১৫২২ শকাব্দ, কর্ণানন্দ রচিত হয় ১৫২৯ শকাব্দে; গ্রন্থ দুইখানি যথাক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের ১৬৭ ও ১৭৬ বৎসর পরবর্ত্তী। ভক্তিরত্নাকর তাহারও কিছু পরে রচিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থে রচনার তারিখ নাই; কিন্তু গ্রন্থকারের পিতা প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন বলিয়া গ্রন্থে লিখিত আছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জন্ম সম্ভবতঃ ১৫৮৬ শকাব্দে অনুমিত; তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ১৭ খানা। শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাই তাঁহার শেষ গ্রন্থ; ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার তিরোভাব হয়। ইহা তিনি ১৬২৬ শকাব্দে রচনা করেন। এ তারিখটা ঐ টীকার শেষেই লিখিত আছে।

বিগত পৌষ সংখ্যা "ভক্তি"তে প্রকাশিত আলোচ্য প্রবন্ধের এক স্থানে কথিত হইয়াছে—"যদি নরহরির পিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সময়েই যে নরহরি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কখনই সম্ভব পর নহে।" লেখক মহাশয়ের এ কথাটিতে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে, তাহার কারণ সময় নিরূপণে বংশাবলী-ক্রমের ন্যায় শিষ্য-প্রণালী-ক্রম গ্রাহ্য নহে। বংশাবলী

ক্রমে সচরাচর তিন পুরুষে শতাব্দী ধরা হয়, শিষ্য প্রণালী অনুসারে কিন্তু তাহা হয় না। একই গুরুর কাছে পিতা ও পুত্র দীক্ষিত, এমন উদাহরণ বহুল দৃষ্ট হয়, পৌত্রও ঐ একই গুরুর শিষ্য হইতে পারিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে। এরূপ স্থানে শিষ্য-প্রণালী ক্রম সময় নির্দ্ধারণের উপযোগী বলিয়া গণ্য হয় না। (একটি উদাহরণ কল্পিত হউক:—শ্যাম রামের অল্প বয়স্ক কৌলিক গুরু-পুত্র। রাম দেশে ছিল না বলিয়া দীর্ঘকাল অদীক্ষিত ছিল, দেশে আসিয়া বৃদ্ধকালেও সে অল্প বয়স্ক গুরুপুত্রের কাছে দীক্ষিত হইতে পারে, এবং তাঁহার পুত্র বা পৌত্রও ঐ একই গুরুর শিষ্য হইতে পারে। কাজেই সময় নিরূপণে শিষ্য-প্রণালী-ক্রমের মূল্য নাই—বংশাবলী ক্রমের মত। শিষ্য-প্রণালী ক্রমের দ্বারা সময়ের মোটামোটি কতকটা সান্নিধ্যতা বুঝা যায় বটে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী হইতে ভক্তি-রত্নাকর রচয়িতার পিতা মন্ত্রগ্রহণ করেন, ইহারই "২০।২২ বৎসর" পরে যে গ্রন্থকারের জন্ম হইয়াছিল, এই অনুমান নির্ভর যোগ্য নহে। যখন নরহরির পিতা দীক্ষিত হন, তখন বা তাহার অব্যবহিত পরেই নরহরির জন্ম "সম্ভব পর" এ কথা কেহ বলিলে তাহা খণ্ডন করিবার কি প্রবল যুক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে? নরহরির পিতা যে অল্প বয়সেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এমন কথা অনুমান করিবার কোন হেতু নাই। কাজেই "ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের জন্মকাল" নির্দ্ধারণে আলোচ্য প্রবন্ধের যুক্তি গুলি তাদৃশ দৃঢ় নহে।

ভক্তিরত্নাকরের আধুনিকত্ব প্রতিপাদক ঐ প্রবন্ধের একটী প্রবল যুক্তি এই—"অধিক কথা কি? শ্রীদেবকীনন্দন দাস কৃত শ্রীবৈষ্ণব বন্দনার কথা যখন ঐ গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, তখন ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি দাস যে অধিক দিনের লোক নহেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।"

কিরূপে?—আগে যুক্তিটির সারবত্তা কতদূর, দেখা যাক।

দেবকী নন্দন বৈষ্ণব বন্দনায় নিজ গুরুর বিষয়ে লিখিয়াছেন:—

"ইষ্টদেব বন্দো শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তার গুণ অনুপাম॥
সর্ব্ব গুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে॥
সপ্তম বৎসরে যার কৃষ্ণের উন্মাদ।
ভুবন মোহন নৃত্য শকতি অগাধ॥

গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া॥
গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ॥
যাঁর অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক সর্ব্বজ্ঞাতা যাঁর শিশুকালে॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কানে।
পদ্ম গন্ধ হেন তাহ' সবা বিদ্যমানে॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল।
মূর্ত্তিমন্ত প্রেমময় যাঁর কলেবর॥"

ইনি যে সদাশিব কবিরাজের পুত্র প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। দেবকী নন্দন বলিতেছেন—

"সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণের উন্মাদ।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ইহাঁর সম্বন্ধে বলেন :—

"আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য লীলা করে কৃষ্ণ সনে॥"

দেবকী নন্দনের গুরু এই পার্ষদ ভক্ত পুরুষোত্তমের সহিত আরও তিনজন প্রধান পার্ষদের সংস্রব দৃষ্ট হইতেছে। ইহাঁদের নাম গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়া, গদাধর দাস ও গোবিন্দ ঘোষ। এই তিন প্রধান ও প্রসিদ্ধ পার্ষদের কথা না বলিলেও চলে, শ্রীচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদিতে ইহাঁদের নাম গুণ কীর্ত্তিত আছে। কাজেই এই পার্ষদত্রয় সংসৃষ্ট ও স্বয়ং পার্ষদ পুরুষোত্তম শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দের সমকালবর্ত্তী অর্থাৎ সেই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। দেবকী নন্দন ইহাঁরই শিষ্য যখন, তখন তাঁহাকে কিরূপে "অধিক দিনের লোক নহেন" বলিব? দেবকী নন্দনের গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-শাখা-ভুক্ত পার্ষদ ভক্তবর্গের বন্দনাই দৃষ্ট হয়। কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ প্রভৃতির বন্দনা নাই, গ্রন্থকার পরবর্ত্তী হইলে ইহাঁদেরও বন্দনা নিশ্চিত থাকিত; বৈষ্ণবগণ এই তিন জনকে তিন প্রভুর অবতার বলিয়াই মান্য করেন। আবার বৃন্দাবন দাসের বন্দনায় তৎকৃত গ্রন্থের "চৈতন্য ভাগবত" এই নাম লিখিত হয় নাই—চৈতন্য মঙ্গল "গীত" বলিয়াই লিখিত হওয়ায়, "বৈষ্ণব বন্দনা" গ্রন্থের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়; চৈতন্য-

ভাগবতের পূর্ব্বনাম চৈতন্য মঙ্গল। প্রেমবিলাস গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, বৃন্দাবনে এই গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "চৈতন্য ভাগবত" নাম হয়। ঐ গ্রন্থের, চরিতামৃতে "চৈতন্যমঙ্গল" নামই আছে। ইহাতে অন্ততঃ এ কথা জোর করিয়া বলা যাইবে যে ১৫২২ শকের পূর্ব্বে বৈষ্ণব বন্দনা রচিত। কাজেই ভক্তি-রত্নাকরে বৈষ্ণব বন্দনার নাম থাকায়, তাহার আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয় না।

অনুরাগবল্লী নামক গ্রন্থ মনোহর দাস কর্ত্তৃক ১৬১৮ শকে প্রণীত হয়, ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"শ্রীনিত্যানন্দ প্রিয় পুরুষোত্তম মহাশয়।
দেবকী নন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়॥
তিহোঁ যে করিল বড় বৈষ্ণব বন্দন॥"

এই বাক্যে সাহস করিয়া যে কেহ বলিতে পারে যে "বৈষ্ণব-বন্দনা" গ্রন্থ প্রাচীন—আধুনিক নহে, এবং উহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদের শিষ্য দেবকী নন্দন কৃত মান্য গ্রন্থ। ভক্তিরত্নাকরে এই গ্রন্থের নাম থাকায় ভক্তিরত্নাকর যে অধিক দিনের নহে তাহা বুঝা যায় না।

ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থও যে নিতান্ত আধুনিক নহে—প্রবন্ধ লেখকের নিরূপিত ১৫০ বৎসরের উপরে যে ইহার বয়স তাহা অন্য প্রকারেও প্রমাণ করা যাইতে পারে।

শ্রীনিবাসাচার্য্যের পৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন গোকুলানন্দ সেন। ইনিই পদকল্পতরু গ্রন্থের সঙ্কলিতা বৈষ্ণব দাস। নবাব জাফর খাঁর মোহরাঙ্কিত একখানা প্রাচীন দলিলের * লিখিত বিবরণ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ১৬৪০ শকাব্দে স্বকীয়া ও পরকীয়া বাদ লইয়া যে প্রসিদ্ধ বিচার হয়, তাহাতে শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর ও গোকুলানন্দ সেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি একজন বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি না হইলে উক্ত বিচার সভায় উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না। বর্ত্তমানে ১৮৪৭ শকাব্দ চলিতেছে, ইহা হইতে ১৬৪০ শকাব্দ বাদ দিলে ২০৭ বৎসর প্রাপ্ত হই, ঐ শকেই পূর্ব্বোক্ত পরকীয়া ও স্বকীয়ার বিচার হয়। তখন বৈষ্ণবদাস সম্ভ্রান্ত প্রাজ্ঞ বৈষ্ণব। ঐ সময় 'পদকল্পতরু' সঙ্কলিত হইয়া তাঁহার গৌরব প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়া থাকিবে। পদকল্পতরুতে ঘনশ্যাম ও নরহরি এই উভয় ভণিতা যুক্ত পদ আছে। ভক্তি রত্নাকরেও এই উভয় নামের বহু পদ রহিয়াছে। শ্রীখণ্ডের

* ১৩০৪ সালের ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য পরিষদ পত্রে উহা প্রকাশিত হয়।

সরকার ঠাকুরের কৃত পদ হইতে ইহাঁর বিশিষ্ট লক্ষণান্বিত পদগুলি সহজেই বাঁছিয়া বাহির করা যায়।

অতএব ২০৭ বৎসরের পূর্ব্বকার বৈষ্ণবদাস হইতেও পূর্ব্ববর্ত্তী ঘনশ্যাম-নরহরি কৃত "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থ আধুনিক নহে,—ইহার বয়স অন্ততঃ ২০৭ বর্ষের কম বলা সঙ্গত হয় না।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র নারায়ণ মৈত্রের স্বর্গীয় পিতা "শ্রীনরহরি জীবনী" লিখিয়াছেন তিনি পণ্ডিত লোক এবং পণ্ডিতের চরিত্র লিখিয়াছেন। পণ্ডিতে পণ্ডিতে সৌহৃদ্য থাকা সম্ভব। এ সব অবান্তর বিষয়ে কিছু না বলাই ভাল।

শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের "শত বৎসর" পরের নহেন এবং তাঁহার দেশে আসার ও খেতুরীর প্রসিদ্ধ বিগ্রহ-স্থাপনোৎসবের সময়ও নিতান্ত আধুনিক নহে; ঐ উৎসবে শ্রীপতি, শ্রীনিধি এবং আরও বহু সংখ্যক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ, শ্রীনিতাই ও অদ্বৈত পার্ষদের উপস্থিতি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়; ঐ উৎসব ১৫০৫ শকাব্দের ঘটনা, ইহা প্রমাণিত। (অঙ্কের হিসাব দিয়া প্রবন্ধ কলেবর বৃদ্ধি ও পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করা অনাবশ্যক।) ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ সময়েরই বৈষ্ণব সমাজের অবস্থা বর্ণিত, ঐ গ্রন্থগুলি আধুনিক সুতরাং অগ্রাহ্য মনে করিয়া যদি কোন শক্তিমান মহাপুরুষ ঐ গ্রন্থগুলিকে চিরতরে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিবার ব্যবস্থা করেন, তবে কি হইবে? মধ্য যুগের বৈষ্ণব সমাজের অবস্থা জ্ঞান বিষয়ে বৈষ্ণব সমাজ অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবে মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে কি প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটিয়াছিল, অত আর জানা জানির আবশ্যকতা অস্বীকৃত হইলে বরং ঐ গুলি পাঠের ব্যবস্থা না করাই ভাল। তথাপি মহাজন-বর মহাত্মাদের বিরচিত গ্রন্থের উপর অযথা দোষারোপ করা উচিত নয়।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

# বাল্য-নৃত্য।

সোণার গৌর নাচে আমার শচীর আঙ্গিনায়।
(তার) সোণার নূপুর রুণু ঝুনু বাজে রাঙ্গা পায়॥
আকাশ হ'তে চাঁদ নেমেছে
রূপের ছটায় হৃদয় নাচে
যতই নাচে ততই আরও হরি নাম গায়,
পাড়া পড়সী হাতে তালি দিয়ে ধেয়ে যায়।
সোণার গৌর নাচে আমার শচীর আঙ্গিনায়॥
শচীমায়ের নয়ন তারা
বুকভরা ধন দুখ পাসরা
কোলে নিয়ে স্নেহ ভরে শত চুমো খায়,
ক্ষীর সর নবনী দিয়ে মুখের পানে চায়।
সোণার গৌর নাচে আমার শচীর আঙ্গিনায়॥
চাঁচর কেশে বেশর রাজে
কটীতে কিঙ্কিনী সাজে
দিগম্বর নিমাই আমার যখন নেচে যায়,
রুধির ধারা যেন ঝরে কোমল রাঙ্গা পায়।
সোণার গৌর নাচে আমার শচীর আঙ্গিনায়॥
নাচে আবার ভূমে পড়ে
মায়ের কোলে কখন চড়ে
সোণার অঙ্গ ধুলায় মলিন অশ্রু বেয়ে যায়,
হেমগিরিতে নিঝর কণা যেন শোভা পায়।
সোণার গৌর নাচে আমার শচীর আঙ্গিনায়॥
ভুবনভুলা নাচের ঘটা
মদন জিনি রূপের ছটা
বালক ভাবে গোরা আমার কীর্ত্তন করায়,
যখন কাঁদে নারীরা সব হরি হরি গায়।
সোণার গৌর নাচে আমার শচীর আঙ্গিনায়॥

দীন—শ্রীযদুপতি দাস।

# করযোড়ে নিবেদন।

"বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী" প্রকাশিত হইলেন। এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক ভাবে বৈষ্ণব জগতের গত সহস্র বৎসরের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। এই সঙ্কলন ও মুদ্রণকালে নানাস্থান হইতে এত অধিক পরিমাণ কৃপা পত্র আসিয়াছে যে, সকলগুলির স্বতন্ত্র উত্তর দেওয়া সাধ্যায়ত্ত না হওয়ায় শ্রীপত্রিকাগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

চারি বৎসরের পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলেন বটে, কিন্তু ইহাতেও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। গ্রন্থখানিকে সর্ব্বপ্রকারে পরিপূর্ণ করিবার জন্য কে যেন আমাকে সর্ব্বদাই ইঙ্গিতে আদেশ করিতেছেন। প্রভু আমার এ বিড়ম্বনা কেন করিলেন জানি না; সরকারী কার্য্যের গুরুভারে মাথা তুলিবার অবসর নাই, অসৎসঙ্গে চিত্ত সর্ব্বদাই মলিন—ইহার মধ্যদিয়া কে যেন সর্ব্বদাই কেশাকর্ষণ করিতেছেন। এই মহাসঙ্কটে শ্রীবৈষ্ণবের কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা! বৈষ্ণব মণ্ডলের বিশেষতঃ শ্রীশ্রী-মহাপ্রভুর পার্ষদ, পরিকর ও সিদ্ধ ভক্ত বংশধরগণের শ্রীচরণপ্রান্তে আমার কাতর প্রার্থনা, এই সময় সকলে আমায় কৃপা করুন; আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জীবনী বা বৈষ্ণব ঐতিহ্য-সংক্রান্ত যে কোন উল্লেখ যোগ্য বিষয় আপনারা সংগ্রহ করিতে পারেন, কৃপা করিয়া আমার নিকট পাঠাইতে থাকুন। সকল সময় আমার নিকট হইতে উত্তর বা প্রাপ্তি স্বীকারের আশা করিবেন না। আপন আপন ধাম, পাট বা বাসস্থানের ঠিকানা, স্থান-নির্ণয়, নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে দিক্ ও দূরত্ব প্রভৃতি দিতে ভুলিবেন না, কারণ এই গ্রন্থ-সঙ্কলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌর-মণ্ডলের একখানি ভূগোল গ্রন্থ সংকলিত হইতেছে। ইহাতে প্রত্যেক জেলার মানচিত্রে শ্রীগৌড়মণ্ডলের প্রত্যেক ধাম, পাট, তীর্থ ও উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি প্রদর্শিত হইবে। পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধতন প্রাচীন শ্রীবিগ্রহদিগের ইতিবৃত্ত, গুরুকুলের শ্রীপাট সকল সুচারুরূপে সজ্জিত হইবে এক কথায় এই গ্রন্থখানি শ্রীগৌড়মণ্ডলের দর্পণ স্বরূপ করিবার সংকল্প করা হইয়াছে। ইহা একমাত্র বৈষ্ণব কৃপাসাপেক্ষ।

"বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী" গ্রন্থখানি অধিক পরিমাণে বিতরণ করিবার সংকল্প

করিয়াছিলাম। কিন্তু কি জানি কেন প্রভুর সেরূপ ইচ্ছা হইল না। আমার মহামূর্খতা ও একটী দুর্ঘটনা বশতঃ গ্রন্থখানির মুদ্রণে এত অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে যে, সামান্য ভিক্ষা ধার্য্য করিয়া ভিক্ষা লব্ধ অর্থের অপেক্ষা করিতে হইল। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ যেরূপেই হউক গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া একবার আস্বাদন করিয়া দেখুন আপনাদের বা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ইতিবৃত্ত ইহাতে কি পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে এবং কি পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই। যাহা না হইয়াছে তাহা দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য পাঠাইয়া দেন। আবশ্যক হইলে আমার ভ্রম সংশোধন করুন, আমাকে আমার কার্য্যে সাহস ও উৎসাহ দেন—এই আমার প্রার্থনা।

আমার গ্রন্থের কথা আমি আর কি বলিব, আপনারাই বিচার করিবেন। বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক শ্রীল-অমূল্যধন রায়ভট্ট সাহিত্য রত্ন, বিদ্যানিধি মহাশয় "বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"ইহার সংগ্রহ, সঙ্কলন, বিশেষতঃ কাল—নিরূপন ব্যাপারটি যে কি সুন্দর প্রণালীতে ও বিশুদ্ধ ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা যিনিই ধীর ভাবে আলোচনা করিবেন, তিনিই গ্রন্থকারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। গ্রন্থখানি বর্ত্তমান যুগের অভাব অনুসারেই লিখিত * * * এতদিন পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের, বিশেষতঃ সাহিত্যিকগণের একটী বিশেষ অভাব পূরণ হইল। প্রাচীন ভক্তগণের আবির্ভাব, তিরোভাব ও বৈষ্ণবের স্মরণীয় প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলির কাল নির্ণয় জন্য আর তাঁহাদের হতাশ হইতে হইবে না। একমাত্র এই "দিগ্‌দর্শনীই" সে পথ দেখাইয়া দিবে। * * * গ্রন্থকার মহাশয় গভীর গবেষণা দ্বারা বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের যে সমুদয় কাল নির্ণয় করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং ইহা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, অতঃপর "বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী"র মতই সর্ব্বত্র বৈধ প্রমাণ ( authority ) রূপে গৃহীত হইবে। * * * যে ভ্রমগুলি এতাবৎকাল চলিয়া আসিতেছে, অথচ কাহারও লক্ষ্য হয় নাই, গ্রন্থকার মহাশয়ের সতর্ক ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেগুলি কোন মতেই উপেক্ষিত হইতে পারে নাই। * * * শেষ কথা গ্রন্থখানি যে কেবল ভক্তগণেরই আদরণীয় হইল তাহা নহে; ইতিহাস পাঠে যাঁহারা আনন্দ বোধ করেন, তাঁহাদের নিকটও গ্রন্থখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত হইবে।" শ্রীধাম নবদ্বীপ বাসী—"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের "সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীলহরিদাস গোস্বামী প্রভু মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, তিনি বলেন—"প্রকৃত বৈষ্ণব-

ইতিহাসের অভাবে, আধুনিক বৈষ্ণব-চরিত ও ভক্তজীবনীগুলির মধ্যে যে সকল ঐতিহাসিক ভ্রম-প্রমাদ দোষ, ঘটিয়াছে, তাহা এই গ্রন্থ প্রকাশে সংশোধিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়"।

গ্রন্থের ভিক্ষা একটাকা চারি আনা মাত্র ধার্য্য করা হইয়াছে; আমার নিকট নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়। আনন্দের সংবাদ যে, ইতি মধ্যেই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্কলন আরম্ভ হইয়াছে।

**বিশেষ প্রার্থনা।**—সকল শ্রীপত্রিকাওয়ালাকে পৃথকভাবে এই নিবেদন পাঠাইবার আমার অবসর নাই। সকলে যদি কৃপা করিয়া "ভক্তি" হইতে এই নিবেদন আপন আপন শ্রীপত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশিত করেন, তবে বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে এইরূপ আশা করা যায়। আমার মনে হয় ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবা। *

শ্রীবৈষ্ণব কৃপা-প্রার্থী—
শ্রীমুরারিলাল অধিকারী।
১২ এক্ মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা

* বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী একখানি আমরাও সমালোচনার জন্ম পাইয়াছি, গ্রন্থখানির প্রত্যেকটি লাইনই অতি মূল্যবান। এরূপ গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আমাদিগের চোখে পড়ে নাই। এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা ২।১ পৃষ্ঠায় হয় না, অতি সুন্দর হইয়াছে, সকলেরই এক এক খণ্ড সংগ্রহ করা উচিত। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা ভক্তির প্রধান সমালোচক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় বলিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত মুরারি বাবুও তাহা উপরের প্রবন্ধ মধ্যে লিখিয়াছেন, এতদতিরিক্ত আমাদের বলিবার কিছু নাই। আমরা ভক্তির পাঠকগণকে অবিলম্বে একখণ্ড সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। (ভঃ সঃ)

## প্রাপ্ত পত্র-সম্বন্ধে বক্তব্য

বিগত ২রা জুন ১৯২৫ একখানি নামধাম বিহীন পত্র ভক্তি আফিসে আসিয়াছে, পত্রলেখক ভক্তি-সম্পাদক মহাশয়কে উপদেশ দিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন।

পত্রলেখক যিনিই হউন তাঁহার উপদেশ আমাদের শিরোধার্য্য। তবে লেখক মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন কর্ত্তব্য বোধে তাহার উত্তর দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নয় মনে করিয়া সংক্ষেপে দু'একটী কথা বলিব। সাহসী পত্রলেখক যদি নিজ নামধাম লিখিয়া দিতেন তাহা হইলে এ সকল অপ্রিয় কথা ভক্তির কলেবরে মুদ্রিত করিয়া ভক্তির অঙ্গ কলুষিত করিতাম না। তাঁহাকে পৃথকভাবে পত্র লিখিয়াই জানাইতাম। যাহা হউক—প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন—"প্রেম প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বক্সীর সহিত আমার পরিচয় বা আত্মীয়তা নাই।" লেখকের এ উক্তির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে আমরা অক্ষম, যেহেতু তিনি যে কে তাহার কোন পরিচয়ই পত্রে দেন নাই সুতরাং পরিচয় আছে কি না বা তিনি শিশির বাবুর সহিত কোনরূপ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ কি না তাহা আমরা কি করিয়া জানিব?

দ্বিতীয় কথা—প্রেম প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে নাকি প্রবন্ধ লেখক শিশির বাবুর মানের লাঘব হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কথা—যিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাঁহার সহিত যখন পত্র লেখকের কোনরূপ পরিচয় বা আত্মীয়তা নাই তখন তাঁহার সহিত সম্পাদক মহাশয়ের কি ভাবের কথা বার্ত্তা হইয়া কি উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ প্রারম্ভে ওরূপ মন্তব্য দেওয়া হইয়াছে এবং ওরূপ প্রবন্ধের ঐভাবে মন্তব্য দেওয়া সঙ্গত কি না সে বিষয় নিজ মস্তিষ্ক হইতে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া না লইয়া প্রথমে সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। পত্র লেখক নির্ভয়ে নিজ নাম ধাম প্রকাশ করিয়া ভক্তিসম্পাদকের নিকট এ বিষয় জানিতে চাহিলে সম্পাদক মহাশয় খুব আনন্দের সহিতই তাঁহাকে জানাইতেন, তিনি যে কেন ওরূপ ভয়ে ভয়ে নাম ধাম গোপন করিয়া পত্র দিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

তৃতীয় কথা—পত্রলেখক জানিতে চাহিয়াছেন সম্পাদক মহাশয়ের কোনরূপ পড়াশুনা আছে কি না। এর উত্তর আমরা কি দিব। তবে সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি বলিলেন যে,—"পাঠশালায় পাঠ শেষ করিবার ক্ষমতাও ভাগ্যক্রমে আমার হয় নাই, কোন রকমে এই ভাবে ছেঁড়া পুঁথি ঘাটিয়া আজ ২৩ বৎসরের ভক্তি কাগজখানির ১৪।১৫ বৎসর যাবৎ সম্পাদকের কার্য্য করিয়া আসিতেছি। পত্রলেখক যদি দয়া করিয়া আর কিছুদিন পূর্ব্বে এইভাবের কিছু প্রশ্ন করিতেন বা উপদেশ দিতেন তাহা হইলে কিঞ্চিৎ পড়াশুনার চেষ্টা করা যাইত।"

চতুর্থ কথা—শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট লিখিত শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রসঙ্গ যাহা ছাপা হইতেছে তাহা নাকি বীরভূমি পত্রিকায় কবে বাহির হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ দাস মহাশয় নাকি তাহার লেখক। এ সম্বন্ধে পত্রলেখক সম্পাদক মহাশয়কে না লিখিয়া অমূল্য বাবুকে লিখিলেই ঠিক হইত। অমূল্য বাবুর ঠিকানা ভক্তিতেই ছিল। যাহা হউক যখন তিনি লিখিয়াছেন তখন কর্ত্তব্য হিসাবে পত্র লেখককে জানান যাইতেছে যে, নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রবন্ধ লেখক অমূল্যবাবু ঐ প্রবন্ধের প্রথমে স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লিখিত বিষয় এই জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত হইবে। তারপর পত্রলেখক লিখিয়াছেন বীরভূমিতে প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার জ্ঞাতকারণ জানান যাইতেছে যে, শুধু বীরভূমি, নয় শ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের জীবনী যাহা 'চরিতসুধা' নাম দিয়া বাহির হইয়াছে সেই পুস্তকেও উহা বাহির হইয়াছে, একথা প্রবন্ধ লেখক অমূল্য বাবু অস্বীকার করেন নাই বা গ্রন্থকারের বিনা অনুমতিতে ছাপান নাই। সুতরাং পত্রলেখক মহাশয়ের কোন চিন্তার কারণ নাই—অমূল্য বাবু জাল লেখক নহে।

আশা করি পত্রলেখক মহাশয় এই কয়টী উত্তর পাঠেই নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিজ নামধাম সহিত পত্র লিখিয়া যদি কিছু জানিবার থাকে জানিবেন। ওরূপ নামধাম বিহীন পত্র লিখিয়া বালক-স্বভাবের অভিনয় করিবেন না।

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ভক্তি কার্য্যাধ্যক্ষ।

# ভক্তি

'ভক্তি' সম্পাদক পূজ্যপাদ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীপত্রিকায় মাদৃশ দীন হীন ব্যক্তিকে কোন প্রবন্ধ পাঠাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীপত্রিকার নাম "ভক্তি"। এমন হৃৎ-কর্ণ-রসায়ন সুমধুর নাম আর ভাষায় মিলে না। শ্রীঅদ্বৈতকুল-গৌরব শান্তিপুরবাসী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ তৎপ্রণীত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজের আশ্রিত ছিলেন তৎকালে শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা সিদ্ধ চৈতন্যদাস-বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে

গিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর তিনি বাবাজীমহাশয়কে "ভক্তি" সম্বন্ধে কিছু বলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। বাবাজী মহাশয় "ভক্তি" এই শব্দ শ্রবণ মাত্র এরূপ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিখা উচ্চ হইয়া উঠিল এবং তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অজস্রধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। গোস্বামী-মহাশয় সেই দৃশ্য দেখিয়াই কৃতার্থ হইয়া গেলেন; 'ভক্তি' সম্বন্ধে আর তাঁহার বড় কিছু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল না। বস্তুতঃ 'ভক্তি'র ন্যায় দেবদুর্লভ স্বর্গীয় সুকুমার ভাবকে বাক্যে প্রকাশ করিতে যাইয়া সকলকেই বিফল মনোরথ হইতে হয়। এই জন্যই ভক্তি তত্ত্বে সুপণ্ডিত কোন রসিক মহাজন বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্তি রসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি সুকৃতৈ র্ন লভ্যতে॥

ভগবদ্ভক্তি রসে অনুভাবিত বুদ্ধি যদি কুত্রাপি মিলে, তবে প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা ক্রয় কর। সে দুর্লভ রস সহজে মিলিবার নহে। একমাত্র প্রবল লোভই তাহার মূল্য। কোটি জন্মের পুণ্য ফলেও তাহা লাভ করা যায় না।

বস্তুতঃ ভক্তিধন লাভ করিয়া যিনি কৃতার্থ হইয়াছেন, এ নশ্বর জগতে তাঁহারই জন্ম ও জীবন সার্থক।

যস্যাস্তি ভক্তি র্ভগবত্যকিঞ্চনা।
সর্ব্বৈগুণৈ স্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণো
মনোরথে নাসতি ধাবতো বহিঃ॥

যে মহাত্মার চিত্তক্ষেত্রে অকিঞ্চনা হরিভক্তির উদয় হয়, সমস্ত দেবতা নিখিল গুণরাশি সহ তাহাতে বাস করেন। অভক্ত ব্যক্তির মহদ্‌গুণের সম্ভাবনা কোথায়? অভক্তের চিত্ত সর্ব্বদা বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। ভক্তি শাস্ত্রে আরও দেখিতে পাই,—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণব নাম ধেয়ম্॥

যে কুলে ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন সে কুল পবিত্র, তাঁহার জননী কৃতার্থা, তাঁহার আবির্ভাবে বসুন্ধরা ও তাহার বসতি ধন্যা এবং স্বর্গে তাঁহার পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করেন। নারদ ভক্তিসূত্রেও দেখি—

মোদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ
সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি।

ভক্তের আবির্ভাবে তাঁহার পিতৃগণ আনন্দ করেন, দেবতাগণ নৃত্য করিতে থাকেন, ধরিত্রীদেবী মনে করেন,—"আমি এতকাল অনাথা ছিলাম, আজ ভক্ত সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আমি সনাথা হইলাম"।

এই অমৃতনাম-ধেয় ভক্তিরসের উদ্দেশ্য, আধার ও আশ্রয় স্বয়ং শ্রীভগবান। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

রসোবৈসঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥

সেই রসস্বরূপ ভগবানই এই দিব্যরসের প্রস্রবন। সেই আনন্দঘন প্রেমস্বরূপের আনন্দকণা লাভ করিয়াই জীবনিবহ আনন্দরসে নিমগ্ন হয়। কিন্তু,

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

যতকাল জীবের ভোগবাসনা ও মুক্তি বাসনারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, ততকাল কিরূপে হৃদয়ে ভক্তি-রসের অভ্যুদয় হইবে?

বস্তুতঃ কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত জীবের উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নাই। এ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "কৃষ্ণকথা" ২য় ভাগ হইতে "কালীয়-দমন-লীলা"র অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিবার অনুমতি লইতেছি:—

সংসার-বিষম বিষ করিবারে ক্ষয়।
কৃষ্ণ পদাম্বুজ মাত্র জীবের আশ্রয়॥
ভীম ভবার্ণব এই হইবারে পার।
জীবের ভরসা মাত্র গুরু কর্ণধার॥
অহং বুদ্ধি মহাবিষ কর্ত্তৃত্বাভিমান।
না ত্যজিলে নাহি মিলে কৃষ্ণ ভগবান॥
ইত্যাদি বিবিধ তত্ত্ব বুঝাবার হেতু।
কালিয় নিগ্রহ করে কৃষ্ণ ধর্ম্ম সেতু॥
শাস্তিছলে কৃপাময় করুণা বিতরে।
কৃষ্ণের শাসন মাত্র মঙ্গলের তরে॥

ভেবে দেখ ভাই সব করি প্রণিধান।
কালীয়-ভুজঙ্গ মোরা নয় অভিমান॥
অহংকার বিষে সদা আছি জর্জ্জরিত।
বিস্তরি সহস্র ফণা গর্জ্জন সহিত॥
নাশিবারে বহি মোরা যারে ভাবি অরি।
স্বার্থরক্ষা হেতু সদা সর্প-লীলা করি॥
এই বিষধর সর্পে কে উদ্ধারে বল।
কৃষ্ণ কৃপা মাত্র বল, শ্রীপদ সম্বল॥
কৃষ্ণ যদি করি কৃপা দেয় শিরে পদ।
তবেই ভরসা ভাই অন্যথা বিপদ॥

* * * *

দীন হ'য়ে প্রেম পথ করহ আশ্রয়।
অহঙ্কার মুক্ত ক্রমে হইবে হৃদয়॥
স্বার্থের থাকিতে গন্ধ সিদ্ধি নাহি হ'বে।
অহংবিষ অহর্নিশি দগ্ধ করে সবে॥
জীবের দুর্গতি হেরি' বিপদ বারণ।
পদাশ্রয় দিয়ে কভু করেন তারণ॥
তখন জীবের হয় চৈতন্য উদয়।
কৃষ্ণ কৃপা হেতু তার ঘুচে লজ্জা ভয়॥
কৃষ্ণসেবা বুঝে তবে জীবনের সার।
সর্ব্বভূতে হেরি' কৃষ্ণে হয় সে উদ্ধার॥
কৃষ্ণসেবা জীব সেবা তুল্য বুঝি মনে।
আপনা ভুলিয়া তবে সেবে জীবগণে॥
স্বার্থের কালিমা তার নাহি থাকে চিত্তে।
এ ভব বারিধি তরে হাসিতে হাসিতে॥

তবেই বুঝা গেল কৃষ্ণ-কৃপা মাত্রই জীবগণের উদ্ধারের হেতু। এই কৃপা লাভের জন্য ধর্ম্মাচার্য্যগণ বিবিধ প্রণালীও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায় যে, 'ভক্তি' বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধ। বৈধি ভক্তি সাধন করিতে হইলে অসংখ্য বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু রাগানুগা ভক্তির সাধনে একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমের প্রয়োজন। ব্রজসুন্দরীগণ এই

বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ স্থানীয়া। ব্রজগোপীগণের পদরেণু ব্যতীত রাগানুগা ভক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। তাই বুঝি কলিযুগ-পাবন অবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও জীব শিক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে "গোপী" "গোপী" জপ করিতেন। বস্তুতঃই—

"গোপীদের প্রেম ভক্তি, বুঝিতে কাহার শক্তি,
গোপী প্রেম অমূল্য রতন।"

এ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "কৃষ্ণকথা" ১ম ভাগের "রাসলীলা" প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

"সুবোধ সাধক যত, হ'য়ে গোপী পদানত,
করিবেন কৃষ্ণ-উপাসনা।
গোপী-পথ অনুসরি, সব-সুখ পরিহরি
কৃষ্ণে মাত্র করিবে বাসনা॥
কিবা নর কিবা নারী, এ ভজনে অধিকারী
অকপটে প্রেম মাত্র সার।
বিষম বিষয়ানলে, পুড়ে শান্তি পেতে হ'লে,
হেন পথ আছে কোথা আর॥
ইন্দ্রিয় বাসনা যত, কভু নাহি হয় হত,
না ধরিলে গোপীর সাধনা।
গোপীভাবে কৃষ্ণে যেবা, অহেতুক প্রেমে সেবা
করে, তার পুরয়ে কামনা॥
সংসার বিষম-বিষ, দহে সবে অহর্নিশ,
গোপী প্রেম তাহে শান্তি-জল।
যে চাহে জুড়াতে জ্বালা, ভজুক সে জন কালা,
ধরি' গোপী-চরণ কমল॥
সত্য কহি ভক্তগণ, জানুক জগত-জন
গোপী-প্রেম সাধনার সার।
শ্রীকৃষ্ণে করিতে বশ, এক মাত্র প্রেম রস,
বিনা তবে নাহি কিছু আর॥

*  *

আর এক কহি তত্ত্ব, এ তত্ত্ব বড়ই সত্য
গোপীদের প্রিয় বরাঙ্গনা।

"যার নাম শ্রীরাধিকা, তিনি কৃষ্ণ প্রাণাধিকা,
প্রেমতত্ত্বে তিনি অতুলনা ॥
বিনা কৃষ্ণ আরাধনা, মানে না অন্য সাধনা,
মহাভাবময়ী সেই রাধা।
যে জন রাধারে চায়, সেই সত্য কৃষ্ণে পায়,
রাধা প্রেমে সদা কৃষ্ণ বাঁধা ॥
'রাধা' 'রাধা' সদা জপ, বৃথা পূজা বৃথা তপ,
রাধানামে হবে প্রেমোদয়।
রাধার প্রেমের থর, শুধিবারে সাধ্য কার,
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের হৃদয় ॥"

তাই বলি,—"জ্ঞানমার্গে কর্ম্মমার্গে কৃষ্ণে ধরি চিতে।
প্রেমের শীতল শান্তি না পারে ভুঞ্জিতে ॥
মাতৃভাবে যশোমতী পত্নী ভাবে রাধা।
প্রকটিল যেই প্রেম কৃষ্ণ তাহে বাঁধা ॥
বাঁধিতে শ্রীকৃষ্ণধনে যদি হে বাসনা।
গোপী-পাদ পদ্ম পূজি, কর উপাসনা ॥" কৃষ্ণকথা ২য় ভাগ।

বস্তুতঃ ভক্তি বা প্রেম কি বস্তু তাহা ধারণা করিতে হইলে এবং শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রতিনিয়ত প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন ও চরিত্র আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র ও আদর্শ হইতে যে জীবন্ত শিক্ষালাভ হয়, শত শত গ্রন্থ পাঠেও তাহা হইবার নহে। সত্য সত্যই—

"রাধাশ্যাম এক অঙ্গে দেখিবারে চাও।
গৌর চরণে তবে ভক্তিতে লুটাও ॥
গৌরাঙ্গে হেরিলে হয় যুগল দর্শন।
গোরা পদ সেবে হয় শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ ॥" কৃষ্ণকথা ২য় ভাগ।

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস।

# ভক্তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

[ ২৩শ বর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩২, ১২শ সংখ্যা ]

## প্রার্থনা

অভয় পদে নিলাম স্মরণ ওহে অনাথশরণ!
অপরাধী ব'লে দীনে হ'ওনা হে বিস্মরণ॥

হে সর্ব্বদুঃখহারি শ্রীহরি! আমি ভয়ঙ্করী সংসার ভাবনাদ্বারা অতিশয় বিক্ষিপ্ত হইতেছি, কিছুতেই চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমার সাধনা করিব বলিয়া বাহিরে নানাবিধ সাজ-সজ্জা করিয়া, পবিত্র গৃহে, পবিত্র বসনে ভূষিত হইয়া, পবিত্র দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বসিলাম, বাহিরের শব্দ বা কোনরূপ বাজে কথা যাহাতে শ্রবণ-গোচর না হয় সেরূপ বন্দোবস্তেরও ত্রুটী হইল না; কিন্তু আমার ভাগ্য-দোষে সাধন-ভজনের বিঘ্নকারিণী মহাশত্রু-স্বরূপিণী বিষয় ভাবনা অলক্ষিত ভাবে কোথা হইতে আসিয়া যে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ চিন্তায় মনকে চঞ্চল করিয়া আমার সকল উদ্যোগ, সকল যত্ন, সকল পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দেয় তাহা স্থির করিতে পারি না। অনেক রকম চিন্তা করিয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই অন্তঃশত্রু দমন আমা দ্বারা কোন মতেই হইবে না, যদি তুমি দয়া করিয়া ইহার কোন প্রতিবিধান না কর, তাহা হইলে বুঝিলাম আমার অধোগতি সুনিশ্চিত।

যুগে যুগে ধর্ম্ম রক্ষা, দুষ্ট দমন ও শরণাগত পালন কার্য্য তোমাদ্বারাই হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রাদি পাঠে জানিতে পাই যখনই যেখানে দানবাদির

অত্যাচারে ঋষিদের জপ-তপের বিঘ্ন ঘটিয়াছে তখনই সেইখানে তুমি অসুর-গণকে দমন করিয়াছ। আমি আজ সেই ভরসাতেই তোমারি স্মরণ লইলাম তুমি দয়া করিয়া আমার ব্যথা বুঝিয়া দুঃখ দূর করিয়া দাও।

বলিতে কি প্রভু; তোমার বড় সাধের লীলা-নিকেতন এই মানব-হৃদয় সংসার ভাবনারূপ পিশাচী অধিকার করিয়া, অসৎভাব, অজ্ঞান ও মোহ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত পুরুষগণের সহিত বিষয় মদিরা পানে মত্ত হইয়া আমাকেও আত্মসাৎ করিতে বসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোমত অসৎ ভাবনা ভাবাইয়া ভাবাইয়া আমাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে, এখন মধ্যে মধ্যে সাধু-গুরুর অপরিসীম দয়াবলে কোন সৎ বাসনা প্রাণে জাগিলেও তাহা পূর্ণ হইবার উপায় নাই; ইহাদের দমন করিবার কোন ক্ষমতাই আমার নাই। হে দানবারি! তোমার উপরই এখন আমার সম্পূর্ণ নির্ভর। হয় তুমি তোমার কৃপারূপ অস্ত্রদ্বারা ইহাদিগকে দমন কর না হয় আমাকে বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি অমোঘ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করিয়া উহাদিগকে দমন করিবার মত শক্তি দাও। তোমার কৃপা-কটাক্ষের শক্তি পাইলে আমি অনায়াসে বিক্ষেপ সকল দূর করিয়া নিরাপদ নিত্যানন্দময় তোমার ভজন করিয়া ভাবধনে ধনী হইতে পারিব। শত্রু সকল দমন হইলে সত্য সত্যই আমার হৃদয় আবার তোমার লীলা-নিকেতন হইবে। তখন নিত্য নূতন ভাবের লীলা-খেলা অনুভব করিয়া ধন্য হইব। দয়াময়! দয়া কর, হৃদয়ের আসুরিক ভাব সকল দূর করিয়া তোমার ভাবে মাতাইয়া রাখ। আমি একেবারে মন-প্রাণ তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া ধন্য হই।

দীন—

## ব্রজ কামনা

ওহে বংশীধারি গোলক বিহারী
ধর ধর প্রভু ধর হে।
কেশব মুরারী হে রাস বিহারী
লহ তুলে নাথ লহ হে ॥

শেষ হ'ল বেলা মিটে গেছে খেলা
চরণ ছাড়া ক'রো না হে।
জীবনের শেষে কাঙ্গালের বেশে
কাঙ্গাল আজি কাঁদিছে হে॥
তুলে নাও হরি তুমি হে মুরারী
অনাথ জনের সখা হে।
নিয়ে এসো বাঁশী ডাকো কাছে আসি
এ জীবন ধন্য কর হে॥

শ্রীজিতেন্দ্র প্রসাদ বসু

# বর্ণাশ্রম ও শ্রীগৌরাঙ্গ

( প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী )

আজ কাল অনেকের ধারণা, ছত্রিশ জাতিকে একাকার করিতে না পারিলে দেশ উদ্ধার হইবে না। ইহার সমর্থনের জন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন,— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানিতেন না। এ ধারণা যারপরনাই ভ্রান্ত ধারণা। তাঁহার লোক পালনী লীলা আলোচনা করিলে বরং দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি কি গার্হস্থ্য কি সন্ন্যাস উভয় আশ্রমেই অনুরূপভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভু প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রমাণ যথা—

"উষঃকালে সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্ব শিষ্যগণ সাথ॥"

[ শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি, ৭ম অধ্যায় ]

"উঠে প্রভু যথোচিত নিত্যকর্ম্ম করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥"

* * *

"ধর্ম্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
লোক রক্ষা লাগি প্রভু না লঙ্ঘেন ধর্ম্ম ॥"

[ শ্রীচৈতন্যভাগবত ১০ম অধ্যায় ]

সন্ন্যাস গ্রহণের পর ৺পুরীধামে প্রেম-বিলাস অবস্থাতেও তিনি যথোচিত সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করিতেন; শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান আছে। নিম্নে দুইটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

"মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষানির্ব্বাহন।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ

* * *

সন্ধ্যাকৃত্য করি পুনঃ নিজগণ সঙ্গে ॥
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা রঙ্গে"

[ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য ১৬শ ]

যথাবিধি শ্রীবিষ্ণু পূজাদি না করিয়া তিনি কোনদিনই যে ভোজন করিতেন না তাহারও প্রমাণ পাই। যথা—

"যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন ॥"

পুনঃ— "বিষ্ণু পূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥"

[ শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি ৭ম অধ্যায় ]

"গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীবিষ্ণু-পূজন।

* * *

তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসেন গিয়া ব'লে হরি হরি ॥"

ভোজনও তিনি যথাবিধি সম্পন্ন করিতেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৮ম বিলাস ৮৪,৮৭ শ্লোকে—"বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্' প্রভৃতি অংশে দেখা যায় যে, বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন উক্ত প্রকার বিষ্বক্সেনকে অর্পণ করিয়া ভোজন করিতে হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যের প্রথমে আবার তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। যথা—

* * *

"তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেবন ॥

যথাবিধি করি' প্রভু গোবিন্দ পূজন।
আসিয়া বসিল গৃহে করিতে ভোজন ॥
তুলসীর মঞ্জরীর সহিত দিব্য অন্ন।
মায়ে আনি সম্মুখে করিল উপসন্ন ॥
বিশ্বক্সেনেরে প্রভু করি নিবেদন।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডদেব করেন ভোজন ॥"

অতিথিসেবা গৃহস্থের একটি নিত্যকর্ম্ম। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত এই নৃ-যজ্ঞের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। যথা—

"গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম ॥"

[ শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি ১০ম ]

যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানেও তাঁহার নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"শাস্ত্রবিধি মতে শ্রাদ্ধ কর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লইয়া ॥

* * *

এই মত সর্ব্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায় চলিলা বিপ্রগণ সম্ভাষিয়া ॥"

[ শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি ১২শ ]

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ৺গয়াধামে যাইবার পূর্ব্বে বাড়ীতে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তথায় গিয়াও যথাবিধি শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাধান করেন। তারপর আপনি পাক করিয়া ভোজন করেন। যথা—

"তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হইয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥" [ ঐ ঐ ]

ভোজনের বিষয়েও যে তাঁহার খুবই বিচার ছিল, তাহা নিম্নলিখিত পদ্যাংশ হইতেই যেন বুঝিতে পারা যায়। অন্য জাতি তো দূরের কথা, যে সে ব্রাহ্মণের অন্নও তিনি অঙ্গীকার করিতেন না। যথা—

"অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ মূল্য লৈতে লাগে কৌড়ি দুই পণ ॥

ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আইসে কিছু পাক করে ঘরে ॥"
[ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮ম ]

"মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥
*   *   *
শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব ॥
এই মত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব গদাধর গুপ্ত-মুরারি ॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর কত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥". [ ঐ অন্ত্য, ১০ম ]

কি অভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ, কি বৈশ্য, কায়স্থ প্রভৃতি, তাঁহারা শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদই শ্রীমহাপ্রভুকে সেবা করাইতে পারিতেন না, ইহা উল্লিখিত অংশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপদিষ্ট এবং আচরিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করা বড় সহজ নহে। তাই গরজের দায়ে অনেকে বলেন যে, "তিনি এ মানিতেন না ও মানিতেন না'—এবং তাই বলিয়া তাঁহারা এই সহজ পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদিগকে সুমতি দান করুন।

## ব্রজের পথে

ঝড়িখণ্ড পথে মোর গোরা চ'লে যায়।
গোরা চ'লে যায় প্রেমের ঠাকুর চ'লে যায় ॥
বলভদ্র ভৃত্য সহ পাছু পাছু ধায়।
বন শোভা মনোলোভা দেখিবারে পায় ॥
কষিত কাঞ্চন গোরা মুখে হরি বলে,
দু'নয়নে ধারা বহে হেরে পাষাণ গলে।
মৃগ ব্যাঘ্র পথ ছাড়ি হিংসা ভুলি যায়,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তারা নাচে উভরায় ॥

প্রেমে মাতোয়ারা গোরা নদী দেখে বলে রে।
কালিন্দী আইনু আমি কপালের জোরে রে॥
পর্ব্বত দেখিয়া গোরা গোবর্দ্ধন মানে রে।
(বলে) কোথা মোর প্রাণনাথ গোকুলের শশী রে॥
স্থাবর জঙ্গম যত কৃষ্ণ নাম শুনি রে।
প্রতিধ্বনি করে নাম ধন্য মোরা বলি রে॥
শাখে বসি পিককুল পঞ্চম গায় রে।
ময়ূর ময়ূরী হেরি নৃত্য করি ধায় রে॥
শারী শুক পুনঃ রাধাকৃষ্ণ গুণ গায় রে।
এক দেহে রাধাকৃষ্ণ গোরা দেহ হেরি রে॥

দীন—শ্রীযদুপতি দাস

# প্রতাপরুদ্র-মিলন

সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়াছেন। অদ্বিতীয় মায়াবাদী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর কৃপায় শুষ্ক জ্ঞান-মার্গ পরিহার পূর্ব্বক একান্ত ভাবে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছেন। নীলাচলের সর্ব্বত্রই এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল এবং নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ চৈতন্য-চরণে মিলিত হইবার জন্য সার্ব্বভৌমের শরণাপন্ন হইলেন। উৎকলের অধিপতি জগন্নাথ-সেবক পরমভক্ত গজপতি প্রতাপরুদ্রও পরম্পরা শুনিলেন যে, সচল জগন্নাথ নীলাচলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ সংবাদ শুনিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। কিছুদিন পরে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ গমন করিলে রাজা প্রতাপরুদ্র একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কটকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর সহিত মিলনের সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, যথা—

"শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহা কৃপাময়॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥" ( চৈঃ চঃ )

ভট্টাচার্য্য তদুত্তরে বলিলেন "আপনি যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা যথার্থই, তিনি পরম কৃপাবান এবং ভগবানের অবতার। তবে তিনি সংসারত্যাগী সুতরাং রাজদর্শন তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যাহাহউক তিনি উপস্থিত থাকিলে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিতাম কিন্তু তিনি সম্প্রতি দক্ষিণ দেশ গমন করিয়াছেন, সত্বরই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তখন আপনার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিব।" মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীমিশ্রের নির্জ্জন গৃহে অবস্থান করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজা সেদিনের মত ভট্টাচার্য্যকে বিদায় দিলেন। কিছুকাল পরে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে নীলাচলে ফিরিলেন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত মিলন করাইলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে ভট্টাচার্য্য, মহাপ্রভুর নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়া সানুনয়ে কিছু নিবেদনের অনুমতি চাহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন—"তুমি অনায়াসে তোমার বক্তব্য বলিতে পার, তবে যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়া যথাবিহিত করা হইবে।" সার্ব্বভৌম তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের আন্তরিক কামনা জানাইলেন এবং ইহাও উল্লেখ করিলেন যে, তিনি একজন পরম ভক্ত এবং আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছেন। মহাপ্রভু এই সকল শুনিয়া কর্ণে হস্ত দিয়া নারায়ণ স্মরণ করিয়া বলিলেন—

* * *

"সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন।
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥" ( চৈঃ চঃ )

মহাপ্রভু ইহাও বলিলেন যে, "তোমরা এরূপ অসঙ্গত বাক্য মুখে আনিলে আমি নীলাচল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।" ইহাতে সার্ব্বভৌম নীরব হইলেন। কিছুদিন পরে পরম রসিক ভক্ত রামানন্দ রায় পুরুষোত্তমে আসিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া মহাপ্রভুর চরণে মিলিত হইলেন। মহাপ্রভু রামানন্দরায়কে পাইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলেন এবং উভয়ে প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের কথা তুলিয়া বলিলেন, "তিনিই আপনার নাম শুনিয়া আমাকে বর্ত্তন সহ রাজকার্য্য হইতে অবসর দিয়া আপনার শ্রীচরণ সেবা করিবার

অনুমতি দিয়াছেন। আপনার উপর তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, আপনার কৃপাকণা লাভে বঞ্চিত জানে তিনি নিজের অদৃষ্টকে সর্ব্বদা ধিক্কার দেন।"

"যে তার প্রেম আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥" ( চৈঃ চঃ )

মহাপ্রভু ইহা শুনিয়া বলিলেন—

"প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণভকত প্রধান।
তোমাতে যে প্রীতি করে সে-ই ভাগ্যবান॥
তোমাতে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিব অঙ্গীকার॥"

( চৈঃ চঃ )

ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের মর্য্যাদাও বাড়াইলেন আবার প্রকারান্তরে মিলনের ইচ্ছার সামান্য আভাষও দিলেন। এদিকে রাজা প্রতাপরুদ্রের হৃদয়ে চৈতন্য-মিলনের উৎকণ্ঠা দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং পুনরায় সার্ব্বভৌমকে আহ্বান করিয়া তিনি তাঁহার অভিপ্রায় মহাপ্রভুর নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সার্ব্বভৌম দুঃখিতান্তরে জানাইলেন যে, তিনি যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজদর্শন করিবার অনুরোধ করিলে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া যাইবেন এরূপ জানাইয়াছেন। রাজা এ সংবাদ পাইয়া অন্তরে বড়ই আহত হইলেন এবং বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই মাধাই তিঁহো করিলা উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগত উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥
তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজ দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥" ( চৈঃ চঃ )

এরূপ প্রতিজ্ঞা ভক্তেরই শোভা পায়। ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভগবান নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না, ভক্তপ্রবর ভীষ্মও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্র

ধরাইবেন। ইহার পরিণাম—ভক্তের জয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধারণে বাধ্য হইলেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল, প্রতাপরুদ্রের প্রতিজ্ঞাই রক্ষা হইয়াছিল। প্রভু! যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পার না, ভক্তের কাছে সেরূপ প্রতিজ্ঞা কর কেন? মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রের মত পরম ভক্তকে কৃপা করিবেন ইহা অন্তরে জানেন, তবে জীব শিক্ষার জন্য এবং সন্ন্যাসী সমাজে রাজদর্শন বর্জ্জনীয় ইহা জানাইবার জন্যই বাহ্যিক রোষাভাষ ও প্রতিজ্ঞা। ধন্য ভক্তবৎসল প্রভু! আর ধন্য তোমার ভক্ত! সার্ব্বভৌম, রাজার এরূপ গাঢ় অনুরাগ দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে, মহাপ্রভুর কৃপা আপনার উপর নিশ্চয়ই বর্ষিত হইবে, রামানন্দ রায়ও কথা প্রসঙ্গে আপনার গাঢ় প্রেমের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মন কিছু ফিরিয়াছে এরূপই অনুমান হয়। এক্ষণে একটী উপায় দেখিতেছি, যদি আপনার অভিপ্রেত হয় মহাপ্রভুর দর্শন লাভ ঘটিতে পারে। আগামী রথোৎসবে মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সহ প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিবেন এবং যখন পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন তখন আপনি রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাস পঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁহার শ্রীচরণ উপস্থিত হইবেন। তিনি কৃষ্ণনাম শ্রবণে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া বৈষ্ণব জ্ঞানে আপনাকে আলিঙ্গন দিবেন।

রাজার গাঢ় অনুরাগ দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চৈতন্য-চরণ বিনা তাঁহার রাজ্য, ধন, সম্পদ সমস্তই বৃথা জ্ঞান হইতে লাগিল, তখন সার্ব্বভৌমকে পুনরায় একখানি পত্র দিলেন, তাহাতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন তিনি যেন মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, তাঁহারা পরম দয়ালু সুতরাং তাঁহাদের কৃপায় মহাপ্রভুর কৃপাকণা লাভে বঞ্চিত হইব না। মহাপ্রভুর কৃপায় অধিকারী যদি না হই তাহা হইলে রাজ্য ত্যাগ করিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। ভট্টাচার্য্য এই পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়া তাহা ভক্তগণের নিকট গিয়া পাঠ করিলেন, তাঁহারা রাজার প্রভুপদে অসীম ভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং নিত্যানন্দ প্রমুখ সকলে মহাপ্রভুর নিকট গিয়া রাজার সহিত মিলনের কথা উত্থাপন করিলেন। মহাপ্রভু অন্তরে আনন্দিত হইলেন সত্য, কিন্তু বাহ্যিক রোষ দেখাইয়া বলিলেন "দেখিতেছি, তোমরা আমার যাহাতে নিন্দা হয় তাহাই কামনা কর। অপরের কথা দূরে থাকুক দামোদরই আমাকে ভর্ৎসনা করিবে।" দামোদর তাহাতে বলিলেন "কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্তই আপনার গোচর, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের আপনাকে বিধি দিবার

সামর্থ্য নাই।" নিত্যানন্দ প্রভুও বলিলেন যে, অনুরাগী ব্যক্তি অভিষ্ট বস্তু না পাইলে প্রাণ ত্যাগও করিতে পারে, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। যাহাহউক আমার যুক্তিমত এক কাজ করুন। আপনি আপনার একখানি বহির্বাস দিয়া আপাততঃ রাজার প্রাণরক্ষা করুন। মহাপ্রভুও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গোবিন্দ দ্বারা একখণ্ড বহির্বাস রাজাকে দিবার জন্য সার্ব্বভৌমকে দিলেন। যথা সময়ে বহির্বাস রাজার হস্তগত হইল এবং তিনি মহাপ্রভুর প্রসাদী বহির্বাস পাইয়া আনন্দিত মনে তাহারই পূজা করিতে লাগিলেন। অপর একদিন অন্তরঙ্গ ভক্ত রামানন্দ রায় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও কিছুতেই রাজদর্শনে সম্মত হইলেন না, তবে তিনি বলিলেন—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্র।" রাজার একটী পুত্রের সহিত মিলনে আমার কোনও আপত্তি নাই, তাহাতেই রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" তদনুসারে রাজার একটী পুত্র আসিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে মিলিত হইলেন এবং তিনি একজন ভক্ত-মধ্যে পরিগণিত হইলেন। রাজা মহাপ্রভুর কৃপাকণা লাভে সৌভাগ্যবান পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া মনে করিলেন, তিনি যেন মহাপ্রভুর স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা আসিল, মহাপ্রভু স্বগণসহ জগন্নাথের বিজয় দর্শনে গমন করিয়াছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র স্বর্ণমার্জ্জনী লইয়া জগন্নাথের গমন নিমিত্ত পথ পরিস্কৃত করিতেছেন এবং তাহাতে চন্দন জল সিঞ্চন করিতেছেন। উৎকলাধিপতির এরূপ তুচ্ছ সেবা দেখিয়া মহাপ্রভু মনে মনে বড়ই প্রীত হইলেন। লোকনাথ গোস্বামী প্রভুও রাজপুত্র নরোত্তম ঠাকুরের তুচ্ছ সেবা দর্শনে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র দিয়াছিলেন। ক্ষণকাল পরে মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সহ রথাগ্রে কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইলেন। মহাপ্রভুর অদ্ভুত নৃত্য ও প্রেম বিকার দেখিয়া রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন।

"কভু নেত্র নাসাজল মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্র বিম্ব বহে যেন॥" ( চৈঃ চঃ )

চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা মহা প্রভুর অদ্ভুত কীর্ত্তনানন্দ দেখিয়া আনন্দিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি কৃষ্ণ বিকারের ভাব বুঝিতে অক্ষম তজ্জন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখে লালা ও নাসাজলে সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত দেখিয়া তাঁহার মনে কিছু সংশয় হইয়াছিল, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া শয্যায় শয়ন করিলে স্বপ্নযোগে দেখিলেন, তিনি যেন জগন্নাথ দেবের সম্মুখে গিয়া দেখিতেছেন, প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ ধূলি লিপ্ত—নাসায় ও চক্ষে অবিরত ধারা বহিতেছে—

শ্রীমুখের লালায় কলেবর সিক্ত। রাজা ভাবিতেছেন প্রভুর এ কিরূপ লীলা! যাহাহউক তিনি তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন তখন জগন্নাথ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং শ্লেষ বাক্যে বলিলেন—

"আমার শরীর দেখ ধূলা লালাময়।
আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয়॥" ( চৈঃ ভাঃ )

পরক্ষণেই দেখেন সেই সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বসিয়া আছেন, প্রতাপরুদ্রের তখন আত্মগ্লানি হইল এবং হৃদয়ে সংশয় পোষণ করিয়া তিনি যে গুরুতর অপরাধী হইয়াছেন তাহার জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। পরক্ষণেই স্বপ্নভঙ্গে তিনি জাগিয়া উঠিলেন। মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি পাইল, চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ নাই। যাহাই হউক না কেন ভক্ত চরিত সমস্তই মধুর। এক্ষণে চরিতামৃতে যেরূপ আছে তাহাই বর্ণনা করিতেছি। মহাপ্রভু নৃত্য করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে করিতে প্রতাপরুদ্র যেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন তাহার নিকটে বাতাহত কদলীতরুবৎ আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রতাপরুদ্রও কালবিলম্ব না করিয়া বাহুবেষ্টনী দ্বারা তাঁহাকে ধরিলেন। প্রভুর তাহাতে বাহ্যজ্ঞান হইল এবং সম্মুখে রাজাকে দেখিয়া—"ছি! ছি! বিষয়ী-স্পর্শ হইল" বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর বাক্যে রাজার অত্যন্ত ভয় হইল। তাহাতে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বলিলেন যে, মহাপ্রভু আপনার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, কেবলমাত্র নিজজনকে শিক্ষা দিবার নিমিত্তই ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। আপনি দুঃখিত বা ভীত হইবেন না। ক্রমে ক্রমে রথ বলগণ্ডীস্থানে উপনীত হইলে জগন্নাথদেব রথ হইতে অবতরণ করিয়া—ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত ভোগ আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভুও সেইস্থানে পুষ্পোদ্যানে বসিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত কীর্ত্তন জনিত ক্লান্তিদূর করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের উপদেশ অনুসারে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া একাকী বৈষ্ণববেশে উপবনে প্রবেশ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তবৃন্দের অনুমতি লইয়া মহাপ্রভুর পাদ সম্বাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভু তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রেমে ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন। রাজা রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রভুর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে মহাপ্রভু অপার সন্তোষলাভ করিলেন, এবং গাত্রোত্থান করিয়া রাজাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। উভয়ের অঙ্গে কম্প

ও নেত্রে জলধারা পড়িতে লাগিল। মহাভাগ্যবান রাজা প্রতাপরুদ্র ও প্রতাপ-রুদ্র-সম্রাজ্ঞী মহাপ্রভুকে সেইস্থানে সেই অবস্থায় রাখিয়া আমরা অদ্য পাঠক-গণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। যদি মহাপ্রভুর ইচ্ছা হয় তিনিই আবার আমাদের মাথায় লাথি মারিয়া লেখনী ধারণ করাইবেন।

দীন—শ্রীযদুপতি দাস।

# শ্যাম-বিনা

(প্রভু) তুমি যদি না আস গো ফিরে পুনঃ ব্রজে
অন্ধ হ'তে রইবে না কেউ বাকি,
পাগল হবে ব্রজবাসী তোমায় হারা হ'য়ে
(তাদের) স্পন্দিবেনা হৃদয় থাকি থাকি।
নাচ্‌বে না আর ময়ুর কভু ময়ুরীর সনে
গাইবে না আর গাছে গাছে পাখী,
ধর্‌বে না আর অলি কভু গুন্‌গুনিয়ে তান
শিশির-ভেজা ফুলের রেণু মাখি'।
গোপের ঘরের ননী ছানা রইবে পড়ে সব
তুমি যদি না খাও দয়াল প্রভু,
গোঠের ধেনু তোমায় বিনে উচ্চে পুচ্ছ তুলি
ধাইবে না আর আনন্দেতে কভু।
হোলির দিনে দোদুল দোলায় চর্‌বেনাক' কেউ
লালে লালে ভর্‌বে না আর দেহ,
বেণুর তানে ব্রজবাসীর কাঁপ্‌বেনা আর হিয়া
শুন্‌বেনা আর উদাস হ'য়ে কেহ।
বইবে না আর ওই যমুনা কূলে কূলে ভরি
ভাসবে না আর পারে যাবার তরী,
দুধের হাটের গোপীকারা ডাক্‌বে না আর কভু
'পার ক'রে আজ দাও গো মোরা হরি'।

সাধের ব্রজ নীরব হবে তোমার তরে প্রভু
বন্ধ হবে সকল হাসি খেলা,
তাই বলি গো ব্রজের প্রাণ এস ফিরে ব্রজে
উঠুক ফুঠে আনন্দেরি মেলা।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক ।

# নিবেদন

নানাবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া শ্রীভক্তিপত্রিকা আজ তেইশ বর্ষ পূর্ণ হইল। আগামী ভাদ্র মাস হইতে ২৪শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। বৎসরের প্রারম্ভে যেভাবের সংকল্প করিয়া এবার পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করিয়া ছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত সে সঙ্কল্প অটুট্ রাখিতে পারি নাই, তাহার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথম কারণ—বিগত ভাদ্রমাসে আমি সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় প্রায় তিনমাস শয্যাগত থাকি তারপর যদিও প্রভুর ইচ্ছায় রোগমুক্ত হইলাম কিন্তু দেহ পূর্ব্বের মত কর্ম্মঠ হইল না, কাজেই স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় নানাস্থানে আমাকে ঘুরিতে হইল। প্রবাসে থাকাকালে কাজ কর্ম্মের ভার যাঁহাদের উপর থাকে তাঁহারা কোনমতে কাজ চালাইয়া লন মাত্র। ভাল মন্দ কিছুই দেখেন না। বৎসরের প্রথমেই এইরূপ থাকায় সারা বৎসরের কাজেই বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া গেল। মোট কথা, এবৎসর নিতান্ত প্রভু দয়া করিয়া কাগজখানি রক্ষা করিয়াছেন মাত্র। বলা বাহুল্য ভক্তির পুরাতন গ্রাহকগণ এবার নূতন গ্রাহক সংগ্রহে বিশেষ কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছেন, এ কাজ যে আমার একার নয় এবং সকলের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা না হইলে যে, সর্ব্ববিধ উন্নতি অসম্ভব, আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ সহৃদয় গ্রাহকগণ এবার তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ফলে মনের আশা মনেই রহিয়া গিয়াছে। এমন কি পৃথক পত্রাঙ্কে যে গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার একখানি বৈশাখ মাসে শেষ হওয়ায় জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে নূতন গ্রন্থ আরম্ভও করিতে পারি নাই। যে লোককে গ্রন্থখানি নকল করিতে দেওয়া হইল তিনি কি জানি কেন উহা লইয়া একেবারে উধাও হইলেন বহু অনুসন্ধানে তাঁহার নিকট হইতে গ্রন্থখানি উদ্ধার হইয়াছে কিন্তু

নকল হয় নাই কাজেই এই কয়মাস আর উহা প্রকাশের সুবিধা হইল না। আমাদিগের আশা আছে, ভাদ্রমাস হইতে পৃথক ভাবে উহা প্রকাশ করিতে পারিব।

• অনেকে আপত্তি ধরিয়াছেন যে, ভক্তির অক্ষর বড়ই পুরাতন হইয়াছে সময় সময় সকল কথা বুঝিতেও পারা যায় না। তাই আমরা আগামী ভাদ্রমাস হইতে নূতন অক্ষরে পরিষ্কার করিয়া ভক্তি ছাপার বন্দোবস্ত করিলাম। পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন এই সব বন্দোবস্ত করিতে আমাদিগকে কিরূপ অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে, এ সময় ভক্তির প্রত্যেক গ্রাহককেই আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি। বেশী নয় প্রত্যক গ্রাহক আমাদিগকে দুইটি করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিন তাহা হইলেই যথেষ্ট উপকার করা হইবে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মভাব পূর্ণ সৎকথা প্রচারদ্বারা জীবের মঙ্গল সাধনে সহায়তা করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয়েও ধন্য হইবেন।

অনেকে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন যে, গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিলে কোনরূপ কমিশন দেওয়া হয় কিনা, প্রত্যেককে পৃথকভাবে উত্তর দেওয়ার সুবিধা না হওয়ায় এই প্রবন্ধদ্বারা তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে যে, যিনি একত্রে পাঁচ জন নূতন গ্রাহকের টাকা মনি-অর্ডার করিয়া আমাদিগকে পাঠাইবেন, তিনি বিনা মূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে এক বৎসর ভক্তি পত্রিকা পাইবেন। ভক্তির পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকের নিকটই আমাদিগের আর একটী অনুরোধ। ভক্তির বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা তাঁহারা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইবেন, কারণ ভিঃ পিঃ করিলে তাঁহাদিগের অনর্থক অর্থদণ্ড হয়। যদিও আমরা ১॥৶০ আনা ধার্য্য করিয়া ভিঃ পিঃ করি কিন্তু গ্রাহকগণকে উহা ১৸৶০ আনা দিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আমরা কিন্তু ১॥৶০ আনাই পাই, মধ্য হইতে তাঁহাদের ৶০ আনা বেশী লাগে, আর যদি মণি অর্ডার করেন তবে মাত্র ৵০ আনা খরচেই হইতে পারে। তারপর ভিঃ পির টাকা আমাদের হস্তগত হইতেও বিলম্ব হয় এবং সেই অনুসারে পত্রিকা পাঠাইতেও কিছু বিলম্ব ঘটে। মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে এ সকল হাঙ্গামা কিছুই হয় না। আমাদের মনে হয় এইটাই সহজ পন্থা।

আর একটী সুসংবাদ—আগামী ২৪শ বর্ষের নূতন গ্রাহকগণ ভক্তির বার্ষিক মূল্য ১॥০ ও উপহার জন্য ।০ চার আনা মোট ১৸০ আনা পাঠাইলে

২৪শ বর্ষের গ্রাহকগণের জন্য উপহার পুস্তক "পঞ্চ-গীতা" ১খানি বিনা ডাক মাশুলে পাঠান হইবে। উক্ত পঞ্চগীতা, গ্রাহক ব্যতীত অন্যের পক্ষে ৵৹ আনা ও ডাক মাশুল ৴৹ এক আনা লাগে।

ভক্তিতে মাসে মাসে "বিশ্বরূপের সঙ্গীত" প্রকাশ হইত, আজ কয়েক মাস তাহা হইতেছে না বলিয়া অনেকে আমাদিগকে নানাপ্রশ্ন করিতেছেন। আমাদিগের বক্তব্য এই যে, বিশ্বরূপের সঙ্গীত এবং অন্যান্য বহু সঙ্গীত একত্রে সংগ্রহ করিয়া ভক্তি-কার্য্যালয় হইতে "কীর্ত্তন-গীতি-সংগ্রহ" নামক সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, উক্ত পুস্তকে বিশ্বরূপের বহু সঙ্গীত আছে সেই জন্য আর পৃথক ভাবে মাসে মাসে দেওয়া হইতেছে না। তারপর তাঁহার নূতন সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া যাহাতে শীঘ্রই আবার ভক্তিতে প্রকাশ করিতে পারি তাহারও চেষ্টা হইতেছে কীর্ত্তন-গীতি সংগ্রহের বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দেখুন।

বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে, আগামী ভাদ্রমাস হইতে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃপদা প্রসাদ ভাগবতরত্ন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণের বহু প্রবন্ধ নিয়মিত ভাবে প্রকাশ হইবে।

যে করুণাময় প্রভুর কৃপায় ও যে সকল গ্রাহকগণের সহানুভূতিতে আমরা ভক্তির বর্ষ পূর্ণ করিয়া নূতন বৎসরের জন্য আয়োজন করিতে সমর্থ হইতেছি সেই প্রভুর ও গ্রাহকগণের জয় দিয়া আমার নিবেদন এইখানেই শেষ করিলাম। অলমিতি।

বিনীত

"ভক্তি-সম্পাদক।"

# ব্রজাঙ্গনার শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি

আমরা আজ যাহা আলোচনা করিয়া ধন্য হইব মনে করিয়াছি তাহা সূর্য্যের মত বৃহৎ এবং সমুদ্রের মত গভীর। এতাদৃশ বৃহৎ বস্তু আলোচনা করা মাদৃশ সামান্য ব্যক্তির সাধ্যাতীত। আমরা কেবল মাত্র সংক্ষেপে দুটী কতক কথা বলিতে চেষ্টা করিব। আজ কাল দেখা যাইতেছে যে, এই গোপীপ্রেম আলোচনা প্রসঙ্গে শত শত লেখক সংবাদ-পত্র-স্তম্ভে তাঁহাদের চিন্তা ভার নামাইয়া

দিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে বঙ্কিম চন্দ্রই অবশ্য এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।

ব্রজ গোপীগণ তাঁহাদের আদরের নন্দনন্দনকে কিরূপ তন্ময় হইয়া ভাল বাসিতেন তাহার সাদৃশ প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য একবার স্বর্গীয় কবি নবীন চন্দ্র সেনের জীবনে ঘটিয়াছিল। আমরা সর্ব্বপ্রথমে সেই ঘটনাটিই আমার প্রিয় পাঠকগণকে উপহার দিব। কবিবর তখন পুরীর ডেপুটী ম্যাজেষ্ট্রেট। পুরীর রাজা, একটী সাধু বাবাজীর হত্যায় দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড'জ্ঞা' প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সে বৎসরের পুরীর রথযাত্রার বন্দোবস্ত করিবার ভার পাইয়াছেন। তিনি শ্রীমন্দিরে ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিয়া যে দৃশ্যটী দেখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভাষায় তাঁহার "আমার জীবন" হইতে শ্রবণ করুন,—"চক্ষের সম্মুখ দিয়া দর্শন-মন্দির হইতে মানব স্রোত বহিয়া যাইতেছে। তাদের কতভাষা, কত পরিচ্ছদ, কত বিচিত্র রূপ, হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা বাসী এবং চট্টগ্রাম হইতে গান্ধার বাসী সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি এক স্রোতে বহিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্রমান্বয় চারিটী মন্দির। সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথম ভোগ মন্দির, তাহার সংলগ্ন নাট মন্দির, তাহার সংলগ্ন দর্শন মন্দির, তাহার সংলগ্ন শ্রীমন্দির। যাত্রীগণ নাট মন্দিরের পার্শ্বস্থ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দর্শন মন্দিরে উপস্থিত হয়। সেখানে একটী বৃহৎ চন্দন কাষ্ঠ দুটী লোহার স্তম্ভের উপর স্থাপিত আছে। যাত্রিগণ এ চন্দন অর্গলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীমন্দির স্থিত ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করে। শ্রীমন্দির দ্বিপ্রহর সময়ও নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন। আলোর মধ্যে তেলের মশাল। তাহাতে আলো অপেক্ষা ধুঁয়া বেশী হইয়া থাকে। যাত্রীগণকে চন্দন অর্গলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে হয়। তাহাও মুহূর্ত্তেকের বেশী সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার সাধ্য নাই। পশ্চাতে যাত্রীস্রোত ঠেলিতেছে; দুই পার্শ্ব হইতে কনষ্টেবল ও মন্দিরের পরিহারিরা (প্রতিহারিরা) চোট্ পাট্ করিতেছে। পরিহারিদের হাতে বেত থাকে এবং সে বেতের দ্বারা প্রাচীরের গায়ে এমন কৌশলে তাহারা আঘাত করে যে, ঠিক বন্দুকের মত শব্দ হয়, অতএব শ্রীক্ষেত্রে গিয়া কেহ লাউ দেখিল, কেহ কুমড়া দেখিল্ বলিয়া যে গল্প শুনা যায়, তাহা অলীক নহে। যাত্রীরা মুহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়াইয়া সেই ঘোর অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে আর যাহা কিছু দেখুক, জগন্নাথের প্রায় কিছুই দেখিতে পায় না, অথচ ভক্তির এমনি মাহাত্ম্য যে, তাহারা উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া করতালি দিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে এবং গদগদ নয়নে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে "জয়

জগন্নাথ" বলিয়া বাহ্য জ্ঞান হীন অবস্থায় যেরূপে বাহির হইয়া আসে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহারা স্বয়ং শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া আসিয়াছে। এদৃশ্য দেখিলে পাষাণও দ্রব হয়। আমি নিজে স্তম্ভিত ও আত্মহারা হইয়া গলদশ্রু নয়নে এদৃশ্য দেখিতেছি, এমন সময় একটী ষোড়শ বর্ষীয়া অনিন্দ্য সুন্দরী বিধবা যুবতী পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া পবন ছিন্ন পুষ্প বল্লরীর মত আমার গলায় পড়িল। তাহার মুখে কেবল একমাত্র কথা—"আমি বড় অভাগিনী, আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, আমার ভাগ্যে জগন্নাথ দর্শন হইল না। বাবা! তুমি আমাকে জগন্নাথ দর্শন করাও।" তাহার আলুলায়িত কেশ রাশি আমার অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার দেবীতুল্য মুখখানি আমার চক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাহার নয়ন জলে আমার বসন ভিজিয়া যাইতেছে। তাহার অঙ্গের বসন পর্য্যন্ত স্খলিত হইয়া গিয়াছে। তাহার কান্নায় আমি কাঁদিয়া বলিলাম—"তুমি আমার গলা ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া জগন্নাথ দর্শন করাইতেছি।" কিন্তু তাহার বাহ্য জ্ঞান নাই। কেবল মুখে সেই কথা—"আমি বড় অভাগিনী।" একজন কন্‌ষ্টেবলকে বলিলে সে আমার গ্রীবার পশ্চাৎ হইতে তাহার করের মুষ্টি খুলিয়া দিল। আমি তখন তাহাকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং উত্তর দিকে মন্দিরে যাত্রীর প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়া পথ পরিষ্কার হইলে, আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলাম। তখন মশালের আলো ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া তাহাকে বলিলাম—"তোমার সম্মুখে জগন্নাথ, তুমি প্রাণ ভরিয়া দর্শন কর।" সে তখন নিদ্রোত্থিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া স্থির অনিমেষ বিস্ফূত নয়নে জগন্নাথের দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে তাহার বাহ্যজ্ঞান হইল, এবং তখন সসম্ভ্রমে অবগুণ্ঠন দিয়া বলিল—"আমি কোথায়? আসিয়াছি? ওমা! আমার কি হইবে?" আমি বলিলাম—"তোমার কোনও ভয় নাই। আজ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে তোমার মত জগন্নাথ দেবের ভক্ত কেহ আসে নাই। তুমি যদি ইচ্ছা কর রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করিতে পার।" একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে সে শতবার বেদী প্রদক্ষিণ করিল, এবং পুনর্ব্বার কিছুক্ষণ অনিমেষ নয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। আমি সে ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি এজীবনে কখনও ভুলিব না। তখন তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল-যে, তাহারা ১১ জন আত্মীয় আত্মীয়াসহ মন্দিরের হাতায় প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার পর তাহার আর কিছুই মনে নাই। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আমার পূর্ব্ব স্থানে

ফিরিলাম এবং তাহাকে আমার পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া, তাহার আত্মীয়গণের অন্বেষণার্থ পুলিস নিয়োজিত করিলাম। কিছুক্ষণ পরে তাহারা আসিল। যুবতী তাহাদিগকে দেখিয়া এবং তাহারা যুবতীকে দেখিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং লুটাইয়া লুটাইয়া তাহাদের জাতি রক্ষা করিয়াছি বলিয়া আমার পায়ে পড়িতে লাগিল। সে আর এক পবিত্র দৃশ্য।

"তাহারা চলিয়া গেল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ ব্যাপারটী কি? একটী অজ্ঞাত কুলশীলা এরূপ ভাবে আসিয়া আমার গলায় পড়িল। তাহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, বাহ্যজ্ঞান নাই। রমণী কেবল জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শনের জন্য যদি এরূপ ভক্তিতে অধীরা ও আত্মহারা হইতে পারে, তবে ব্রজ গোপীরা স্বয়ং শ্রীভগবানকে কিশোর বালক রূপে সম্মুখে পাইয়া রাসের শেষে যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে, তাঁহার শ্রীমুখ চুম্বন করিবে, এবং তাঁহার দর্শনের জন্য পতি পুত্র ত্যাগ করিয়া আসিবে তাহা আর বিচিত্র কি? আমার হৃদয়ে একটী নূতন স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং সেখানেই রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস অঙ্কুরিত হইল। মেলা শেষ হইলে দ্বিপ্রহর সময়ে আমিও আত্মহারা অবস্থায় আবাসে ফিরিলাম।"

উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে গোপীগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা— নিত্য সিদ্ধা ও সাধন সিদ্ধা।

নিত্যসিদ্ধা—শ্রীরাধা প্রভৃতি। ইঁহারা নিত্য শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিনী, গোলক বিহারিণী এবং আনন্দ ও চিন্ময় রস পরিপূর্ণা। সাধন সিদ্ধা গোপীগণ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে।

পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র যখন সীতাদেবীর সহিত দণ্ডকারণ্যে বাস করেন, তখন গোপালোপাসক তত্রস্থ ঋষিগণ জানকী-সেবিত রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া জানকীর ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে বাসনা করেন, সাধন বলে পরবর্ত্তী যুগে ইঁহারাই গোকুলে গোপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারাই সাধন সিদ্ধা গোপী।

ব্রজ বালাগণ আশৈশব শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ অমানুষিক কার্য্যাবলী দর্শন ও শ্রবণ এবং তাঁহার মদনমোহন কমনীয় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ তখন কিশোর বয়স্ক বালক মাত্র তথাপি তাঁহারা পূর্ব্ব সুকৃতিবলে বুঝিলেন তাঁহার বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি নাই। আবার তিনি চির বালক, চির যুবা, ও চির পুরাতনও বটেন। তাহার উপর প্রতিনিয়ত তাঁহার অতুলনীয় রূপরাশি, ক্রীড়া, হাস্য-পরিহাস

ও প্রাণহারিণী বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সেই অষ্টমবর্ষীয় শিশু ভুবন ভুলান মূর্ত্তিতে নিয়ত তাঁহাদের সম্মুখে বিরাজিত। বিশেষতঃ তাঁহারা যখন তাঁহাকে ইচ্ছাময় তনু ভগবান বলিয়া জানিয়াছেন তখন তাঁহাকে কামিনীজনোচিত চরমানন্দোপভোগ কামনায় পতিরূপে পাইতে ইচ্ছা করা আদৌ আশ্চর্য্য জনক হয় নাই। তাঁহারা শয়নে স্বপনে, প্রতি কার্য্যে, প্রতিক্ষণে, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা. তাঁহার গুণাবলী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাতে অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই অধর চাঁদ, যিনি নিজে দয়া করিয়া ধরা না দিলে তাঁহাকে কেহ ধরিতে পারে না, মুনি ঋষিগণ, কত শত সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যাঁহার জ্যোতিরাভাস মাত্র লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, সেই শ্রীভগবানের পতিভাবে পাইবার জন্য তাঁহার আশ্রিতা দেবী মহামায়াকে সর্ব্বপ্রথমে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। অতঃপর ব্রজ কুমারীগণ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন হইতে যথারীতি একাহার ও সংযম অবলম্বন পূর্ব্বক দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা করিতে লাগিলেন।

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপ সুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

ইহাই বলিয়া গোপিকাগণ কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

অতঃপর তাহাদের ব্রত পূর্ণ হইলে সর্ব্ব শুভদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বস্ত্রগুলি আহরণ করিয়া কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহাদিগকে বস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভাগবতকার বলিতেছেন,—পাছে প্রিয়তমের ক্রোধ হয় এই ভয়ে তাহারা তাঁহার বাক্য অবহেলা না করিয়া শীত কম্পিত কলেবরে "পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য"—পূর্ব্বক ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিয়া কদম্বমূলে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই শুদ্ধাচারিণীদিগকে দর্শন করিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন, হে কুমারিগণ! তোমরা যদিচ পবিত্র চিত্তা, তত্রাচ বিবস্ত্রা হইয়া সলিলে অবগাহন করায় বরুণদেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই পাপক্ষালনের জন্য তোমরা মস্তকোপরি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর।

কুমারিগণ ব্রত নিয়ম ভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মফল মনে মনে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া তাঁহাকেই প্রণাম করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা সৌভাগ্যের চরম সীমা লাভরূপ রাস রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ সহ বিহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা আমাদের বলিতে যাহা কিছুআছে সমস্তই যে ত্যাগ করিয়া আসিয়া ছিলেন।

এই রাসলীলা সম্বন্ধে বহু আলোচনা চিরদিন হইতেছে। আমরা এই পবিত্র লীলা বুঝিবার সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনধিকারী। তবে অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বিনয়গর্ভ বচন ও স্তব দ্বারা তুষ্ট হইয়া "কখন বাহু প্রসারণ, কখন আলিঙ্গন, কখন করস্পর্শ, কখন অলক স্পর্শ, কখন উরু স্পর্শ, নীবী বন্ধন মোচন, ও স্তনের আলভন, কখন মিষ্টালাপ, প্রেম দৃষ্টি-পাত ও হাস্য দ্বারা গোপীদিগের কামোদ্দীপন করিয়া তাঁহাদিগকে রমণ করাইলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ মায়া বিস্তার পূর্ব্বক গোপীদিগের সম সংখ্যক হইয়া পরস্পরের অলক্ষ্যে তাঁহাদিগকে রমণানন্দ দান করিলেন।

তাঁহার শ্রীমুখের বাণী—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম।" তিনি তাঁহার এই বাক্যের সফলতা সম্পাদন জন্য যুবার ন্যায় আকৃতি ধারণ করিয়াই যুবতিগণকে চরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন। এই কাম ক্রীড়া আত্মায় আত্মায় বা মনে মনে হয় নাই। স্থূল ভাবেই হইয়াছিল। আর ইহার পরই গোপীকাগণ গর্ব্বিতা হইয়া রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া ছিলেন। আরও ভাগবতকার বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে চরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন কিন্তু নিজে অবরুদ্ধ সৌরত ছিলেন।

এই রাসলীলায় কামগন্ধ নাই। এই যে গোপীর প্রেম ইহা জগতের অপর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হইবে না। সাধারণ জীবে এই প্রেম উপলব্ধি করিতে পারে না। এই প্রেমের সাক্ষী দিয়া গিয়াছেন আমাদের মহাপ্রভু। তিনি যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন সেই পরম পবিত্র গম্ভীরা-লীলা ধারণার শক্তিই বা কাহার আছে? তিনি যে একাধারে রাধাকৃষ্ণ।

আর একটী কথা আমরা ভাবিতে চেষ্টা করিব। শ্রীভগবান জগৎপতি। তিনি স্ত্রীলোক মাত্রেরই ত পতি বটেনই। অধিকন্তু স্ত্রীলোকের পতিরও পতি। তিনি ভিন্ন জগতে ত আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই। জীবের চরম

কামনা গোপী হওয়া, তাঁহাকে পতি ভাবে পাওয়া, তাঁহার সহিত রমণ সুখ আস্বাদন করা। কত কোটি বৎসর তপস্যার ফলে জীব ব্রজের গোপী হইতে পারে। আর জীব তখনই একমাত্র পূর্ণকাম হয়। ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা।

# ব্যাকুলতা ও আক্ষেপ

পবিত্র প্রেমের তরী যতনে পাইয়ে।
বিহারিতে তদুপরি যাইনু ধাইয়ে॥
অসার সংসার রূপ তটিনীর জলে।
আরম্ভ করিনু খেলা অতি কুতূহলে॥
না হ'তে খেলার শেষ না মিটিতে সাধ।
কি জানি কি পাপে আজি ঘটিল প্রমাদ॥
উঠিল যে কাল ঝড় আক্রমি গগন।
মাঝখানে তরিখানি হইল মগন॥
হাবুডুবু খেয়ে মরি কুল নাহি ঠিক॥
ধিক্ মোর ছার প্রাণে ধিক্ শতধিক্॥

ওহে সংসার পথশ্রান্ত পথিক! কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হতাশ প্রাণে— উদাস মনে এই সংসারের অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছ, তাহা কি বলিতে পার? তোমার এই জীবন ব্যাপী চলনের শেষ কোথায়, কখন, কি প্রকারে হইবে তাহা কি জানিতে পারিয়াছ? কোন মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য স্ব ইচ্ছায় যাইতেছ, না কোন শক্তিশালী বিরাট পুরুষের হস্ত নিক্ষিপ্ত গোলার ন্যায় উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া সবেগে ধাবিত হইতেছ? আজ আমিও তোমার ন্যায় এই সংসার পথের পথিক! আমিও শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া ঐ অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছি। কিন্তু আর চলিবার ক্ষমতা নাই। এই অজানা পথে হাঁটিতে হাঁটিতে পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। এই সীমাহীন পথে চলিতে চলি'ত পথ হারাইয়া আরও অধিকতর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর চলিবার তিল মাত্র সামর্থ্য নাই। ভাই! সেইজন্য তোমায় কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পথভ্রান্ত শ্রান্ত পথিককে কর্ম্মজীবনের সুগম পথটি দেখাইয়া দিবে কি? ভাই! বলিয়া দিতে পার কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে শান্তি পাইব!

আধার গগন আঁধার জীবন
আঁধার সনে বিজলী খেলে।
ভ্রমিয়ে বেড়াই শান্তি নাহি পাই
ভাসি শুধু নয়নের জলে॥
আর কতকাল এমন করিয়ে পাগলের মত বেড়াব ভ্রমিয়ে
শান্তি! শান্তি! শান্তি শুধু চাই
অন্য বাসনা নাহিক আমার।

তাই, আমি ধর্ম্ম জানি না, কর্ম্ম জানি না, সাধনা জানি না, ভজন পূজন জপ তপ কিছুই জানি না। শান্তির পিপাসা দূর করিবার আশায় মরীচিকা দর্শনে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু কই আশা মিটিল না, পিপাসা দূর হইল না। কেবল মাত্র স্বপ্ন পথের পথিক হইয়াই চলিতেছি। জানি না আমার এ চলনের কোথায়—কখন—কি প্রকারে শেষ হইবে? ভাই, তুমি কি বলিতে পার আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতার বাঁধন আমার উপর আছে কি? আমার জন্য একদিনের তরেও কাহারো প্রাণ কাঁদিয়াছে কি? যদি কাঁদিয়া থাকে তবে কেন আসিয়া দুই দিন বাদে চলিয়া যায়! কই অপেক্ষা করিতে বলিলেও ত অপেক্ষা করে না। কই সুখের কথা ত দূরের কথা; মুখ পানে একবার চাহিয়াওত দেখে না। দুই দিনের জন্য আসিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া দুটা কথা বলিতে না বলিতে হৃদয়ের অমিয় ধারায় স্নাত হইতে না হইতে আধ ঘুম ভাঙ্গা চোখে এক বার তাকাইল আর চলিয়া গেল। আমার আশা শূন্য হইল। আমি যে একা সেই একা। উত্তাল তরঙ্গ রাশি ভৈরব গর্জ্জন করিয়া ভবার্ণবের একটানা স্রোতে যেমন ভাসিয়া যায়, যেমন তরঙ্গরাশি হিল্লোলে ভাসিয়া স্থানান্তরে দুর্ব্বার প্রবাহে চলিয়া যায় তেমনি আমি সুখ দুঃখ মিশ্রিত অনির্দ্দিষ্ট জীবন লইয়া কাল-স্রোতে ভাসিয়া চলেছি। পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির মায়ার বাঁধনে আজ বাঁধা পড়িয়া, অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া সংসারে কতই না কুকার্য্য করিতেছি। কিন্তু হায়রে অবোধ মন! দিনান্তে একটিবারও নবদ্বীপ চন্দ্র পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পদচিন্তা করিবার তোমার সময় হইতেছে না। সেই পরমারাধ্য দেবের পদচিন্তা ভুলিয়া, তৃণের ন্যায় সংসারের একটানা স্রোতে ভাসিয়া চলেছি। এ পথের শেষ কোথায়? কতদূর যাইলে হইবে তাহাও জানিতে পারিতেছি না। মায়াজালে বদ্ধ হইয়া আর কতকাল এরূপ ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইব তাহাও জানি না। সংসার সাগরের পর পারে আর কোন শান্তিপূর্ণ দেশ আছে কিনা তাহা জানি না। আমার মত হতভাগ্য বোধ হয় জগতে আর কেহই নাই। হায় প্রভু গৌরাঙ্গ দেব! আমার জীবনের সমস্ত অবসাদ দূর করিয়া শান্তি বারি প্রদানে হৃদয়ের মলিনতা দূর করিয়া দিতে পারিবে না কি? জানি না মনের এ অবসাদ কবে দূর হইবে! কবে এ মায়াজাল ছিন্ন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পাদপদ্ম ধ্যানে সমর্থ হইব। জনমে জনমে এইরূপ ভাবেই কি চলিতে হইবে! শান্তি সুখ কি আমার ভাগ্যে নাই?

ওহে শ্রান্ত পথিক! বুঝিয়াছি তুমিও আমার মত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া জাল বদ্ধ মীনের ন্যায় চারিদিকে বৃথা ছুটিয়া বেড়াইতেছ! বাল্যে জনক জননী প্রভৃতি প্রিয় জনের স্নেহ তোমায় অজস্রধারে আপ্লাবিত করিয়াছে, তুমি আকণ্ঠ সে পীযুষ প্রতিম স্নেহরস পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পার নাই; কারণ যখনই সুখ শৈশবের শীতল ছায়া তোমার মস্তক হইতে অপসৃত হইয়াছে তখনই তুমি নব

তৃষ্ণায় তৃষিত হইয়া সুখ সম্পদের মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়াছ। রমণীর রূপ সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া; কত হাবুডুবু খাইয়াছ। প্রণয়িনীর প্রেম সুধাপানে পিপাসানল নির্ব্বাপিত করিবার কত প্রয়াস পাইয়াছ, কিন্তু তাহা পারিয়াছ কি ? বোধ হয় পার নাই, বরং সে পিপাসা নিবৃত্তি না হইয়া উত্তরোত্তর শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি হইয়া তোমার জীবনকে আরও অধিক জ্বালাময় করিয়া তুলিয়াছে। ওহে পথিক ! তুমি আমি কতদূর ভ্রান্ত তাহা একবার মনে মনে বুঝিয়া দেখ। এ সংসারে যত্ন করিয়া যে ঘরই বাঁধ না কেন নিয়তি সময়ের অপেক্ষা না করিয়া, বিষাদ ঝটিকা তুলাইয়া সাধে বাদ সাধিয়া সেই খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া নিজের কৃতিত্ব অক্ষুন্ন রাখিবেই রাখিবে। আমরা তখন হাহা করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইব। ইহা ভিন্ন আমাদের আর কি ক্ষমতা আছে। এ ক্রন্দন কি শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পদ চিন্তা ক্রন্দনে পরিণত হইতে পারে না ? এ রাক্ষসী ক্ষুধার কি অবসান নাই ? এই সংসারের জ্বালাময় অনির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কি জীবনে কোন সার্থকতা পাওয়া যাইবে না ? হে পথিক ! তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি কোন্ পথটি সুগম। কোন্ পথে যাইলে প্রাণে শান্তি পাইব ! আমার সারাজীবন সঞ্চিত পাপের পসরা মাথায় করিয়া আর যে চলিতে পারিতেছি না। হে দয়াময় হরি ! দয়া করিয়া আমার মাথার বোঝা নামাইয়া দেও ! সংসারের সুগম পথটি দেখাইয়া দেও। মনের মলিনতা দূর করিয়া হৃদয়ে বল দেও !

হে শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র ! শোক তাপ পাপ ভারে আর যেন ক্লান্ত হইয়া না পড়ি। হে প্রভু গৌরাঙ্গ দেব ! সংসারের পঙ্কিলগর্ত্ত হইতে আমায় টানিয়া তুলিয়া লও। লোক মুখে শুনিয়াছি দয়াল নিতাই কৃপা পরবশ হইয়া পাপী জনকে সুগম পথের সন্ধান বলিয়া দেন, শুনেছি নবদ্বীপ চন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ধ্যান করিলে সংসারের দুর্গম পথ সুগম হয়। এস ভাই প্রাণ ভরে কাতর প্রাণে কায়মন বাক্যে গৌর নিতাইকে ডাকি। তাঁহাদের চরণে আশ্রয় লই, তাহা হইলে আমরা অতি সহজে পথ চলিতে পারিব। পথ চলা সার্থক হইবে। সত্বর নির্দ্দিষ্ট পথে উপস্থিত হইতে পারিব। এস ভাই গৌর নিতাইএর নাম করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদি। আমাদের ক্রন্দন দেখিলে তিনি কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনিও কাঁদিবেন। তাই, সেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান গৌরাঙ্গ দেবের একবিন্দু করুণা পাইলেই আমাদের শ্রান্ত, ক্লান্ত, জ্বালাময়, ভারবাহী জীবনে নব ভাবের সঞ্চার হইবে। তখন আমরা অনায়াসে এই দুর্গম ভয়ঙ্কর পথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুগম পথে উপস্থিত হইতে পারিব। জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীচণ্ডীচরণ রায়।
১১ বেড়াপুকুর রোড, খিদিরপুর।

২৩শ বর্ষ সমাপ্ত

# পঞ্চগীতা

[ পাণ্ডব-গীতা, তুলসী-গীতা, বৈষ্ণব-গীতা,
সপ্তশ্লোকীগীতা ও গুরু-গীতা ]

সরল বঙ্গানুবাদ সহ

ভক্তি-সম্পাদক

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত

প্রাপ্তিস্থান

মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, "মানসী প্রেস" হইতে
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য—।৵৹ ছয় আনা

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, "মানসী প্রেস" হইতে
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

# ভূমিকা

নিত্যপাঠ্য পাণ্ডব-গীতা খানি ছাপিবার জন্য আয়োজন করিতেছিলাম এমন সময় ঘটনাক্রমে গুরু-গীতা ও তুলসী-গীতা দু'খানি হস্তগত হয়, ক্রমে বৈষ্ণব গীতাও পাইলাম, কাজেই চারিখানির সঙ্গে আর একখানি দিয়া পঞ্চ গীতা ছাপিলাম। এই যে আর একখানি এখানি সপ্তশ্লোকী গীতা। এইখানি ছাপিতে একটু বেগ পাইতে হইয়াছে, কারণ মুদ্রিত যে কয়খানি সপ্তশ্লোকী-গীতা পাইয়াছিলাম তাহা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিল নাই। শেষে পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের সংস্করণের পাঠ মূলে রাখিয়া অন্যগুলি পাঠান্তর হিসাবে ফুটনোটে দিয়াছিলাম।

পয়সা খরচ করিয়া ছাপিলাম, দামও যে খুব বেশী হইল তাহাও নহে খরচা হিসাবে কমই হইল বলিয়া মনে হয়, এখন ক্রেতা পাওয়া না পাওয়া তাঁর ইচ্ছা। গীতা কয়খানি নিত্যপাঠ্যরূপে বহুভক্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইভাবের ভক্তগণের আগ্রহ কিছু কিছু জানিতে পারিয়াই ছাপিয়াছি। ভক্তগণ পাঠে আনন্দ পাইলেই আমারও আনন্দের সীমা থাকিবে না। আর অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম সার্থক মনে করিব ইতি—

মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"
শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা
১৩৩১

বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীদীনেশচন্দ্র শর্ম্মা

## —সূচী—


| | |
|---|---|
| পাণ্ডব-গীতা | ১ |
| তুলসী-গীতা | ২৮ |
| বৈষ্ণব-গীতা | ৩৪ |
| সপ্তশ্লোকী-গীতা | ৩৬ |
| গুরু-গীতা | ৪০ |

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

# পঞ্চগীতা।

---

## [ ১—পাণ্ডব গীতা ]

মঙ্গলাচরণম্।

"ওঁনমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্ত হেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

"শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং স্মেরবক্ত্রম্॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয়ে ত্বং মনোমে॥"

---

অনুবাদ

এই পাণ্ডবগীতা গ্রন্থখানির শ্লোক সমূহ আলোচনা করিলে ইহা যে, ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের স্তবাদি হইতে কোনও ভাগবতোত্তম কর্তৃক জনসাধারণের উপকারার্থে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। সংগ্রহকর্ত্তা মধুমক্ষিকার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পুষ্প হইতে সার সংগ্রহ করিয়া একাধারে রক্ষা করিয়া সাধারণের যথার্থই বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ নানাভাবে বলিয়াছেন—"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেনপরিজায়তে।" অর্থাৎ যে ভক্তির বলে ভগবান ভক্তের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া চিরদিনের জন্য কেনা হইয়া থাকেন, সেই ভক্তি ভক্তগণের সঙ্গদ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। তাই সর্ব্বপ্রথমে পাণ্ডবরাজ পুণ্য-শ্লোক ভাগবতগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছেন।

পাণ্ডব উবাচ

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-
ব্যাসাম্বরীষ-শুকশৌনক-ভীষ্ম-দালভ্যান্।
রুক্মাঙ্গদার্জ্জুন-বশিষ্ঠ-বিভীষণাদীন্
পুণ্যানিমান্ পরম ভাগবতান্ স্মরামি ॥১॥

লোমহর্ষণ উবাচ

ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতি যুধিষ্ঠির কীর্ত্তনেন
পাপং প্রণাশ্যতি বৃকোদর কীর্ত্তনেন।
শত্রুর্বিনশ্যতি ধনঞ্জয় কীর্ত্তনেন
মাদ্রীসুতৌ কথয়তাং ন ভবন্তি রোগাঃ ॥২॥

ব্রহ্মোবাচ

যে মানবা বিগতরাগপরাবরজ্ঞা
নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।

অনুবাদ

পাণ্ডবরাজ্ বলিলেন—আমার হৃদয় নিহিত দুর্ব্বাসনাবাশী দূর হইয়া যাহাতে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় তন্নিমিত্ত আমি ভগবদ্ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদ, নারদ, পরাশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক, শৌনক, ভীষ্ম, দালভ্য, রুক্ম, অঙ্গদ, অর্জ্জুন, বশিষ্ঠ, বিভীষণ প্রভৃতি ভক্তগণের নাম স্মরণ করিতেছি। ইঁহারা সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শক্তি সঞ্চার করুন ॥ ১॥

ভক্ত-নাম কীর্ত্তনের দ্বারা যে, রোগ, শোক, পাপ, তাপাদি বিনষ্ট হইয়া পুণ্য বৃদ্ধি হয় তাহা দেখাইয়া লোমহর্ষণ ঋষি বলিতেছেন—ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠিরের বিষয় কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। মহাবীর ভীমসেনের নামকীর্ত্তনে পাপক্ষয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সখা মহাত্মা অর্জ্জুনের নাম কীর্ত্তনে শত্রু অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিঘ্ন সকল দূর হয়। মাদ্রী-নন্দন নকুল ও সহদেবের নাম-কীর্ত্তনে দ্বারা যাবতীয় রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে । ২ ॥

বেদকর্ত্তা লোক-পিতামহ কমল-যোনী ব্রহ্মা ভগবদ্ভজন ও ভজন পরায়ণ ভক্ত-গণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন—যে মানব নিরন্তর সর্ব্বদেব পূজ্য

ধ্যানেন তেন হত কিল্বিষ বেদনাস্তে
মাতুঃ পয়োধর-রসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥৩॥

ইন্দ্র উবাচ

নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্।
অনেক জন্মার্জ্জিত পাপ সঞ্চয়ং
হরত্যশেষং স্মরতাং সদৈব ॥৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ

মেঘশ্যামং পীত কৌষেয় বাসং
শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গম্।
সর্ব্বাত্মানং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং
বিষ্ণুং বন্দে সর্ব্ব লোকৈক নাথম্ ॥৫॥

অনুবাদ

শ্রীমন্নারায়ণকে স্মরণকরে সে ধ্যানবলে নিষ্পাপ ও বিষয়াশক্তি শূন্য হইয়া থাকে, এবং সদসৎ বিচার নিপুন ও ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ হয়। এমন কি কদাচ তাহাকে পাপের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। আর সাধারণ জীবের ন্যায় মাতৃস্তন্য পান অর্থাৎ কর্ম্ম ভোগার্থ পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। এক কথায় সে শ্রীভগবানের ভজন করিয়া নিত্যমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র ভঙ্গীক্রমে বলিতেছেন—নারায়ণ যেন জগতে সর্ব্বজন বিদিত একজন অতি প্রসিদ্ধ চোর। কারণ জীবের বহু জন্মজন্মার্জ্জিত পাপরাশী একবার মাত্র তাঁহার নাম স্মরণ মাত্রেই দূরহইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীহরির স্মরণ করিলে তিনি স্বয়ং-ই সেই নাম স্মরণকারীর যাবতীয় পাপতাপ দূরকরিয়া দিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীভগবানকে স্তব করিতে করিতে তাঁহার ভুবনমোহন নবজলধর রূপের ছটায় মোহিত হইয়া বলিতেছেন—আমি নবজলধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি, পীতবসনধারী শ্রীবৎসাঙ্ক অর্থাৎ রেখারূপে শ্রী (লক্ষ্মী) ও বৎস যাঁহার বক্ষস্থলে বিদ্যমান তাঁহাকে এবং গলদেশস্থিত কৌস্তুভমণির প্রভায় যাঁহার অঙ্গ সমধিক উজ্জ্বল সেই সর্ব্বজীব-জীবন কমলনয়ন নিখিল জগতের একমাত্র পতি শ্রীকৃষ্ণকে বার বার বন্দনা করি, তিনি আমার প্রতি সদয় হউন ॥ ৫ ॥

ভীমসেন উবাচ

জলৌঘমগ্না সচরাচরা ধরা বিষাণ কোট্যাখিল বিশ্বমূর্ত্তিনা।
সমুদ্ধৃতা যেন বরাহ মূর্ত্তিনা স মে স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ প্রসীদতু ॥৬॥

অর্জ্জুন উবাচ

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমচ্যুতং
বিভুং প্রভুং কারণভূতভাবিনম্।
ত্রৈলোক্য বিস্তার বিভাব ভাবিনং
হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতিং মহাত্মনাম্ ॥৭॥

নকুল উবাচ

যদি গমনমধস্তাৎ কর্ম্ম-পাশানুবন্ধাৎ
যদি চ কুলবিহীনে জন্ম মে পক্ষী কীটে।

---

অনুবাদ

শ্রীভগবানের অতুলনীয় বলবীর্য্য স্মরণে নিজ বলবীর্য্য যে তাহার নিকট কিছুই নয় ইহা বুঝিয়া সমধিক বিস্ময়ের সহিত ভীমসেন বলিতেছেন—যিনি চরাচর বিশ্বের যাবতীয় প্রাণিব সহিত প্রলয়-সমুদ্র-জলমগ্না এই পৃথিবীকে বরাহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দন্তাগ্র ভাগ দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানকে আমি বন্দনা করি, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান যাঁহার রথের সারথী হইয়া জীবের মঙ্গল কামনায় সর্ব্বশাস্ত্রময় অপূর্ব্ব ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ছিলেন এবং যিনি সেই গীতা শ্রবণে সকল প্রকার দৌর্ব্বল্য ভুলিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত হইয়াছিলেন সেই ভগবৎ সখা অর্জ্জুন বলিতেছেন—যাঁহার মহিমা অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা শেষ করা যায় না, যিনি অব্যক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম কারণরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অথচ প্রাকৃতিক চক্ষুর অগোচর যাঁহার রূপ-গুণের অন্ত নাই, যাঁহার শক্তির কখনও ক্ষয় হয় না, যিনি বিশ্বব্যাপি ও সকলের প্রভু, যিনি সর্ব্ব কারণ-কারণ, যিনি নিখিল প্রাণীর উদ্ধার কর্ত্তা, যাঁহার চিন্তনে প্রকৃত মঙ্গল হয় সেই ভক্তগণের একমাত্র গতি স্বরূপ শ্রীহরির আমি শরণাপন্ন হইলাম। সেই আশ্রিতবৎসল হরি আমার প্রতি সদয় হউন ॥ ৭ ॥

কৃমিশত মপিগত্বা- ত্বদগতাভ্যন্তরাত্মা
ভবতু হৃদয় সংস্থা কেশবে ভক্তিরেকা ॥৮॥

সহদেব উবাচ

যস্য যজ্ঞ বরাহস্য বিষ্ণোরতুল তেজসঃ।
প্রণামং যেঽপি কুর্ব্বন্তি তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ ॥৯॥

কুন্ত্যুবাচ

সকর্ম্ম ফল নির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দ্দৃঢ়াস্তু মে ॥১০॥

অনুবাদ

শ্রীভগবানের ভাবে বিভোর হওয়াই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইটী দেখাইয়া নকুল বলিতেছেন—আমার নিজকৃত কর্ম্মানুসারে যদি আমার অধোগতি হয়, যদি হীন বংশেও জন্মগ্রহণ করি, অথবা পশু কিম্বা পক্ষী যোনী প্রাপ্ত হই, এমন কি যদি শত শত বার আমি কৃমিকীটও হই তাহাতেও ক্ষতি নাই, আমার মন যেন শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভাবিত থাকে। সর্ব্ব-জীব-হৃদয়বিহারী শ্রীহরির প্রতি আমার নিষ্কাম ভক্তি অর্থাৎ পরম প্রেম হউক ইহাই তাঁহার নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা ॥ ৮ ॥

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরি ভক্তের সম্মানেই প্রীত থাকেন। তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

"আমারে ছাড়িয়া যেবা ভক্তেদেয় মান।
আমি তার হই সে হয় আমার প্রাণ ॥
ভক্তে অপমানি যদি মোরে দেয় মান।
( তাতে ) নহি তুষ্ট, অম্বরীষ তাহাতে প্রমাণ ॥"

এই ভাব হৃদয়ে লইয়া সহদেব বলিতেছেন—যে সকল মহাভাগ্যধর ভক্তগণ অতুলনীয় শক্তিশালী যজ্ঞ বরাহরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করেন, আমি শ্রীহরির কৃপালাভের নিমিত্ত সেই সকল ভক্তগণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি, তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাকে হরি-প্রেম প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

মহা ভাগ্যবতী কুন্তীদেবী বলিতেছেন—আমি নিজ কর্ম্মফলে দেহান্তে যে যে যোনী প্রাপ্ত হই না কেন অর্থাৎ যেখানেই আমার জন্ম হউক না কেন, হে

মাদ্র্যুবাচ

কৃষ্ণেরতা কৃষ্ণমনুস্মরন্তি রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে মৃত্যুকালে প্রবিশন্তি কৃষ্ণং হবির্যথা মন্ত্রহুতং হুতাশনম্॥১১॥

দ্রুপদ উবাচ

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃ পিশাচ মনুজেষ্বপি যত্র তত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ
তয্যেব ভক্তিরচলা ব্যভিচারিণী চ॥১২॥

সুভদ্রোবাচ

একোহি কৃষ্ণস্য সকৃৎ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণ প্রণামী ন পুনর্ভবায়॥১৩॥

---

অনুবাদ

হৃষীকেশ! সেই সেই জন্মেই যেন তোমাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে। তোমার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা॥ ১০॥

নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যানই জীবের কৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রধান উপায় ইহা স্থির জানিয়া মহাভাগা মাদ্রী বলিতেছেন—যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করেন, যাঁহারা দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণেই রত থাকেন তাঁহারা মন্ত্র দ্বারা প্রদত্ত ঘৃত যেমন অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া অগ্নিময় হইয়া যায় সেইরূপ মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণেতেই প্রবেশ করেন অর্থাৎ কৃষ্ণময় হইয়া যান॥ ১১॥

যে কোন জন্মেই হউক ভগবদ্ভক্তিই জীবের প্রধান লাভ ইহা স্থির জানিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় দ্রুপদ বলিতেছেন—হে কেশব! কীট, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, কিম্বা রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য যে কোন কুলে জন্ম হউক না তাহাতে ক্ষতি নাই পরন্তু তোমাতে যেন নিশ্চলা ঐকান্তিকী ভক্তি থাকে ইহাই আমার প্রার্থনা॥ ১২॥

অর্জ্জুন-পত্নী পতিপরায়ণা ভক্তিমতী সুভদ্রা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যদি ভক্তিপূর্ব্বক একবারও প্রণাম করে তবে সেই একবার প্রণামের ফলই সুন্দর রূপে দশবার অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। কারণ অশ্বমেধকারী

অভিমন্যুরুবাচ

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গপাণে।
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ
গোবিন্দ গোবিন্দ নমোনমস্তে ॥১৪॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ

শ্রীরাম নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
শ্রীকেশবানন্ত নৃসিংহ বিষ্ণো মাং ত্রাহি সংসার ভুজঙ্গদষ্টং ॥১৫॥

সাত্যকিরুবাচ

অপ্রমেয় হরে বিষ্ণো কৃষ্ণ দামোদরাচ্যুত।
গোবিন্দানন্দ সর্ব্বেশ বাসুদেব নমোস্তুতে ॥১৬॥

---

অনুবাদ

পুনর্ব্বার কাম্য ফল ভোগ নিমিত্ত মায়ামোহে পতিত হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু কৃষ্ণকে প্রণামকারী ভক্ত কখনও পুনর্জ্জন্ম ভোগ করে না ॥ ১৩॥

অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু শ্রীগোবিন্দের ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—হে লীলাময় শ্রীগোবিন্দ! হে হৃদয়বিহারী শ্রীহরে! হে অসুরান্তক শ্রীমুরারে! হে ভুবনপালক শ্রীগোবিন্দ! হে শ্রীচক্রপাণে! হে পরমানন্দদায়িন্ শ্রীগোবিন্দ! হে ভব-ভয়হারিন্ শ্রীমুকুন্দ! হে পাপহারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

সংসার সুখ প্রকৃত সুখ নয়, বিষময় যন্ত্রণাপ্রদ জানিয়া তাহা দূর করিবার মানসে ব্যাকুল হৃদয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিতেছেন—হে রাম! হে সর্ব্বাশ্রয় নারায়ণ! হে সর্ব্বময় বাসুদেব! হে আনন্দদায়িন্ শ্রীগোবিন্দ! হে নিত্য-সত্য-বৈকুণ্ঠ! হে আনন্দ-প্রদ মুকুন্দ! হে পাপঘ্নিন্ শ্রীহরি! হে কেশব! হে অনন্ত! হে নৃসিংহ! হে সর্ব্বময় বিভো! আমি সংসার রূপ কালসর্প-বিষে অতিশয় কাতর, তুমি দয়া করিয়া আমাকে ত্রাণ কর ॥ ১৫ ॥

সাত্যকি বলিতেছেন—হে অনন্ত! হে হরে! হে বিভো! হে কৃষ্ণ! হে দামোদর! হে অচ্যুত! হে গোবিন্দ! হে আনন্দময়! হে সর্ব্বেশ্বর!

উদ্ধব উবাচ

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেঽন্য দেবমুপাসতে।
তৃষিতা জাহ্নবীতীরে কূপং বাঞ্ছন্তি দুর্ভগাঃ ॥১৭॥

ধৌম্য উবাচ

অপাং সমীপে শয়নাশনে গৃহে
দিব, চ রাত্রৌ চ পথা চ গচ্ছতা।
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া
জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু ॥১৮॥

অনুবাদ

হে বাসুদেব! আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর দাও যেন তোমাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥ ১৬ ॥

সকল উপাসনা হইতে যে বিষ্ণুর উপাসনা মোক্ষপ্রদ ও শ্রেষ্ঠ তাহা বর্ণন পূর্ব্বক পরম ভক্ত উদ্ধব মহাশয় বলিতেছেন—সর্ব্বময়, সর্ব্বাশ্রয়, শ্রীভগবান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কামনাবশতঃ অন্যদেবের উপাসনায় রত থাকে, তাহারা গঙ্গাতীরে বাস করিয়া পিপাসায় কাতর হইয়া যেমন কূপ বাঞ্ছাকরে তদ্রূপ। অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ হরির আরাধনা না করিয়া যাহারা বন্ধনহেতু ভূত-ভোগাদির কামনায় অন্য দেবোপাসনায় রত তাহারা মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দলাভে বঞ্চিত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥১৭॥

ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার মানসে ভগবান শ্রীহরিতে সর্ব্ব কর্ম্মফল অর্পণ পূর্ব্বক পাণ্ডব পুরোহিত ধৌম্য প্রার্থনা করিতেছেন—আমি জলের নিকট অর্থাৎ তীর্থ স্নানাদি দ্বারা বা শয়ন কালে কিম্বা ভোজন করিবার সময়, দিবসে বা রাত্রে, নিজ গৃহে থাকিয়া কিম্বা পথে গমন করিতে করিতে যদি কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি সেই পুণ্যফল শ্রীভগবানেই অর্পণ করিলাম, ইহার বিনিময়ে আমি তাঁহার নিকট হইতে অন্য কোন ফল কামনা করি না, কেবল এইমাত্র প্রার্থনা যে, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকুন ॥ ১৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা
ঘোরেষু ব্যাঘ্রাদিষু বর্ত্তমানাঃ।
সঙ্কীর্ত্ত্য নারায়ণ শব্দ মাত্রং
বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনো ভবন্তি ॥১৯॥

অক্রূর উবাচ

অহন্তু নারায়ণ-দাস-দাস
দাসস্য দাসস্য চ দাসদাসঃ।
অন্যান্য ঈশো জগতো নরাণাং
তস্মাদহং চান্যতরোঽস্মি লোকে ॥২০॥

বিদুর উবাচ

বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ শান্তাস্তদ্ গতমানসাঃ।
তেষাং দাসস্য দাসোঽহং ভবেয়ং জন্ম জন্মনি ॥২১॥

অনুবাদ

শ্রীবেদব্যাসের কৃপায় ত্রিকালজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র-সখা সঞ্জয়, শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনের ফল বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—রোগাদিতে অতিশয় কাতর কিংবা অন্য কোনও কারণে অতিশয় বিষণ্ণ বা শিথিল অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্যে অক্ষম, জড়তা প্রাপ্ত কিম্বা ব্যাঘ্রাদির ভয়ে অতিশয় ভীত, এমন কি যে কোনও রকম দুঃখ দুর্দ্দশাপন্ন হউক না কেন, শ্রীনারায়ণের নামকীর্ত্তনেই সমস্ত দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইয়া জীব সুখী হয়। ইহাতে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥

দাস্যভাবে ভগবানের ভজনকারী পরম ভক্ত অক্রূর বলিতেছেন—আমি শ্রীমন্নারায়ণের দাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস হইতে বাসনা করি, এই জগতে অনেকের অনেক উপাস্য দেব আছেন, আমি সে সকল পরিহার পূর্ব্বক কেবল মাত্র শ্রীহরিরই শরণাগত হইলাম ॥ ২০ ॥

যাঁহারা শ্রীহরির ভক্ত তাঁহারাই ধন্য ও সার্থক জন্মা, সেই ভক্তজনের সঙ্গেই শ্রীহরির প্রেম পাওয়া যায়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তেন পরি জায়তে।" ইহা স্মরণ করিয়াই পরম ভক্ত বিদুর মহাশয় বলিতেছেন—যাঁহারা

ভীষ্ম উবাচ।

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগত বৎসল ॥২২॥

দ্রোণাচার্য্য উবাচ

যে যে হতাশ্চক্রধরেণ দৈত্যা
স্ত্রৈলোক্যনাথেন জনার্দ্দনেন।
তে তে গতাস্তন্নিলয়ং সমস্তাঃ
ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ ॥২৪॥

কৃপাচার্য্য উবাচ

মজ্জন্মনা ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎ প্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।

---

অনুবাদ

শ্রীভগবানে ভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক শান্তি লাভ করিয়াছেন এবং ভক্তি প্রভাবে যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভগবদ্ গতচিত্তে ভগবানের ভজনা করেন, আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁহাদিগেরই দাসানুদাস হইতে পারি। ২১ ॥

শর-শয্যাগত কৃষ্ণ-গতপ্রাণ পরম ভাগবত ভীষ্মদেব বলিতেছেন— হে শরণাগত বৎসল পতিত পাবন হরে! সময়ের গতি বিপরীত হইল, আমাদের আর সে শক্তি নাই। আমার যত বন্ধু-বান্ধব ছিল সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল কেহই রহিলনা, অন্তিমে তুমি ভিন্ন আর জীবের উদ্ধার কর্ত্তা কেহ নাই জানিয়া আমি তোমার শরণ লইলাম, তুমি দয়া করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ২২ ॥

ভগবানের মহিমায় বিস্মিত হইয়া দ্রোণাচার্য্য বলিতেছেন হায়। ভগবানের লীলা কি বিচিত্র, চক্রধারী ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীজনার্দ্দন সমর ভূমিতে যাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন তাহারা সকলেই ভগবানের পরমধাম প্রাপ্ত হইল। কি আশ্চর্য্য যে, ভগবানের ক্রোধও বরের তুল্য অর্থাৎ তপস্যা করিয়া ভগবৎ প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক জীব পরমধামে গমন করে ইহাই শোনাছিল এক্ষেত্রে কিন্তু তাহার বিপরীত হইল। ভগবান ক্রোধ করিয়া যাহাদিগকে বিনাশ করিলেন, তাহারাও অনায়াসে সেই সাধকোচিত উচ্চগতি পরমধাম প্রাপ্ত হইল ॥ ২৩ ॥

ত্বদ্‌ ভৃত্য ভৃত্য পরিচারক ভৃত্য ভৃত্য
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ ॥২৪।

অশ্বত্থামোবাচ

গোবিন্দ কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব
বিশ্বেশ বিশ্ব মধুসূদন বিশ্বনাথ !
শ্রীপদ্মনাভ পুরুষোত্তম পুষ্করাক্ষ
নারায়ণাচ্যুত নৃসিংহ নমো নমস্তে ॥২৫॥

কর্ণ উবাচ

নান্যং বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যং স্মরামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
ভক্ত্যা ত্বদীয়চরণাম্বুজমন্তরেণ
শ্রীশ্রীনিবাস পুরুষোত্তম দেহি দাস্যম্‌ ॥২৬॥

অনুবাদ

অতি দীনভাবে কুরুপক্ষীয় যুদ্ধ নিপুণ মহাবীর কৃপাচার্য্য প্রার্থনা করিতেছেন—হে মধুকৈটভারে! তুমি কৃপা করিয়া যদি আমাকে তোমার দাসের যে দাস তাহার যে পরিচারক তাহারও দাসের দাসানুদাস বলিয়া গ্রহণ কর, তবেই আমার এই দুর্ল্লভ মানব জন্ম সার্থক মনে করি। আর ইহাই আমার কায়মনোপ্রাণে একমাত্র প্রার্থনীয় ॥ ২৪ ॥

অশ্বত্থামা ভগবানের চতুর্দ্দশ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক বলিতেছেন- হে গোবিন্দ! হে কেশব! হে সর্ব্বজীব-পালক দুষ্টদমনকারিন্‌ জনার্দ্দন! হে সর্ব্বময় বাসুদেব। হে বিশ্বনাথ। হে বিশ্বময়। হে মধুসূদন। হে জগন্নাথ! হে পদ্মনাভ! হে পুরুষোত্তম বিষ্ণো! হে পদ্মলোচন। হে নারায়ণ। হে অবিনাশিন্‌ সত্য স্বরূপ! হে নৃসিংহ! তোমাকে বার বার নমস্কার করি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

ভগবানকেই সর্ব্বোত্তম জানিয়া ও ভগবানের সাধন ভজন ভিন্ন অন্য সকল কার্য্য জীবের অপ্রার্থনীয় ইহা বুঝিতে পারিয়া মহামতি কর্ণ বলিতেছেন—হে শ্রীনিবাস! (লক্ষ্মীপতে) হে পুরুষোত্তম! আমি একান্ত ভক্তির সহিত তোমার

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

নমোনমঃ কারণ বামনায় নারায়ণায়ামিত বিক্রমায়।
শ্রীশার্ঙ্গচক্রাব্জ গদাধরায় নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ৭॥

গান্ধার্য্যুবাচ

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ॥২৭॥

দ্রৌপদ্যুবাচ

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোস্তুতে ॥২৯॥

অনুবাদ

পাদপদ্ম সেবা ব্যতীত অন্য কিছু যেন করি না বা তোমার লীলা কথা ভিন্ন অন্য কিছু যেন বলি না, অন্য কিছু যেন শ্রবণ করি না, তোমাকে ভিন্ন অন্য কিছু যেন ভাবিনা বা স্মরণ করি না, তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকে ও যেন ভজনা করি না, তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন অন্য কিছু যেন আশ্রয় করি না। এই বর দাও যেন তোমার দাসত্ব ভাবেই আমি সর্ব্বদা ভাবিত থাকি ॥ ২৬ ॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ব্যাপারে বহু বহু জীব নিহত হওয়ায় নানাবিধ শোকতাপে অত্যন্ত ব্যাকুলিত চিত্ত ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন—আমি সেই সর্ব্ব-কারণ-কারণ বামন রূপধারী, অসীম পরাক্রমশালী,শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধারী, সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ শ্রীমন্নারায়ণকে বার বার নমস্কার করি। আমার এই প্রণাম যেন তাঁহার সর্ব্বপ্রকার প্রসন্নতার কারণ হয় ॥ ২° ॥

ভগবান সর্ব্বজীবময় ইহা অনুভব করিয়া গান্ধারী বলিতেছেন হে ভগবন্! হে দেবাধিদেব! তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই আমার ধন, অধিক আর কি বলিব, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, সবই তুমি ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণগতপ্রাণা দ্রৌপদী বলিতেছেন - হেসর্ব্বযজ্ঞেশ্বর! তোমার আদি অন্ত নাই, তুমি নিত্য বস্তু। হে গোবিন্দ! হে শ্রীপতে! হে অনন্ত। হে কেশব হে হৃদয়ানন্দদায়িন্ কৃষ্ণ! হে সর্ব্বময় বিষ্ণো। হে সর্ব্বময় বাসুদেব। হে ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীহরে! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৯ ॥

জয়দ্রথ উবাচ

নমঃ কৃষ্ণায় দেবায় ব্রহ্মণেঽনন্ত মূর্ত্তয়ে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণংগতঃ॥ ৩০॥

বিকর্ণ উবাচ

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ।
নন্দগোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥৩১॥

সোমদত্ত উবাচ

নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বভাবন।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ॥৩২॥

বিরাট উবাচ

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণহিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥৩৩॥

অনুবাদ

জয়দ্রথ বলিতেছেন—হে দেব! আমি তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি যোগস্বরূপ, তুমি যোগেশ্বর, তুমি বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও পালনের জন্য নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাভাবে লীলা কর। তুমি পূর্ণব্রহ্ম, তুমি দেবাধিদেব ও পাপহারী শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বার বার নমস্কার করি॥ ৩০॥

বিকর্ণ বলিতেছেন—আমি পরমানন্দ লাভের জন্য সর্ব্ব পাপহারী বসুদেব ও দেবকী নন্দন সর্ব্বময় নন্দ নন্দন গোকুলবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ৩১॥

কুরুপক্ষীয় মহাবীর সোমদত্ত বলিলেন—হে মঙ্গলালয় হরে! তোমায় নমস্কার। হে বিশ্বভাবন! তুমি জগতের একমাত্র প্রতিপালক বাসুদেব, তোমায় নমস্কার। তুমি শান্ত মূর্ত্তি যদুকুল পতি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ ৩২॥

বিরাট বলিলেন—যিনি ব্রহ্মণ্য দেব অর্থাৎ বেদ স্বরূপ বা দীপ্তিমান ব্রহ্ম তেজ স্বরূপ, যিনি গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি এই জগতের হিত সাধনের জন্য কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত, যিনি প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়ে আনন্দ দান করিতেছেন বা যিনি পৃথিবীর ভারহারী সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণকে আমি বার বার নমস্কার করি॥ ৩৩॥

শল্য উবাচ

অতসী পুষ্পসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতং।
যে নমস্যন্তি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্॥৩৪॥

বলভদ্র উবাচ

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বমগতীনাং গতির্ভব।
সংসারার্ণবমগ্নানাং প্রসীদ পুরুষোত্তম॥৩৫॥

সূত উবাচ

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥৩৬॥

যম উবাচ

নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ।
কিং ত্বয়া নার্চ্চিতোদেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥৩৭॥

অনুবাদ

মহাবীর শল্য শ্রীহরির প্রণামের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেছেন :—অতসী পুষ্প সদৃশ রূপ অর্থাৎ শ্যামবর্ণ, পীতবসনধারী অপ্রতিহত বীর্য্য শ্রীগোবিন্দকে যাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রণাম করেন তাঁহাদিগের ইহকাল বা পরকাল কোন কালেই কোনরূপ ভয় থাকে না॥ ৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণের অতি মহৎ শক্তিতে বিস্মিত হইয়া বলভদ্র বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি পরম কৃপালু, তুমি অগতির গতি অর্থাৎ তুমিই পাপীতাপীর একমাত্র উদ্ধার কারী। হে পুরুষোত্তম! যাহারা সংসার রূপ সাগরে নিমগ্ন তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, ঘোর সংসারাসক্ত জীবকে কৃপা করিয়া তুমি উদ্ধার কর॥ ৩৫॥

নিখিল পুরাণ শাস্ত্রে সুনিপুণ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ধার্ম্মিক প্রবর সূত মহাশয় বলিতেছেন—যেখানে শ্রীহরির পবিত্র লীলাগুণাদির আলোচনা হয়, সেখানে গঙ্গা, যমুনা, বেণী, গোদাবরী, তীর্থ রাজ সাগর, সরস্বতী এমন কি সমস্ত তীর্থ বাস করেন। তাৎপর্য্য এই যে, গঙ্গাদি তীর্থ গমনে যে পুণ্য ও পবিত্রতা লাভ হয় শ্রীহরির পবিত্র লীলা গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ত্তনেও তাহাই হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

ভগবানের ভজন, ভগবন্নাম কীর্ত্তন ও তাঁহার লীলাদি শ্রবণের দ্বারা যাঁহারা

নারদ উবাচ

জন্মান্তর সহস্রেণ তপোধ্যানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণেভক্তিঃ প্রজায়তে ॥৩৮॥

প্রহ্লাদ উবাচ

নাথ ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥৩৯॥
যা প্রীতিবাবিবেকিনাং বিষযেষ্বনপায়িনী
ত্বামনুস্মরতঃ স্বামিন্ হৃদয়াম্মাপসর্পতু ॥৪০॥

অনুবাদ

জীবন অতিবাহিত করে তাঁহাদিগকে কখনও নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, ভঙ্গী ক্রমে সাক্ষাৎ যমরাজ তাহাই বলিতেছেন—জীব যখন নরক যন্ত্রণা ভোগ করে যম তখন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন হে নারকী জীবগণ! তোমরা কি সর্ব্বক্লেশহারী শ্রীহরির সাধন ভজন কর নাই? যদি তাহা করিতে, তাহা হইলে আর কখনই তোমাদিগকে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির দুর্লভতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নারদ বলিতেছেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু বহু জন্মে সুন্দর রূপে যাহারা তপস্যা, ধ্যান অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তা ও সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা নিজকৃত পাপ ক্ষয় করিয়াছে তাঁহাদিগেরই শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি হয়। হৃদয়ে পাপ থাকিতে ভগবদ্ভক্তি আসে না, সুতরাং তপস্যাদি দ্বারা পাপক্ষয় করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৩৮ ॥

ভক্ত চূড়ামণি মহাত্মা প্রহ্লাদ শ্রীহরির নিকট প্রর্থনা করিতেছেন—হে নাথ! হে প্রভাবশালিন্ নিত্য সত্য শ্রীহরে। আমি এই সংসারে সহস্র সহস্র যোনি পরিভ্রমণ করি না কেন অর্থাৎ মনুষ্য, কীট, পতঙ্গাদি যে কোন জন্ম হউক না কেন তাহাতে ক্ষতিনাই, কেবল এই প্রর্থনা যেন সর্ব্বত্রই তোমার প্রতি অচলা ভক্তি —নিষ্কাম ভালবাসা থাকে ॥ ৩৯ ॥

হে নাথ। বিষয়াসক্ত মূর্খ লোকের বিষয়ের প্রতি সেরূপ ভালবাসা অর্থাৎ শয়নে স্বপনে বিষয় ভিন্ন যেমন অন্য কিছু চায় না বা জানে না—হে স্বামীন্! আমিও যখন তোমায় স্মরণ করিব আমারও মন তোমার প্রতি সেইরূপ ভক্তি থাকে অর্থাৎ কখনও যেন তোমায় ভুলি না, এইটীই প্রার্থনা ॥ ৪০ ॥

বিশ্বামিত্রোবাচ

কিং তস্য দানৈ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।
যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নরাণাং মনসি স্থিতম্ ॥৪১॥

জমদগ্নিরুবাচ

নিত্যোৎসবস্তদা তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলং।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনোহরিঃ ॥৪২॥

ভরদ্বাজ উবাচ

লাভস্তেষাং জয় স্তেষাং তেষাং নিত্যং চ মঙ্গলং।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥৪৩॥

গৌতম উবাচ

গোকোটিদানং গ্রহণেষু কাশীপ্রয়াগগঙ্গাযুতকল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দ নাম্না ন কদাপিতুলম্ ॥৪৪॥

অনুবাদ

ভগবান হবির ধ্যানই সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের সার ইহা স্থির জানিয়া মহাতপা বিশ্বামিত্র বলিতেছেন—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বজীব হৃদয়স্থিত সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান শ্রীহরির ধ্যান করে তাহার আর দান ধর্ম্মেই বা কি প্রয়োজন? তপস্যারই বা কি প্রয়োজন? তীর্থ ভ্রমণই বা কি প্রয়োজন? একমাত্র ভগবদ্ ধ্যানই তাহার দান তপস্যা ও তীর্থাদির পূর্ণ ফল প্রদান করে॥ ৪১ ॥

জমদগ্নি বলিতেছেন—যখন উপসনার বলে দেবাধিদেব সর্ব্বময় শ্রীহরি হৃদয়ে দর্শন দান করেন তখন সেই ভাগ্যবান ভক্তের সর্ব্বদাই উৎসব, সর্ব্বদাই সম্পদ, সর্ব্বদাই আনন্দ থাকে। সুতরাং শ্রীহরিকে হৃদয়ে দর্শন করিবার জন্য ঐকান্তিক যত্ন করা আনন্দ লাভেচ্ছুক নর নারী সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৪২ ॥

শ্রীহরির ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করিয়া নিরন্তর হরি-গুণানুবাদে-রত-চিত্ত শ্রীভরদ্বাজ ঋষি বলিতেছেন:—নিখিল মঙ্গলের আধার মঙ্গলময় শ্রীহরি যাহাদের হৃদয়ে বিরাজমান অর্থাৎ যাহারা শ্রীহরির ধ্যানে রত সেই ভক্তগণের সর্ব্বদাই লাভ, সর্ব্বদাই জয়, সর্ব্বদাই পরম মঙ্গল হয়। ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

গৌতম ঋষি বলিতেছেন—গ্রহণের সময় যদি কোটি কোটি গাভী দান করে এবং

অত্রিরুবাচ

গোবিন্দেতি সদাস্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ।
গোবিন্দেতি সদাধ্যানং সদা গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥৪৫॥
অক্ষরংহি পরংব্রহ্ম গোবিন্দেত্যক্ষরত্রয়ম্।
তস্মাদুচ্চরিতং যেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্প্যতে ॥৪৬॥

শ্রীশুক উবাচ

অচ্যুতঃ কল্পবৃক্ষোঽসাবনন্তঃ কামধেনবঃ।
চিন্তামণিশ্চ গোবিন্দো হরিনাম বিচিন্তয়েৎ ॥৪৭॥

হরিরুবাচ

জয়তি জয়তি দেবো দৈবকী নন্দনোঽয়ং
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভাবনাশো মুকুন্দঃ ॥৪৮॥

অনুবাদ

কাশী প্রয়াগাদি তীর্থে যদি অযুতকল্প বাস করে এবং সুন্দররূপে যদি অযুত যজ্ঞানুষ্ঠান করে আর সুমেরু পর্ব্বত সদৃশ যদি সুবর্ণ দান করে তথাপি কেবল "গোবিন্দ" এই নামকীর্ত্তনে যে ফল হয় তাহার সমতুল হয় না ॥ ৪৪ ॥

মহাতপা অত্রি বলিতেছেন—সর্ব্বদা গোবিন্দের নাম কীর্ত্তনেই অন্তর বাহির পবিত্র হয়, গোবিন্দ নাম কীর্ত্তনই জপ, গোবিন্দ রূপই সর্ব্বদা ধ্যানের বিষয়, জীব মাত্রেরই গোবিন্দ নাম সর্ব্বদা অবশ্য কীর্ত্তনীয় ॥ ৪৫ ॥

গোবিন্দ এই অক্ষরত্রয়ই পরব্রহ্ম সনাতন, অতএব যে ব্যক্তি এই পরব্রহ্মস্বরূপ গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করে সে অনায়াসে পরাৎ পর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন রূপ সন্দেহের কারণ নাই ॥ ৪৬ ॥

মহামুনি বেদব্যাস তনয় শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—ভগবানের অচ্যুত নাম কল্পবৃক্ষ সদৃশ, অনন্ত নাম কামধেনু সদৃশ, আর গোবিন্দ নাম চিন্তামণি সদৃশ। অতএব কি কামী, কি নিষ্কামী সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট পূরণ জন্য ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিবে, ইহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কখনই হইবে না। ॥ ৪৭ ॥

নব যোগীন্দ্রের একজন হরি নামক যোগীন্দ্র কেবল নামের জয় প্রদান করিয়া

পিপ্পলায়ন উবাচ

শ্রীমন্নৃসিংহবিভবে গরুড়ধ্বজায়
তাপত্রয়োপশমনায় ভবৌষধায়।
কৃষ্ণায় বৃশ্চিক জলাগ্নি ভুজঙ্গরোগ-
ক্লেশব্যয়ায় হরয়ে গুরবে নমস্তে॥ ৯॥

আবির্হোত্র উবাচ

কৃষ্ণ ত্বদীয় পদ-পঙ্কজ-পিঞ্জরান্তে
অদ্যৈব মে বিশতু মানস রাজহংসঃ।
প্রাণ প্রয়াণ সময়ে কফ-বাত-পিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥৫০॥

অনুবাদ

বলিতেছেন—এই দৈবকী নন্দন বাসুদেবের জয় হউক, বৃষ্ণিবংশের উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ কৃষ্ণের জয় হউক, নবজলধর শ্যামসুন্দরের জয় হউক, ভূভারহারী মুকুন্দের জয় হউক জয় হউক ॥ ৪৮ ॥

মহাতপা পরমভাগবত পিপ্পলায়ন বলিতেছেন—মহাপ্রভাবশালী নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ নৃসিংহকে নমস্কার, গরুড়ধ্বজ শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি তাপত্রয় নিবারণকারী সেই ভব-রোগের পরম মহৌষধ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। বিশ্চিক, জল, অগ্নি, সর্প ও নানাবিধ রোগ-ভয়হারী বিশ্বগুরু শ্রীহরিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৪৯ ॥

জীবের মন সর্ব্বদা একভাবে থাকে না, মন অতিশয় চঞ্চল, কখন ভক্তি আসে কখন বা নানাবিধ দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়, পরন্তু যাহার চিত্ত শ্রীভগবানে রত তাহার আর চঞ্চলতা আসে না। তাই, চিত্তকে শ্রীহরির পাদপদ্মে রত রাখিবার জন্য আবির্হোত্র বলিতেছেন—হে পাপহারী শ্রীকৃষ্ণ! তোমার পাদপদ্মরূপপিঞ্জরে আমার চিত্তরূপ রাজহংস এইক্ষণেই প্রবেশ করুক। নতুবা প্রাণ বিয়োগের সময় কফ, বাত, পিত্তজনিত রোগে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিলে রোগের যাতনায় তখন আর তোমার নাম ও রূপ কোন প্রকারেই স্মরণ করিতে পারিব না ॥ ৫০ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মী ভবন্তি তস্যাশু মহাপাতক কোটয়ঃ ॥৫১॥

অরুন্ধত্যুবাচ

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥৫২॥

কশ্যপ উবাচ

কৃষ্ণানুস্মরণাদেব পাপসংঘাত পঞ্জরঃ।
শতধা ভেদমাপ্নোতি গিরির্বজ্রাহতো যথা ॥৫৩॥

দুর্য্যোধন উবাচ

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥৫৪॥

---

অনুবাদ

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বলিতেছেন—"কৃষ্ণ" এই মঙ্গলময় নাম যাঁহার মুখে নিরভিসন্ধি ক্রমে উচ্চারিত হয় তাহার কোটী কোটী মহা পাতক থাকিলেও তাহা নামের গুণে মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভস্ম হইয়া যায় ॥ ৫১ ॥

মহাভাগা পতিপরায়না অরুন্ধতী বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি পাপহারী, তুমি বাসুদেব, তুমি সর্ব্বদুঃখহারী, তুমিই জীবের পরমাত্মা, প্রণত জনের তুমিই সকল ক্লেশ হরণ করিয়া থাক, তুমি আনন্দপ্রদ গোবিন্দ, তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫২ ॥

মহাতপা কশ্যপঋষি বলিতেছেন দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রে পর্ব্বত যেমন শতশত খণ্ড হইয়া যায় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ মাত্রেই নিখিল পাপ শতশত খণ্ড হইয়া যায় অর্থাৎ পাপ বিনিষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম স্মরণই জীবের অন্তর বাহির পবিত্রকারী পরম বস্তু ॥ ৫৩ ॥

সতত পাণ্ডবদ্বেষী ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ তনয় দুর্য্যোধন নিজকৃত অপরাধের

যত্র স্বগুণ দোষেণ ক্ষম্যতাং মধুসূদনঃ।
অহমেবমহং হন্তুং মম দোষো ন বিদ্যতে ॥৫৫॥

ভৃগুরুবাচ

নামৈব তব গোবিন্দ কলৌ ত্বত্তঃ শতাধিকম্।
দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং বিনাপ্যষ্টাঙ্গযোগতঃ ॥৫৬॥

লোমহর্ষণ উবাচ

নমামি নারায়ণ পাদ পঙ্কজং
করোমি নারায়ণ পূজনং সদা।
বদামি নারায়ণ নাম নির্ম্মলং
স্মরামি নারায়ণ তত্ত্বমব্যয়ম্ ॥৫৭॥

---

অনুবাদ

নিমিত্ত ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—আমি ধর্ম্মতত্ত্ব জানি কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না, কিসে অধর্ম্ম হয় তাহাও বুঝি পরন্তু অধর্ম্ম আচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে পরি না, কেমন যেন কোন এক দেবতা আমার হৃদয় হইতে আমায় যেমন চালনা করেন আমি ঠিক সেইরূপই চলিয়া থাকি, আমি অতিশয় মোহমুগ্ধ ॥ ৫৪ ॥

আমার নিজ দোষে বা আমার মোহ মুগ্ধতায় যাহা যাহা অন্যায় করিয়াছি হে মধুসূদন! তুমি তাহা ক্ষমা কর। মোহমুগ্ধ বিষয়াসক্ত পুরুষের দোষ ঈশ্বর গ্রহণ করেন না, কারণ আমরা নিজেই যখন নিজকে বিনাস করিতে উদ্যত হই তখন আমরা অতিশয় উন্মত্ত, হিতাহিত বিবেক শূন্য। সুতরাং আমরা ভগবানের অবশ্যই ক্ষমার পাত্র ॥ ৫৫ ॥

ভৃগুমুনি বলিতেছেন—হে ভগবন গোবিন্দ! কলিতে তোমার নাম তোমা হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, কারণ জীব অজ্ঞানবশে যতই কেন পাপ করুক না, যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ না থাকিলেও কেবল 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ মাত্রে পাপী সমস্ত পাপ হইতে অনায়াসে মুক্ত হয় ॥ ৫৬ ॥

লোমহর্ষণ ঋষি বলিতেছেন—হে নারায়ণ! তোমার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা, যেন সর্ব্বদা তোমারই পাদপদ্মে প্রণাম করিতে পারি, তোমারই

শৌনক উবাচ

স্মৃতে সকল কল্যাণ ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥ ৫৮॥
ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরোদেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে ॥৫৯॥
এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং বিভুম্ ॥ ৬০॥

গর্গ উবাচ

নারায়ণেতি মন্ত্রোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে ঘোরে পতন্তীত্যেতদদ্ভুতম্ ॥৬১॥

অনুবাদ

পূজা করি, তোমারই ভুবন পাবন নির্ম্মল নাম উচ্চারণ করি। সর্ব্বদা যেন তোমারই নিত্য-সত্য স্বরূপ চিন্তা করিতে পারি, কৃপা করিয়া এই কর ॥ ৫৭ ॥

শৌনক ঋষি বলিতেছেন—যাঁহার স্মরণ করিলে জীব সকল কল্যাণের ভাজন হয় অর্থাৎ যাবতীয় কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, আমি সেই আদিপুরুষ জন্ম রহিত নিত্য-নিরঞ্জন শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫৮ ॥

যাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সকল সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা আর ভোজন আচ্ছাদনের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। কারণ যিনি বিশ্বম্ভর, যিনি জগতের ভরণ পোষণ করিতেছেন তিনি কি তাঁহার ভক্তগণকে উপেক্ষা করিবেন? কখনই না ॥ ৫৯ ॥

এইভাবে ভগবানের ভক্তবৎসলতা দেখাইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষি সকল দেবাধিদেব সর্ব্বময় শ্রীনারায়ণের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

যাহারা শ্রীনারায়ণের নাম-বিমুখ, তাহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য উৎসাহের সহিত মহাজ্ঞানী গর্গাচার্য্য বলিতেছেন—হায়! হায়! "নারায়ণ" এই পবিত্র নাম আছে, জিহ্বাও বশবর্ত্তিনী অর্থাৎ বাক্য উচ্চারণে সমর্থা আছে, তথাপি লোকে যে কেন নরকে যায় ইহাই আশ্চার্য্য। তাৎপর্য্য—হে জীবগণ! নারায়ণ নাম উচ্চারণ কর আর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না ॥ ৬১ ॥

দালভ্য উবাচ

কিং তস্য বহুভির্মন্ত্রৈর্ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে।
নমো নরায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থ সাধকঃ ॥৬২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতি ধ্রু র্বানীতির্মতির্মম ॥৬৩॥

অঙ্গিরা উবাচ

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংপৃষ্টঃ দহত্যেব হি পাবকঃ ॥৬৪॥

পরাশর উবাচ

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥৬৫॥

অনুবাদ

মহাতপা দালভ্য বলিতেছেন—যাহার সর্ব্বপাপহারী জগৎপতি জনার্দ্দনে অচলা ভক্তি আছে এবং সর্ব্বকর্ম্ম ফলপ্রদ মোক্ষদায়ক "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র যাহার লাভ হইয়াছে তাহার আর বহুবিধ যাগ, যজ্ঞ বা মন্ত্রের প্রয়োজন নাই, একমাত্র নারায়ণে অচলা ভক্তি থাকিলেই যাগ যজ্ঞাদির সকল প্রকার ফল লাভ হয়॥ ৬২ ॥

শ্রীভগবান চিরজয়ী, তাঁহাকে কেহই পরাজয় করিতে পারে না, তাই পাণ্ডব পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কুরু পাণ্ডবের মধ্যে কোন পক্ষের জয় হইবে তাহা বৈশম্পায়ন নিজের বিশ্বাসমত বলিতেছেন—যে পক্ষে সাক্ষাৎ ভগবান সর্ব্বযোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের বলে বলীয়ান মহাবীর ধনঞ্জয় বর্ত্তমান যে পক্ষের জয়, সে পক্ষের মঙ্গল, সে পক্ষের সম্পদ অবশ্যম্ভাবী; ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস॥ ৬৩ ॥

অঙ্গিরা বলিতেছেন—যেমন অনিচ্ছায় অন্যাসক্তচিত্তেও অগ্নিতে হস্ত নিক্ষেপ করিলে হাত পুড়িয়া যায়, সেইরূপ বিষয়াসক্ত চিত্ত হইয়াও যদি শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ করে তাহা হইলে স্মরণকারীর সকল পাপ নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৪ ॥

পরাশর মুনি বলিতেছেন—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত হরি এই অক্ষর দ্বয় উচ্চারণ

পৌলস্ত্য উবাচ

হে জিহ্বে রসসারজ্ঞে সর্ব্বদা মধুরপ্রিয়ে।
নারায়ণাখ্য পীযূষং পিব জিহ্বে নিরন্তরম্ ॥৬৬॥

ধন্বন্তরিরুবাচ

অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ নামোচ্চারণ ভেষজাৎ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥৬৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সাচান্ধ জড় মূঢ়তা।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ ॥৬৮॥

অগস্ত্য উবাচ

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণিনাং বিষ্ণু-চিন্তনম্।
ক্রতুকোটি সহস্রাণাং ধ্যানমেকং বিশিষ্যতে ॥৬৯॥

অনুবাদ

করে সে ব্যক্তি মোক্ষধামে গমনের জন্য বদ্ধ পরিকর হয়। অর্থাৎ তাহার মোক্ষ প্রাপ্তি বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। হরিনামের এমনই মাহাত্ম্য ॥৬৫॥

পৌলস্ত্যমুনি প্রাণের আবেগে বলিতেছেন—হে রসপ্রিয়ে জিহ্বে। তুমি সর্ব্বদাই মধুররস ভালবাস, অতএব নারায়ণ নামরূপ সুধা নিরন্তর পানকর, সকল যন্ত্রণা, সকল দুঃখ দূর হইবে। তুমি পরমানন্দ লাভে ধন্য হইবে॥ ৬৬॥

জীবের সকল রোগের উপশমের নিমিত্ত ভগবান ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ভগবদবতার ধন্বন্তরি স্বয়ং নামের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া বলিতেছেন—অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ এই নামোচ্চারণ রূপ ঔষধ পানে নিখিল রোগ আরোগ্য হয় ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি॥ ৬৭।

মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন—জীব যে মুহূর্ত্ত ভগবান বাসুদেবকে চিন্তা না করে সেই সময়েই বৃথা আয়ু ব্যয় হয়, সেই মুহূর্ত্তই পাপপুরুষ প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়, তাহাই অন্ধ, জড় ও মূঢ়তা এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই॥ ৬৮॥

অগস্ত্য ঋষি বলিতেছেন একনিমিষ বা নিমিষার্দ্ধকালও যে বিষ্ণুর চিন্তা তাহাই প্রাণিগণের জীবনের সফলতা, এমন কি একবার হরিধ্যান কোটী কোটী যজ্ঞের ফল অপেক্ষাও অধিক॥ ৬৯॥

মনসা কর্ম্মণা বাচা যে স্মরন্তি জনার্দ্দনম্।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনম্ ॥৭০॥

শুক উবাচ

আলোচ্য সর্ব্ব শাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥৭১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ

শরীরং চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং নিরন্তরম্।
ঔষধং জাহ্নবী তোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ ॥৭২॥

সনৎকুমার উবাচ

যস্য হস্তে গদাচক্রং গরুড়ো যস্য বাহনম্।
শঙ্খঃ করতলে যস্য স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥৭৩॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি মনে মনে নারায়ণের ধ্যান করে, যাহার প্রতিকার্য্যে বিষ্ণুর ভাব থাকে, যে ব্যক্তি মুখে জনার্দ্দনের নাম গুণাদি কীর্ত্তন করে তাহার আর অন্য তীর্থ গমনের অপেক্ষা থাকেনা, তিনি স্বয়ং সর্ব্বতীর্থময়, তিনি যেখানে থাকেন সেই খানেই সর্ব্বদা কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুণ্যভূমি নৌমিষারণ্য ক্ষেত্র প্রভৃতি বর্ত্তমান হয় ॥ ৭০।

নানা তীর্থ পর্য্যটন এবং তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বশাস্ত্র সার নির্ণয়কারী জীবন্মুক্ত শ্রীবেদব্যাস তনয় শুকদেব পুনর্ব্বার বলিতেছেন—আমি সকল শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এবং নানা শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাদির পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া এই স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে, সর্ব্বজীবজীবন সকলের আশ্রয় আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণই একান্তধ্যেয় অর্থাৎ নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়ই একমাত্র সর্ব্বধর্ম্মসার ॥৭১

কৈলাসপতি মহাদেব জীবগণের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিয়া নিজমুখে বলিয়াছেন—এই দেহ নব ছিদ্রবিশিষ্ট এবং সর্ব্বদাই ব্যধিগ্রস্ত সুতরাং ইহার দোষ ও রোগ নিবৃত্তির জন্য আমি ইহাই ব্যবস্থা করিতেছি যে, গঙ্গাজলে স্নান ও গঙ্গাজল পান এই ঔষধ এবং সকলের আশ্রয় জীবগণের একমাত্র গতি পাপ-তাপহারি শ্রীহরিই বৈদ্য ॥৭২

শান্তভাবে বৈকুণ্ঠনাথকে লাভ করিয়া সর্ব্বদাই পরমানন্দে নিমগ্ন ঋষিবর

বেদব্যাস উবাচ

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বাহুমুদ্ধৃত্যচোচ্যতে।
ন বেদাচ্চ পরং শাস্ত্রং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥৭৪॥
আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি ॥৭৫॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব জীব জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৭৬॥

শ্রীভগবান উবাচ

কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মা স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥৭৭॥

---

অনুবাদ

সনৎকুমার বলিতেছেন—যাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, যিনি গরুড়বাহন সেই আমার উপাস্যদেব বৈকুণ্ঠনাথ আমার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকুন। অর্থাৎ সর্ব্বদাই যেন তাঁহার ঐ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি ॥৭৩॥

বেদ বিভাগ কর্ত্তা নানা শাস্ত্র প্রণেতা শ্রীবেদব্যাস বলিতেছেন—আমি বাহু-উত্তোলন পূর্ব্বক অতীব সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, বেদ হইতে আর উত্তম শাস্ত্র নাই, এবং ভগবান কেশব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। অর্থাৎ সকল শাস্ত্র যেমন একমাত্র বেদেরই অনুসরণ করে, সেইরূপ সকল দেবতাই বাসুদেবের অনুসরণ করে। বাসুদেবই আদি, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ ও একান্ত উপাস্য ॥ ৭৪ ॥

আকাশ হইতে পতিত জল যেমন নদ-নদী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া শেষে একমাত্র সাগরেই গিয়া পতিত হয় সেইরূপ যে যেরূপেই সাধন ভজন প্রণামাদি করুক না কেন সকলই একমাত্র সর্ব্বাশ্রয় দেবাধিদেব শ্রীমন্নারায়ণে আশ্রয় করে ॥ ৭৫ ॥

আমার বিবেচনায় ভগবানের পাপতাপহারী হরি নামই সকল ধর্ম্মের সার, হরি নামই জীবের জীবন, হরি নামই জীবের একমাত্র গতি। হরি নাম ভিন্ন কলির জীবের আর অন্য গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই ॥ ৭৬ ॥

এই সকল ভক্ত-কৃত স্তবে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান নিজে বলিতেছেন—যে মানব "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলিয়া আমার স্মরণ করে তাহার

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু-
র্যোমাং মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।
জীবোজপত্যনুদিনং মরণে রণে বা
পাষাণ কাষ্ঠ সদৃশায় দদাম্যভীষ্টম্ ॥৭৮॥
ইতি পাণ্ডব গীতা সমাপ্তা ॥

( অথ ফলশ্রুতিঃ )
ইদং পবিত্রমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্।
স্তোত্রং পাণ্ডবগীতাখ্যং ঋষিণা পরিকীর্ত্তিতম ॥ ॥

অনুবাদ

কদাপি দুর্গতি হয় না। অগাধ জলে নিমগ্ন পদ্ম যেমন অত্যল্প সময় মধ্যে জলের উপর ভাসমান হয় সেইরূপ আমার নাম স্মরণকারীর সমস্ত পাপ আমি নিজে ক্ষয় করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৭৭ ॥

পুনর্ব্বার জীবগণকে অধিকতর আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতেছেন—হে মানবগণ! আমি বাহু উত্তোলন করিয়া তোমাদিগের নিকট বলিতেছি—যে ব্যক্তি নিরন্তর মুকুন্দ, নরসিংহ, জনার্দ্দন প্রভৃতি নাম বলিয়া আমার নাম জপ করে, তাহার আর কোন চিন্তা থাকে না। সে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হউক বা সমরভূমিতে বিপন্ন হউক, এমন কি সে যদি পাষাণ ও কাষ্ঠ সদৃশ অকর্ম্মণ্যও হয় তথাপি আমি তাহাকে অভীষ্ট ফল প্রদান করি। ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই—এ কথা ধ্রুব সত্য জানিবে। ৭৮ ॥

ইতি পাণ্ডবগীতার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ফলশ্রুতি

এই ঋষিগণ কর্ত্তৃক সাদরে পরিকীর্ত্তিত পাণ্ডবগীতা অতি পবিত্র, পুণ্য ও মঙ্গল সম্পাদক। ইহা আয়ু বৃদ্ধিকারক, এবং নিখিল পাপ ক্ষয়কারী ॥ ১ ॥

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
তস্য পুণ্যফলং কিঞ্চিৎ বক্তুং কঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥২॥
গয়ায়াং গোসহস্রাণি দানতঃ পিণ্ডদানতঃ।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্যঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥৩॥
যৎফলং মথুরাং গত্বা দৃষ্ট্বা যোগেশ্বরং হরিম্।
তৎফলং সম্যগাপ্নোতি সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥৪॥
ইতি পাণ্ডবগীতা-ফলশ্রুতিঃ সমাপ্তা ॥

---

অনুবাদ

যে মানব প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তির সহিত এই পাণ্ডবগীতা পাঠ বা শ্রবণ করে তাহার পুণ্য বর্ণনা করিতে কেহই সক্ষম হয় না, অর্থাৎ তাহার অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হয় ॥ ২ ॥

এই পাণ্ডবগীতা ভক্তির সহিত পাঠ করিলে যে ফল হয় তাহার এক কলার অর্থাৎ ষোড়শ ভাগের এক ভাগের সহিতও গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান এবং সহস্র গোদানের ফলের তুলনা হয় না, ইহা অতি পবিত্র ॥ ৩ ॥

শ্রীমথুরাধামে গমন পূর্ব্বক শ্রীহরিকে দর্শন করিলে যে ফল হয় এই পাণ্ডবগীতা পাঠে তাহা সম্যক পাওয়া যায়। ইহা পাঠ করিলে শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

ইতি পাণ্ডব গীতার ফলশ্রুতির বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

# শ্রীতুলসী-গীতা।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রাগ্দদ্যার্ঘ্যং ততোহভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্প ক্ষতাদিনা।
স্তুত্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেৎ দণ্ডবৎ ভুবি ॥১॥
শ্রিয়ং শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর সৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তঃ ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ন নমোহস্তু তে ॥২॥
নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ !
তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ন নমোহস্তু তে ॥৩॥
মহাপ্রসাদ জননী আধিব্যাধি বিনাশিনী।
সর্ব্ব সৌভাগ্যদা দেবি তুলসি ত্বাং নমোহস্তু তে ॥৪॥

---

অনুবাদ

একদিন দ্বারকাধামে সত্যভামা শ্রীভগবানকে তুলসী মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রীভগবান সত্যভামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—সত্যভামে। প্রথমতঃ ভগবতী তুলসী দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিয়া গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিবে, শেষে ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া তুলসীকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে ॥ ১ ॥

হে দেবি। তুমি শ্রীরও (লক্ষ্মীরও) শ্রী এবং আশ্রয়, তুমি নিত্য শ্রীধর কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছ। আমি ভক্তি সহকারে তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি তুমি গ্রহণ করিয়া আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর। হে দেবি। তোমাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

হে তুলসী দেবি। তুমি পূর্ব্বে দেবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা এবং সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হইয়াছ। তুমি আমার সর্ব্বপ্রকার পাপ ধ্বংস কর এবং আমার পূজা গ্রহণ কর। তোমাকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

হে তুলসী দেবি। তুমি মহাপ্রসাদ সাধিনী, আধি-ব্যাধি বিনাশিনী ও সর্ব্ব-সৌভাগ্যদাত্রী, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ॥ ৪ ॥

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী।
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী॥
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা।
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি ফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥৫॥
ভগবত্যাস্তুলস্যাস্তু মাহাত্ম্যামৃত সাগরে।
লোভাৎ কুর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্র স্তৎ ক্ষম্যতাং ত্বয়া ॥৬॥
শ্রবণা দ্বাদশী যোগে শালগ্রাম শিলার্চ্চনে।
যৎফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসী পূজনেন তৎ ॥৭॥
ধাত্রীফলেন যৎ পুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তুলসীপূজনেন তৎ ॥৮॥

অনুবাদ

যাঁহার দর্শনে নিখিল পাপ সমূলে ধ্বংশ হয়, যাঁহার স্পর্শ মাত্র যে কোন প্রকারে অপবিত্র দেহই হউক না তাহা পবিত্র হয়, যাঁহাকে অভিবন্দন করিলে যাবতীয় রোগ বিদূরীত হয়, যাঁহার উপরে সিক্ত জল গাত্রে স্পৃষ্ট হইলে অন্তক ভয় (শমন ভয়) থাকে না, যাঁহাকে যত্নে রোপণ করিলে ভগবান কৃষ্ণে প্রত্যাসক্তি জন্মে, আর যাঁহাকে চন্দনলিপ্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিলে সকল প্রকার মুক্তি করতলগত হয়, এমন যে তুলসীদেবী তাঁহাকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

হে দেবি! আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়াও লোভবশতঃ তোমার মাহাত্ম্যরূপ অমৃত সাগরে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে কৃপাকর ॥ ৬ ॥

শ্রবণা নক্ষত্র সমন্বিত দ্বাদশী দিনে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিলে যে ফল হয় এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, ভক্তিভরে তুলসী দেবীর পূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৭ ॥

আমলকী ফল দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে অথবা জয়ন্তী যোগে, জন্মাষ্টমীতে উপবাস করিলে যে ফল হয়, ভক্তিপূর্ব্বক একমাত্র তুলসীদেবীর পূজায় সেই ফল সম্যক রূপে লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

যৎ ফলং প্রয়াগস্নানে কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে।
যৎফলং বিহিতং দেবৈস্তুলসী পূজনেন তৎ ॥৯॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি চ ॥১০॥
তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকাম ফলপ্রদা ॥১১॥
প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে ॥১২॥
পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি।
তস্য সর্ব্বানি শ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তেঽহরহঃ সদা ॥১৩॥
পক্ষে পক্ষে চ দ্বাদশ্যাং সংপ্রাপ্তে তু হরের্দ্দিনে।
ব্রহ্মাদয়োঽপি কুর্ব্বন্তি তুলসীবন পূজনম্ ॥১৪॥

অনুবাদ

প্রয়াগ তীর্থে স্নান করিলে কিম্বা কাশীতে প্রাণ ত্যাগ করিলে দেবগণ যে ফল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন একমাত্র তুলসীর অর্চ্চনা দ্বারা সেই ফল পাওয়া যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমী—কি পুরুষ কি স্ত্রী যে কেহই এই তুলসীর পূজা করিবে দেবী তাহাকেই তাহার অভীষ্ট ফল প্রদান করিবেন ॥ ১০ ॥

তুলসী রোপিতা, জলসিক্তা, দৃষ্টা, স্পৃষ্টা ও যত্ন সহকারে আরাধিতা হইলে সর্ব্ব কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

যাহারা প্রত্যহ তুলসীর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ, ভ্রমণ ও নমস্কার করেন তাঁহাদিগের সকল প্রকার দুরিত ধ্বংস হইয়া যায় ॥ ১২ ॥

যাহার গৃহে তুলসী ভক্তিপূর্ব্বক পূজিতা হন তাহার গৃহে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ অহরহঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ১৩ ॥

প্রতিপক্ষে অর্থাৎ কি শুক্লপক্ষে কি কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশীতে হরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণও তুলসী কাননের পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

অনন্য মনসা নিত্যং তুলসীং স্তৌতি যো জনঃ।
পিতৃদেব মনুষ্যাণাং প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বদা ॥১৫॥
রতিং বধ্নামি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা।
সত্যং ব্রবীমি তে সত্যে কলিকালে মম প্রিয়ে ॥১৬॥
হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্।
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠামি ভাবিনি ॥১৭॥
ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণুস্তুলসীবনম্।
তৎ শ্মশানসমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষ্ণবাঃ ॥১৮॥
তুলসী গন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ।
দিশো দশ চ পূতাঃ স্যুর্ভূতগ্রামাশ্চতুর্দ্দশ ॥১৯॥
তুলসীবনসম্ভূতা ছায়া পততি যত্র বৈ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যং পিতৄণাং তৃপ্তিহেতবে ॥২০॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি প্রত্যহ অনন্যচিত্তে তুলসীর স্তব করে সে পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

হে সত্যভামে। আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি কলিকালে আমি একমাত্র তুলসীকানন ব্যতিত অন্য কোন স্থানই প্রীতি প্রদ বলিয়া মনে করি না। আর আমি অন্যত্র থাকিও না ॥ ১৬ ॥

হে ভাবিনি। কলিকালে আমি সহস্র তীর্থ ও যাবতীয় পবিত্র পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তুলসীকাননেই সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিয়া থাকি ॥ ১৭ ॥

যে স্থানে ফলবতী আমলকী নাই, যে স্থানে বিষ্ণু বিগ্রহ বা তুলসীবন দৃষ্ট হয় না এবং যে স্থানে ভুবন-পাবন বৈষ্ণবগণের অধিষ্ঠান নাই, সে স্থান শ্মশান সদৃশ বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন ॥ ১৮ ॥

যে স্থানের সমীরণ তুলসীগন্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হয় তাহার দশদিক ও চতুর্দ্দশ-ভুত-গ্রাম পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

যে স্থানে তুলসীর ছায়া পতিত হয় সে স্থান অতি পবিত্র, তথায় পিতৃগণের তৃপ্তি হেতু শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২০ ॥

তুলসী পূজিতা নিত্যং সেবিতা রোপিতা শুভা।
স্নাপিতা তুলসী যৈস্তু তে বসন্তি মমালয়ে ॥২১॥
সর্ব্বপাপ হরং সর্ব্বকামদং তুলসীবনম্।
ন পশ্যতি যমং সত্যে তুলসীবনরোপণাৎ ॥২২॥
তুলস্যলঙ্কৃতা যে বৈ তুলসীবনপূজকাঃ।
তুলসী স্থাপকা যে চ তে ত্যাজ্যা যমকিঙ্করৈঃ ॥২৩॥
দর্শনং নর্ম্মদায়াস্তু গঙ্গাস্নানং কলৌ যুগে।
তুলসীদল সংস্পর্শঃ সমমেতত্রয়ং স্মৃতম্ ॥২৪॥
দারিদ্র্যদুঃখরোগার্ত্তি পাপানি সুবহূন্যপি।
হরতে তুলসীক্ষেত্রং রোগানিব হরীতকী ॥২৫ ॥
তুলসীকাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
জন্মকোটি কৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬॥

অনুবাদ

যে সকল পুণ্যাত্মা কর্তৃক পবিত্র তুলসী প্রত্যহ পূজিত, সেবিত, রোপিত ও স্নাপিত হয় সেই সকল মহাত্মা নিশ্চয়ই আমার বৈকুণ্ঠ ভবনে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

হে সত্যভামে। তুলসীবন সর্ব্বপাপ নাশক ও সর্ব্বকামপ্রদ। যে তুলসী-কানন রচনা করে তাহাকে আর যম কারা দর্শন করিতে হয় না অর্থাৎ তাহাতে আর যমের অধিকার থাকে না ॥ ২২ ॥

যাহারা তুলসীকে সুশোভিত করে, যাহারা তুলসীকাননের পূজা করে, অথবা যাহারা তুলসী স্থাপন করে যম-দূতগণ তাহাদিগকে অতি সত্বরই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ॥ ২৩ ॥

নর্ম্মদা নদী দর্শন, গঙ্গাস্নান ও তুলসীদল স্পর্শ, কলিযুগে এই তিনটীই সমান পুণ্য জনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

হরিতকী যেমন রোগ দূর করে, তুলসীও সেইরূপ দারিদ্র, দুঃখ, রোগ, শোক এবং যাবতীয় পাপ আশু ধ্বংস করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি মুহূর্ত্ত মাত্রও তুলসী কাননে বিশ্রাম করে, সে কোটি কোটি জন্মকৃত পাতক, অতি পাতক, মহা পাতক হইতে সদ্য সদ্যই বিমুক্ত হয়, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥

নিত্যং তুলসিকারণ্যে তিষ্ঠামি স্পৃহয়া যুতঃ।
অপি মে ক্ষত পত্রৈকং কশ্চিদ্ধন্যোঽর্পয়েদিতি ॥ ২৭ ॥
তুলসী নামযো ব্রুয়াৎ ত্রিকালং বদনে নরঃ।
বিবর্ণ বদনো ভূত্বা তন্নিপিং মার্জ্জয়েদ্ যমঃ ॥ ২৮ ॥
শুক্লপক্ষে যদা দেবি তৃতীয়া বুধ সংযুতা।
শ্রবণয়া চ সংযুক্তা তুলসী পুণ্যদা তদা ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীতুলসী-গীতা সমাপ্তা।

অনুবাদ

যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি আমাকে একটী মাত্রও ভগ্ন পত্র প্রদান করে সেই বাসনায় আমি সর্ব্বদা তুলসী কাননে অবস্থান করিয়া থাকি ॥ ২৭ ॥

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা মুখে "তুলসী" নাম উচ্চারণ করে, যমরাজ বিষন্ন বদন হইয়া তাহার নাম স্বীয় যম পঞ্জিকা হইতে মুছিয়া ফেলেন ॥ ২৮ ॥

হে দেবি। শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে যদি বুধবার ও শ্রবণা নক্ষত্র যোগ হয় তাহা হইলে তৎকালে তুলসী দেবী অধিকতর পুণ্যদায়িনী হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীতুলসী গীতার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

# শ্রীবৈষ্ণব-গীতা।

অম্বরীষ উবাচ।

কেনোপায়েন দেবর্ষে ভববন্ধাৎ বিমুচ্যতে।
তবদস্ব মহাভাগ যদ্যস্তি ময্যনুগ্রহঃ॥ ১॥

নারদ উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ সর্ব্বধর্মভৃতাং বর।
বক্ষ্যামি তব রাজেন্দ্র শৃণুষ্বাবহিতো মম॥ ২॥
কৈবল্যদায়িনী গীতা শ্রীবৈষ্ণব-গীতাভিধা।
শৃণুষ্ব পরয়া ভক্ত্যা ভববন্ধবিমুক্তয়ে॥ ৩॥
বৈষ্ণবানাং গতির্যত্র পাদ স্পর্শশ্চ যত্র বৈ।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি নৃপসত্তম॥ ৪॥
আলাপং গাত্র সংস্পর্শং পাদাভিবন্দনস্তথা।
বাঞ্ছন্তি সর্ব্বতীর্থানি বৈষ্ণবানাং সদৈব হি॥ ৫॥

---

অনুবাদ

পরম ভাগবত মহারাজ অম্বরীষ মহাভাগ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দেবর্ষে! যদি আমার প্রতি আপনার কিঞ্চিৎ মাত্রও অনুগ্রহ থাকে তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন কি উপায়ে ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায়॥ ১॥

নারদ, মহারাজ অম্বরীষের প্রশ্নে বিশেষ প্রীত হইয়া বলিলেন—হে ধার্ম্মিক প্রবর মহাভাগ রাজেন্দ্র। তুমি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি স্থির চিত্তে শ্রবণ কর॥ ২॥

হে রাজন্। বৈষ্ণব গীতা নাম্নী যে গীতা আছে, তাহার প্রসাদেই কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে, তুমি ভববন্ধন মোচনার্থ ভক্তি সহকারে উক্ত বৈষ্ণব গীতা পাঠ অথবা শ্রবণ কর॥ ৩॥

হে নৃপসত্তম। বৈষ্ণবেরা যে সকল স্থানে গমন করেন, যে সকল স্থানে তাঁহাদের পদ স্পর্শ হয় সেই সকল স্থানে সকল তীর্থ নিত্য অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে॥ ৪॥

বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিতে, তাঁহাদিগের গাত্র স্পর্শ করিতে এবং

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকানাং শুদ্ধং পাদোদকং শুভম্।
পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি বসুধামপি ভূপতে ॥ ৬ ॥
নিপীড়িতোঽহং শ্রান্তোঽহং দীর্ঘ সংসারবর্ত্মনি।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি তৎকুরুষ্ব শ্রীবৈষ্ণব ॥ ৭ ॥
দীনঞ্চ ভক্তিহীনঞ্চ আধিব্যাধি নিপীড়িতম্।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং কৃপয়া প্রভো ॥ ৮ ॥
গতির্নাস্তি গতির্নাস্তি সত্যং শ্রীবৈষ্ণবং বিনা।
তৎপাদ রজসা পূতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৯ ॥
কথিতং তব রাজেন্দ্র রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
অভক্তায় ন দাতব্যং দত্তে তু নারকী ভবেৎ ॥ ১০ ॥
ইতি শ্রীঅম্বরীষ-নারদ সংবাদে শ্রীবৈষ্ণব-গীতা সমাপ্তা।

অনুবাদ

তাঁহাদিগের পাদাভিবন্দন করিতে সকল তীর্থ সর্ব্বদা বাঞ্ছা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

হে রাজন্! বিষ্ণু মন্ত্রোপাসকদিগের শুভপ্রদ পবিত্র পাদোদক বসুধা স্থিত নিখিল তীর্থকে পবিত্র করে ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণবগণের নিকট নিত্য প্রার্থনীয়- হে বৈষ্ণব! আমি দীর্ঘ সংসার পথে পরিভ্রমণ করিয়া বড়ই শ্রান্ত হইয়াছি, যাহাতে পুনরায় আর এই পথে আমাকে গমন করিতে না হয় আপনি কৃপা করিয়া তাহা করুন ॥ ৭ ॥

আমি অতি দীনহীন, ভক্তি বর্জ্জিত, আধিব্যাধি প্রপীড়িত, অনাশ্রয়, হে অনাথ বন্ধো! কৃপা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৮ ॥

পুনর্ব্বার সত্য করিয়া নারদ বলিতেছেন—বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত সংসারে পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই। বৈষ্ণবের চরণ ধূলি চরাচর সকল ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার নিকটে বৈষ্ণব-গীতা-রহস্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। অবিশ্বাসী বা তার্কিক অভক্তকে ইহা কদাপি প্রদান করিও না করিলে নরক বাস ঘটিবে ॥ ১০ ॥

**ইতি শ্রীবৈষ্ণব-গীতার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।**

# সপ্তশ্লোকী-গীতা। *

**শ্রীভগবানুবাচ।**

ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাংগতিম্॥ ১ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ২ ॥

---

**অনুবাদ**

শ্রীভগবান বলিতেছেন—ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক ব্রহ্মস্বরূপকে উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করে অন্তে সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়॥১॥

তিনি (ব্রহ্ম) সর্ব্বত্র হস্তপদ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন॥২॥

---

* সপ্তশ্লোকী গীতার শ্লোকগুলি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারই কিন্তু আমরা যে কয়খানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি সকলগুলিতে শ্লোক সংখ্যা বিভিন্ন রকম দেখিতে পাই। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের সংস্করণে সাতটী শ্লোকই আছে কিন্তু অন্যান্য সংস্করণে দেখিলাম ৩ শ্লোকের পর "প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন, ভক্ত্যাযুক্তো যোগ বলেন চৈব। ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্, সতং পরং পুরুষমুপৈতিদিব্যম্॥" এবং ৫ম শ্লোকের পর "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥" এই দুটী শ্লোক অতিরিক্ত আছে। অধিকন্তু একখানি সংস্করণে দেখিলাম ৪র্থ শ্লোকের পরে "প্রয়াণকালে মনসা" প্রভৃতি শ্লোকটী ধরিয়া একটী শ্লোক করিয়াছেন। কিন্তু মূলগীতায় তাহা নাই। তারপর প্রভুপাদের সংস্করণে ৬ষ্ঠ সংখ্যক শ্লোক যাহা আছে অন্য সংস্করণে তৎপরিবর্ত্তে "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আমরা আমাদিগের সংস্করণে প্রভুপাদের সংস্করণানুযায়ী মূলে রাখিয়া অন্যান্য সংস্করণের অতিরিক্তাংশ ফুটনোটে দিয়া দিলাম।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কবিং পুরাণ মনু শাসিতারম্
অণোরণীয়ান্ সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৪ ॥
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ৫ ॥

---

অনুবাদ

ভগবৎসখা অর্জ্জুন বলিতেছেন:- হে হৃষীকেশ! তুমি এইরূপ অদ্ভুত প্রভাব সম্পন্ন এবং ভক্তবৎসল, অতএব তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে কেবল আমি নহে সমগ্রজগৎ যে অতিশয় হৃষ্ট ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে আর সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন এ সকলেই যুক্তি সঙ্গত অর্থাৎ ইহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥৩॥

শ্রীভগবান বলিতেছেন—সেই চিন্তনীয় পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ও অনাদি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম, সকলের পালক, বিধাতা অপরিমিত মহিমাহেতু অচিন্ত্যস্বরূপ অর্থাৎ মলিন মনোবুদ্ধির অগোচর, সূর্য্যের ন্যায় জগৎ প্রকাশক এবং প্রকৃতির পর বর্ত্তমান অর্থাৎ সপ্রপঞ্চ প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া অবস্থিত ॥৪॥

একান্ত ভক্তিদ্বারা পরমেশ্বরের ভজনকারী ব্যক্তি তৎপ্রসাদলব্ধ জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ করেন কিন্তু বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির একান্ত ভক্তি দ্বারা জ্ঞান অসম্ভব, এইজন্য যথার্থ জ্ঞানী কে, তাহাই রূপকচ্ছলে সংসার বৃক্ষের বর্ণনাদ্বারা বলিতেছেন—ঊর্দ্ধ—উত্তম অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষোত্তম যাহার মূল, এবং অধঃ অর্থাৎ কার্য্যোপাধি বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাদি যাহার শাখা আর অনাদি কাল প্রবৃত্ত বলিয়া অব্যয় অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত যাহা ছেদন করা যায় না, এতাদৃশ সংসার বস্তুতঃ বিনশ্বর বলিয়া শ্বঃ অর্থাৎ পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ৬ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সপ্তশ্লোকী গীতা সম্পূর্ণা।

---

অনুবাদ

থাকিবে এরূপ বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া যাহাকে অশ্বত্থ বলা হয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলের দ্বারা পত্রের ন্যায় সর্ব্ব জীবের আশ্রয়নীয়ত্ব প্রতিপাদন জন্য বেদ সকল যাহার পত্র তাহাকে অর্থাৎ সেই সংসারকে যিনি বিদিত হন তিনিই বেদজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ॥৫॥

আমি সর্ব্ব প্রাণীর বুদ্ধি বৃত্তিতে অন্তর্য্যামীরূপে অধিষ্ঠিত আছি অতএব আমা হইতেই প্রাণিগণের পূর্ব্বানুভব হইতে জাত বিষয় জনিত স্মৃতি অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ জাত জ্ঞান এবং তদুভয়ের বিলোপ সাধিত হইয়া থাকে। আমিই বেদ সমূহে-সেই সেই বেদোক্ত দেবতারূপে জানিবার বিষয় এবং আমিই বেদান্ত কৃৎ আচার্য্যরূপে শিষ্যগণের নিকট বেদান্তের অর্থ প্রকাশক এবং আমিই বেদার্থ পরিজ্ঞাতা ॥৬॥

ভজন প্রকার দর্শাইয়া প্রস্তাবের উপসংহার পূর্ব্বক বলিতেছেন—তুমি মচ্চিত্ত, মৎসেবক ও মদুপাসক হও, আমাকে প্রণাম কর এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই পরমেশ্বর একমাত্র গতি এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া মনকে আমাতে সমাহিত করিতে পারিলে পরমানন্দরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥৭॥

ইতি সপ্তশ্লোকী-গীতার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অথ ফলশ্রুতিঃ। *

শ্রীভগবানুবাচ।

যো মাং গীতাসমূহেন স্তোতুমিচ্ছতি পাণ্ডব।
স এব সপ্তভিঃশ্লোকৈঃ স্তুত এব ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

ইতি সপ্তশ্লোকী-গীতা-ফলশ্রুতিঃ সমাপ্তা।

ফলশ্রুতিঃ

সপ্তশ্লোকী গীতা পাঠের ফল বর্ণনা করিয়া স্বয়ং শ্রীভগবান বলিতেছেন—যে কেহ আমার সমূহ গীতার স্তবেচ্ছু হইবে আমি তাহা কর্ত্তৃক এই সপ্ত শ্লোকেই নিশ্চয় স্তুত হইব অর্থাৎ এই সপ্তশ্লোকী-গীতা পাঠে সমগ্র অষ্টাদশাধ্যায় গীতা পাঠের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে পাণ্ডব! (অর্জ্জুন) ইহাতে তুমি বিন্দুমাত্র সংশয় মনে আনিও না ॥১॥

ইতি সপ্তশ্লোকী-গীতার ফলশ্রুতির বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

---

* বহুদিন পূর্ব্বে পঞ্চবিংশতি গীতার একটী সংস্করণ বাহির হইয়াছিল তাহাতে সপ্তশ্লোকী গীতার এই ফলশ্রুতিটী দেখিতে পাওয়া যায়।

# শ্রীশ্রীগুরুগীতা।

## অথ শ্রীগুরুগীতাপাঠ নিয়মঃ—

অথ শ্রীগুরুগীতা স্তোত্রস্য পরম শিবঋষির্বিরাটুচ্ছন্দঃ শ্রীগুরুঃ পরমাত্মা দেবতা হং বীজং সং শক্তিঃ ক্রৌঁ কীলকং শ্রীগুরোঃ প্রসাদাৎ পরমার্থ সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।

হং সাং সূর্য্যাত্মনে হৃদয়ায় নমঃ। হং সীং সোমাত্মনে শিরসে স্বাহা। হং সূং নিরঞ্জনাত্মনে শিখায়ৈ বষট্। হং সৈং নিরাভাসাত্মনে কবচায় হুঁ। হং সৌং অণুসূক্ষ্মাত্মনে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হং সঃ অব্যক্তাত্মনে অস্ত্রায় ফট্।

হং সাং সূর্য্যাত্মনে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হং সীং সোমাত্মনে তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হং সূং নিরঞ্জনাত্মনে মধ্যমাভ্যাং বষট্। হং সৈং নিরাভাসাত্মনে অনামিকাভ্যাং হুঁ। হং সৌং অণুসূক্ষ্মাত্মনে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হং সঃ অব্যক্তাত্মনে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এইরূপ ভাবে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া নিম্ন লিখিত ধ্যান করিবে। ধ্যান যথাঃ—

হংসাভ্যাং পরিবর্ত্তপত্র কমলে দিব্যৈ র্জগৎকারণৈ-
বিশ্বোৎকীর্ণমনেক দেহ নিলয়ং স্বচ্ছন্দসাত্মেচ্ছয়া।
তত্তৎযোগ্যতয়া স্বদেশিক তনুং ভাবৈক দীপ্তাঙ্কুরং
প্রত্যক্ষাক্ষর বিগ্রহং গুরুপদং ধ্যায়েদ্বিবাহুং গুরুম্॥
বিশ্বব্যাপকমাদিদেবমমলং নিত্যং পরং নিষ্কলং
নিত্যো দ্বন্দ সহস্র পত্রকমলে নিত্যাক্ষরৈর্মণ্ডপে।
নিত্যানন্দমনন্তপূর্ণমখিলং তদ্ব্রহ্ম নিত্যং স্মরেৎ
আত্মানং স্বমনুপ্রবিশ্যকুহরে স্বচ্ছন্দতঃ সর্ব্বগঃ॥
শ্রীগুরুং গৌরহৃদয়ং শান্তং করুণশালিনং
বরাভয়করং ধ্যায়ে প্রণম্য ত্রিলকালকম্।
শুদ্ধস্বর্ণরুচিং শুদ্ধভাবভূষাকলেবরং
সচ্চিদানন্দ সাম্রাজ্যং করুণামৃত বর্ষিণম্॥

শশাঙ্কাযুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরং
শুক্লাম্বরং শুরুং শুদ্ধং শুক্লমাল্যানুলেপনম্।
শিষ্যানুগ্রহ সন্ধান স্মিত নিত্যযুতাননং
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসেবাদি দাতারং দীনপালকম্॥
সমস্ত মঙ্গলাধারং সর্ব্বানন্দময়ং বিভুং।
ধ্যায়ে শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দমস্তুতে॥

এইরূপে গুরুকে ইষ্টদেবের প্রকাশ-মূর্ত্তি মনে করিয়া তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি চিন্তা করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিয়া গুরুগীতা পাঠ করিবে। প্রণাম মন্ত্র, যথা—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

———

# শ্রীশ্রীগুরুগীতা

ঋষয় উচুঃ।

গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরা বিদ্যা গুরুগীতা বিশেষতঃ।
তৎপ্রসাদাচ্চ শ্রোতব্যা তৎসর্ব্বং ব্রূহি মে সূত ॥১॥

সূত উবাচ।

কৈলাসশিখরে রম্যে ভক্তিসাধন তৎপরা।
প্রণম্য পার্ব্বতী ভক্ত্যা শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥২॥

নমো নমো দেবদেব পরাৎপর জগদ্‌গুরো।
সদাশিব মহাদেব গুরুগীতাং প্রদেহি মে ॥৩॥

কেন মার্গেণ বা স্বামীন্ দেহী ব্রহ্মময়োভবেৎ।
তৎকৃপাং কুরু মে ব্রহ্মন্ নমামি চরণং তব ॥৪॥

---

অনুবাদ

ঋষিগণ বলিলেন—হে সূত! আপনার অপরিসীম কৃপার বিষয় স্মরণ করিয়াই আমরা আত্মবিদ্যা হইতেও পরম গুহ্যতম যে শ্রীগুরুগীতা তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া শ্রীগুরু গীতা বিস্তৃতভাবে বলুন ॥ ১ ॥

ঋষিগণের প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া সূত বলিলেন—হে মুনিগণ! একদিন কৈলাস পর্ব্বতোপরি ভক্তি-সাধন-তৎপরা পার্ব্বতীদেবী নিজ পতি শঙ্করকে ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২ ॥

হে পরাৎপর! হে জগদ্‌গুরো! হে দেবদেব! হে সদাশিব! হে মহাদেব! আপনাকে বার বার নমস্কার করি, আপনি পরম পবিত্র শ্রীগুরুগীতা দয়া করিয়া আমাকে বলুন ॥ ৩ ॥

হে স্বামিন্! আপনার শ্রীচরণে নমস্কার করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বলুন যে, মানবগণ কোন্ শ্রেয় পথ অবলম্বন করিলে ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ অভীষ্ট দেবতার কৃপা সম্যক রূপে লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৪ ॥

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

যস্যদেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈ তে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশ্যন্তে মহাত্মভিঃ।
মমরূপাসি দেবিত্বং ত্বৎ প্রীত্যর্থং বদাম্যহম্ ॥৫॥
লোকোপকারকঃ প্রশ্নো ন কেনাপি কৃতঃ পুরা।
দুর্লভং ত্রিষুলোকেষু তৎ শৃণুষ্ববদাম্যহম্।
কিঞ্চিদ্‌গুরুকং বিনা নান্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে ॥৬॥
বেদশাস্ত্র পুরাণানি ইতিহাসাদিকানি চ।
যন্ত্রমন্ত্রাদিবিদ্যানাং মৃত্যুকচ্চাটনাদিকম্ ॥৭॥
শৈবশাক্তাগমাদীনি অন্যব্বহুমতানি চ।
অপভ্রংশানি শাস্ত্রাণি জীবানাং ভ্রান্তচেতসাম্ ॥৮॥

অনুবাদ

পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলিলেন, দেবি! বহু বিষয়েতেই তুমি আমার তুল্যতা পাইয়াছ, এক্ষণে যখন পুনরায় তোমার শ্রীগুরুগীতা শ্রবণের অভিলাষ হইয়াছে তখন তোমার প্রীতির জন্য আমি শ্রীগুরুগীতা বলিতেছি, নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি, দেবতা ও শ্রীগুরুকে একরূপ ভক্তি করে অর্থাৎ ভেদ জ্ঞান না করে, সাধুগণ সেইরূপ ব্যক্তির নিকটই তোমার কৃত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

হে বরাননে! এরূপ সর্ব্বলোক হিতকর প্রশ্ন ইতি পূর্ব্বে অন্য কেহই আমার নিকট করে নাই, কাজেই তোমার এই প্রশ্ন ত্রিলোক দুর্লভ অর্থাৎ অতিশয় প্রশংসনীয় বলিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে আমি তোমার নিকট তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি নিশ্চয় জানিবে, এবং অবশ্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে যে, জগতে একমাত্র সত্য বস্তু শ্রীগুরু। শ্রীগুরু ব্যতীত আর দ্বিতীয় সত্য জগতে নাই ॥ ৬ ॥

শ্রীগুরু-ভক্তিহীন ভ্রান্ত-চিত্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদি এবং যন্ত্র, মন্ত্র, মারণ, উচ্চাটনাদি ষট্‌কর্ম্ম ও শৈব শাক্তাদির অভীষ্ট ভজন পদ্ধতি এবং অপরাপর যে সকল মত আছে সমস্তই অকর্ম্মণ্য জানিবে। অর্থাৎ শ্রীগুরু-সেবা বিহীন অথবা শ্রীগুরু উপেক্ষিত ব্যক্তি যতই সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুক না কেন তাহার ফল বিপরীতই হইয়া থাকে ॥ ৭—৮ ॥

বেদশাস্ত্র পুরাণানি কৃত্বা বৈ গুরুকামায়া ।
স্বয়ং লোকগুরুঃ সাক্ষাৎ জায়তে বেদতত্ত্ববিৎ ॥৯॥
যজ্ঞব্রত তপোদানং জপ তীর্থানুসেবনম্ ।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ ।
গুরুবুদ্ধ্যাত্মনো নান্যৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥১০॥
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃ পাদসেবনাৎ ।
সর্ব্বতীর্থাবগাহানাং ফলংপ্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥১১॥
গুরুপাদোদকং সম্যক্ সংসারার্ণবতারণম্ ।
অজ্ঞান-মূলহরণং জন্মকর্ম্মনিবারণম্ ।
জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং গুরুপাদোদকং পিবেৎ ॥১২॥
গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষ্ট ভোজনম্ ।
গুরুমূর্ত্তেঃ সদাধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ ॥১৩॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি শ্রীগুরুর সন্তোষ কামনায় বেদ, স্মৃতি, এবং পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ করে বা আলোচনা করে সেই ব্যক্তিই স্বয়ং লোকগুরু, তাহাকেই বেদজ্ঞ বলিয়া জানিবে ॥ ৯ ॥

শ্রীগুরুতত্ত্ব অবগত না হইয়া যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, জপ, দান বা তীর্থ সেবাদি যাহাই করুক না কেন সকলই বৃথা হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। পুনরায় বলিতেছি যে, শ্রীগুরু এবং স্বীয় আত্মায় সর্ব্বদা অভেদ জ্ঞান রাখিবে। পূর্ব্বেও তোমাকে বলিয়াছি শ্রীগুরুই একমাত্র সত্যবস্তু শ্রীগুরুব্যতীত আর কোন সত্যবস্তু জগতে নাই ॥ ১০ ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিয়া যে বিশুদ্ধাত্মা হইয়াছে— তাহার সত্য সত্যই যাবতীয় তীর্থস্নানের ফললাভ হইয়াছে জানিবে ॥ ১১ ॥

শ্রীগুরুপাদোদক জীবের অজ্ঞানমূল ও জন্ম কর্ম্মাদির বীজ সমূলে বিনাশ করিয়া ভবসিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া দেয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের জন্য প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে শ্রীগুরুর চরণামৃত পান করিবে ॥ ১২ ॥

শ্রীগুরুর পাদোদক পান, শ্রীগুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন, শ্রীগুরুর মূর্ত্তি ধ্যান এবং শ্রীগুরু-স্তোত্র পাঠ ও মন্ত্রাদি জপ জীব মাত্রেরই সর্ব্বদা অবশ্য করণীয় ॥ ১৩ ॥

কাশীক্ষেত্রং নিবাসোঽস্য জাহ্নবী চরণোদকম্।
গুরুবিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতম্॥১৪॥
তীর্থরাজঃ প্রয়াগোঽসৌ গুরুমূর্ত্তৌ নমোনমঃ।
গুরুমূর্ত্তিং স্মরেন্নিত্যং গুরুনাম সদা জপেৎ।
গুরুরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥১৫॥
গুরুবক্ত্রে স্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তৎ প্রসাদতঃ।
স্বাশ্রমোক্তং স্বজাতিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং পুষ্টিবর্দ্ধিনীম্।
অন্যৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ॥১৬॥
গুরুবক্ত্রে স্থিতা বিদ্যা গুরুভক্ত্যানুলভ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু॥১৭॥
গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥১৮॥

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেবের নিবাস স্থল কাশীধাম সদৃশ, শ্রীগুরু পাদোদক গঙ্গাজল তুল্য, আর শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর স্বরূপ। অতএব নিঃসন্দেহ মনে শ্রীগুরুদেবকে স্বয়ং তারক ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিবে॥ ১৪॥

শ্রীগুরুকে তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ ক্ষেত্র স্বরূপ মনে করিয়া বারম্বার নমস্কার করিবে। সর্ব্বদা শ্রীগুরু মূর্ত্তি স্মরণ, শ্রীগুরু নাম জপ এবং অবিচার্য্য ভাবে শ্রীগুরু দেবের আদেশ পালন করিবে। শ্রীগুরু-রূপ ভিন্ন অন্য বস্তুর ভাবনা মনে স্থান দিবে না॥ ১৫॥

শ্রীগুরু মুখেই অব্যয় ব্রহ্মত্ব বিষয়ক যে কিছু উপদেশ তাহা অবস্থিত, সুতরাং শ্রীগুরুদেবের কৃপা ভাজন হইতে পারিলেই অনায়াসে অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্ব স্ব আশ্রমোচিত ও স্ব স্ব জাতিগত অনুষ্ঠানে রত থাকিবে কিন্তু তাহাকেই চরম মনে করিও না। নিজ কীর্ত্তি প্রচারের জন্য লালায়িত না হইয়া শ্রীগুরু-চিন্তাতেই মনোনিবেশ করিবে, অন্য চিন্তা মনে স্থান দিবে না॥ ১৬॥

যাবতীয় বিদ্যা শ্রীগুরু মুখেই আছে, ভক্তি সহকারে শ্রীগুরু সেবা করিলে তৎ সমস্তই লাভ হইতে পারে, সুতরাং ঐকান্তিক মনে শ্রীগুরু উপাসনা করিবে॥ ১৭॥

'গু' শব্দে অন্ধকার এবং 'রু' শব্দে তেজ বুঝায়। যিনি অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করেন তিনিই গুরু বলিয়া কথিত হন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ১৮॥

গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদি গুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়াভ্রান্তি বিমোচকঃ ॥১৯॥
গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার নিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥২০॥
এবং গুরুপদং শ্রেষ্ঠং দেবানামপি দুর্লভং।
হাহা হূহূ গণৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বাদ্যৈশ্চ পূজ্যতে ॥২ ॥
আসনং শয়নং বস্ত্রং বাহনং ভূষণাদিকম্।
সাধকেন প্রদাতব্যং গুরোঃ সন্তোষ কারণাৎ ॥২২॥
দীর্ঘদণ্ডং নমস্কৃত্য নির্লজ্জো গুরু সন্নিধৌ।
আত্মাদারাদিকং সর্ব্বং গুরবে চ নিবেদয়েৎ ॥ ৩॥
কৃমিকীট ভস্মবিষ্ঠা দুর্গন্ধ মলমূত্রকম্।
শ্লেষ্মারক্তত্বচং মাসং তন্বুরিত্থং বরাননে ॥২৪॥

---

অনুবাদ

গুরুর প্রথম বর্ণ 'গু' মায়াদি সংসার বন্ধন যোগ্য গুণ প্রকাশক ব্রহ্ম, আর দ্বিতীয় বর্ণ 'রু' পূর্ব্বোক্ত মায়াভ্রান্তি বিনাশক ব্রহ্ম ॥ ১৯ ॥

'গু' শব্দে অন্ধকার 'রু' শব্দে তাহার বিনাশক পদার্থ বুঝায়, অতএব যিনি অজ্ঞান রূপ ঘোর অন্ধকার বিনাশ করিয়া দেন তিনিই গুরু বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হন ॥ ২০ ॥

এতাদৃশ যে গুরুদেব তিনি অত্যন্ত শ্রেয় এই নিমিত্ত হাহা-হূহূগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ নিয়ত ঐ শ্রীগুরু পাদপদ্ম অর্চ্চনা করেন ॥ ২১ ॥

শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ কামনায় সাধকগণ আশন, শয্যা, বস্ত্র, বাহন ও ভূষণাদি ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীগুদেবকে দান করিবে ॥ ২২ ॥

লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং আত্মাদারাদি আপন বলিতে যাহা কিছু আছে সমস্তই শ্রীগুরু পাদপদ্মে সমর্পণ করিবে ॥ ২৩ ॥

হে বরাননে! দেহের আদর যত্নে জীব সর্ব্বদা ব্যস্ত, প্রাণবায়ু চলিয়া গেলে, তাহা কৃমি, কীট অথবা ভস্মাদি অশুচি বস্তুতে পরিণত হয়। ভাবিয়া দেখ জীবিত অবস্থাতেও দুর্গন্ধময় মল, মূত্র, শ্লেষ্মা, শোণিত, চর্ম্ম এবং মাংসাদি নির্ম্মিত একটা স্থূল পিণ্ড ভিন্ন দেহ আর কিছুই নহে ॥ ২৪ ॥

সংসার বৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২৫॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২৬॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২৭॥
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮॥
স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২৯॥
চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩০॥

অনুবাদ

এইরূপ অশুচি দেহ অবলম্বন করিয়াই মানব সংসাররূপ বৃক্ষে আরোহণ করে এবং নানবিধ কুকর্ম্ম করিয়া নরকার্ণবে নিপতিত হয়। যিনি এইরূপ অধোগামী নরকস্থ জীবকে উদ্ধার করেন সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ২৫ ॥

শ্রীগুরুই ব্রহ্মা, শ্রীগুরুই বিষ্ণু, শ্রীগুরুই মহাদেব এবং এই শ্রীগুরুই পরমব্রহ্ম এই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ২৬ ॥

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকার দ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমির বিনাশ করিয়া দিব্য-চক্ষু প্রদান করেন সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥

অখণ্ড মণ্ডলাকারে যিনি নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন সেই ব্রহ্মপদকে যিনি কৃপা করিয়া দর্শন করান সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ২৮ ॥

যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবী ও অপরাপর যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন সেই ব্রহ্মপদ দর্শন করাইবার কর্ত্তা যে শ্রীগুরুদেব তাঁহার চরণে নমস্কার ॥ ২৯ ॥

যিনি চরাচর ত্রিলোকে চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় পরমেশ্বর রূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন সেই ব্রহ্মপদ যিনি দর্শন করান সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন বিরাজিত পদাম্বুজম্।
বেদান্তাম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩১॥
চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩২॥
জ্ঞানশক্তি সমারূঢ়ং তত্ত্ব-মালা বিভূষিতম্।
ভুক্তি মুক্তি প্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩৩॥
অনেক জন্ম সংপ্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধ বিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩৪॥
শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদম্
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩৫॥
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩৬॥

অনুবাদ

যাঁহার পাদপদ্ম সমস্ত শ্রুতি অর্থাৎ বেদশিরোমনিতে পরিশোভিত, যিনি বেদান্তরূপ কমলের পক্ষে দিবাকর স্বরূপ অর্থাৎ যিনি নিখিল বেদ-বেদান্তের প্রকাশক সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥

যিনি চৈতন্য স্বরূপ, নিত্য, শান্ত, আকাশের ন্যায় নিস্পৃহ, নিরঞ্জন বা তেজোময় এবং নাদ-বিন্দু-কলার অতীত অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের অতীত সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥৩২॥

যিনি জ্ঞান শক্তি সংযুক্ত, তত্ত্বসকল যাঁহাকে মাল্যরূপে অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে, যিনি ভোগ ও মোক্ষপ্রদ সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥৩৩॥

যিনি জীবকে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া বহু জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম বন্ধন সকল মোচন করেন সেই পরম পুরুষ শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥৩৪॥

যাঁহার পাদোদক ভবসিন্ধু শোষণ করে, যিনি সার সম্পদ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানরূপ পরমধন প্রাপ্তির উপায় সম্যকরূপে বলিয়া দেন সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥৩৫॥

শ্রীগুরু হইতে তত্ত্বজ্ঞান অধিক নহে শ্রীগুরু সেবা হইতে অন্য তপস্যাও অধিক নহে এবং যে গুরু-তত্ত্বজ্ঞানের অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে নাই সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার ॥৩৬॥

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩৭॥
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্‌ ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩৮॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজা মূলং গুরোঃ পদম্‌ ।
মন্ত্রমূলংগুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥৩৯॥
সপ্তসাগরপর্য্যন্তং তীর্থ স্নানাদিকৈঃ ফলম্‌ ।
গুরোরঙ্ঘ্রি জলং বিন্দু সহস্রাংশেন দুর্লভম্‌ ॥৪০॥
গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্‌ ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্‌ গুরুম্‌ ॥ ৪১ ॥
জ্ঞানং বিনা মুক্তি পদং লভতে গুরু ভক্তিতঃ ।
গুরোঃ পবতরং নাস্তি ধ্যেয়োঽসৌ গুরুমার্গিণা ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ

যিনি আমার স্বামী তিনিই নিখিল জগতের স্বামী, যিনি আমার গুরু তিনিই জগতের গুরু, যিনি আমার আত্মা তিনিই সর্ব্বভূতাত্মা। এমন যে বিশ্বময় শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে নমস্কার ॥৩৭॥

শ্রীগুরুই সকলের আদি অথচ তিনি আদি ও অন্তরহিত, শ্রীগুরুই পরম দেবতা তাঁহাকে নমস্কার ॥৩৮॥

শ্রীগুরু-মূর্ত্তি-ধ্যানই যাবতীয় ধ্যানের মূল, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-পূজাই যাবতীয় পূজার মূল, শ্রীগুরু মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত বাক্যই সমস্ত মঙ্গলের মূল এবং শ্রীগুরু-কৃপাই মুক্তির মূল কারণ জানিবে ॥৩৯॥

সপ্তসাগর হইতে গঙ্গাদি যাবতীয় তীর্থজলে অবগাহন করিলে যে ফল লাভ হয় শ্রীগুরু-চরণোদক তাহা হইতে অধিক ফল প্রদান করে। এমন কি শ্রীগুরু-চরণোদক উহা হইতে সহস্রাংশে দুর্লভ বলিয়াও কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥৪০॥

শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই দেবত্রয়ের স্বরূপ এবং নিখিল জগৎ-স্বরূপ। শ্রীগুরু অপেক্ষা প্রধান বস্তু আর কিছুই নাই। এ কারণ শ্রীগুরুদেবকে সম্যক্‌প্রকারে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪১ ॥

জ্ঞান অভাবেও কেবল মাত্র গুরুভক্তি বলেই মুক্তিলাভ করিতে পারা

তস্মাৎ পরতরং নাস্তি "নেতি নেতীতি" বৈ শ্রুতিঃ।
কর্ম্মণা বচসা চৈব সর্ব্বদারাধয়েৎ গুরুম্ ॥ ৪৩ ॥
গুরোঃ কৃপা প্রসাদেন ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সদাশিবঃ
সৃষ্ট্যাদিক সমর্থাস্তে কেবলং গুরুসেবয়া ॥ ৪৪ ॥
দেব-কিন্নর-গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষ-চারণাঃ।
মুনয়োঽপি ন জানন্তি গুরু শুশ্রূষণাবিধিম্ ॥ ৪৫ ॥
ন মুক্তা দেব-গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো যক্ষ কিন্নরাঃ।
ঋষয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধাশ্চ গুরু সেবা পরাঙ্মুখাঃ ॥ ৪৬ ॥
ধ্যানং শৃণু মহাদেবি সর্ব্বানন্দ প্রদায়কম্।
সর্ব্ব সৌখ্যকরং নিত্যং ভক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্ ॥ ৪৭ ॥
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি, শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি, শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ

যায়, সুতরাং শ্রীগুরুব্যতীত পরম পদার্থ আর কি হইতে পারে? অতএব শ্রীগুরু-পথগামী মানবগণ এই প্রকারে নিয়ত শ্রীগুরুদেবের ধ্যানে রত থাকিবে ॥ ৪২ ॥

শ্রুতি-কথিত "নেতি নেতি" বাক্যদ্বারা শ্রীগুরুব্যতীত অপর সকল বস্তুর নিকৃষ্টতাই প্রকাশ হইয়াছে। মোটকথা শ্রীগুরুব্যতীত আর শ্রেষ্ঠবস্তু কিছুই নাই সুতরাং কায়িক বা বাচিক সকল প্রকারেই শ্রীগুরুদেবের আরাধনা করিবে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীগুরু-সেবাব্রতে সিদ্ধিলাভ করিয়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি কার্য্যে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, যক্ষ ও চরাচরগণ অধিক কি মুনিগণও শ্রীগুরুসেবাতত্ত্ব সম্যকপ্রকার অবগত নহেন, জানিবে ॥ ৪৫ ॥

যে সকল দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, যক্ষ, কিন্নর ও সিদ্ধগণ শ্রীগুরুসেবা বহির্মুখ, তাহারা কখনও মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না ॥ ৪৬ ॥

হে মহাদেবি! একণে তোমার নিকট সর্ব্বপ্রকার আনন্দদায়ক সর্ব্বপ্রকার সুখপ্রদ এবং ভোগ ও মোক্ষপ্রদায়ক শ্রীগুরুদেবের ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥

আমি পরম ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীগুরুশব্দ কীর্ত্তন করি, পরম ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীগুরু

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্,
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ ৪৯ ॥
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্॥ ৫০ ॥
হৃদম্বুজ কর্ণিক মধ্য সংস্থং সিংহাসনেসং স্থিত দিব্যমূর্ত্তিম্।
ধ্যায়েৎ গুরুং চন্দ্রকলাবতংসং সচ্চিৎ সুখাভীষ্টবর প্রদানম্ ॥৫১॥
শ্বেতাম্বরং শ্বেত বিলেপ যুক্তং মুক্তা কলাভূষিত দিব্যমূর্ত্তিম্।
বামাঙ্গপীঠে স্থিত দিব্যশক্তিং মন্দস্মিতং পূর্ণ কৃপা নিধানম্॥ ৫২ ॥

---

অনুবাদ

দেবকে ভজনা করি, পরম-ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করি এবং পরম-ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥

যে শ্রীগুরুদেব পরমব্রহ্মস্বরূপ, আনন্দময়, পরমসুখপ্রদ, একমাত্র জ্ঞানময়মূর্ত্তি, সুখদুঃখাদি মানবোচিত বন্ধনমুক্ত, আকাশতুল্য অসঙ্গ, তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিগত মহাবাক্যের একমাত্র লক্ষ্যস্থল, অদ্বিতীয়, নিত্য অর্থাৎ ধ্বংসরহিত, বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান বক্তা, নিখিলবিশ্বের সাক্ষিস্বরূপ, ভাবাতীত, ত্রিগুণ বর্জিত এতাদৃশ সদ্গুরুদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥

যিনি নিত্য, শুদ্ধ, স্বয়ং প্রকাশ, নিরাকার, নিরঞ্জন, দিব্যজ্ঞানযুক্ত এবং জ্ঞানানন্দময় বিগ্রহ সেই পরমব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫০ ॥

যিনি হৃদয়-দ্বাদশ দল-কমল-কর্ণিকামধ্যে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, দিব্যমূর্ত্তি, চন্দ্রকলাভূষণে ভূষিত, জ্ঞান, সুখ এবং জীবের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টবরপ্রদ, আমি এবম্বিধ শ্রীগুরুদেবকে ধ্যান করি ॥ ৫১ ॥

শুভ্র-বস্ত্রাবৃত, শ্বেতচন্দন-বিলেপিতাঙ্গ শ্রীগুরুদেবের মনোমোহন মূর্ত্তি মুক্তামালা মণ্ডিত এবং বামভাগে দিব্য শক্তি বিরাজিতা, বদন কমল ঈষৎ সুমধুর হাস্যযুক্ত, ইনি পরিপূর্ণ কৃপার আধার ॥ ৫২ ।

আনন্দমানন্দ করং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্র মীড্যং ভব রোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥৫৩॥
প্রাতঃশিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয় করং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকম্ ॥ ৫৪ ॥
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্।
মম শাসনতো মম শাসনতো মম শাসনতো মম শাসনতঃ ॥ ৫৫ ॥
এবম্বিধং গুরুং ধ্যাত্বা জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ং।
তদা গুরু প্রসাদেন মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
গুরুণা দর্শিতে মার্গে মনঃ শুদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ।
অনিত্যং খণ্ডয়েৎ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিদাত্ম গোচরম্ ॥ ৫৭ ॥
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমনিত্যঞ্চ জ্ঞানঞ্চ মন উচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং সমং কুর্য্যান্নান্যোপ্যাত্ম দ্বিতীয়কঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ

আনন্দময় বিগ্রহ, স্বয়ং প্রকাশ এবং যোগীগণেরও পরমারাধ্য। অসাধ্য ভবরোগ বিনাশক শ্রীগুরু-বৈদ্যবরকে আমি নিয়ত ভজনা করি ॥ ৫৩ ॥

প্রাতঃকালে শিরস্থিত শ্বেত-সহস্রদল-কমল-কর্ণিকামধ্যে দ্বিনেত্র, বর এবং অভয়প্রদান রত দ্বিভুজ, সর্ব্বদা প্রশান্তচিত্ত শ্রীগুরুদেবকে তাঁহার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক স্মরণ করিবে ॥ ৫৪ ॥

হে প্রিয়ে! আমি জীবের প্রতি এই শাসন অর্থাৎ আদেশ পুনঃ পুনঃ জানাইতেছি যে, শ্রীগুরু অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই—নাই—নাই—নাই ॥ ৫৫ ॥

এইভাবে শ্রীগুরুকে ধ্যান করিয়া স্থিরবুদ্ধি হইলে তত্ত্বজ্ঞানেব উদয় হয় তখন "আমি মুক্ত" ইত্যাকার ভাব চিন্তা করিবে ॥ ৫৬ ॥

যে ব্যক্তি শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পথে অবিচলিত ভাবে বিচরণ করে অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার মনঃশুদ্ধি অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা বিদূরিত হইয়া মনের অগোচর যাবতীয় বস্তুর প্রতি অনিত্য ভাববিশিষ্ট হয় এবং সেই সমস্তই আত্মবৎ জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

জ্ঞানের কারণ মন এবং জ্ঞেয় বস্তু সকলই বিনাশশীল, এই জন্য জ্ঞান এবং জ্ঞাতব্যবিষয় মাত্রেই অনিত্য। এক আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তুরই যে নিত্যতা নাই, সাধকব্যক্তির সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করাই শ্রেয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

এবং শ্রুত্বা মহাদেবি গুরুনিন্দাং করোতি যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৫৯ ॥
যাবদ্দেহান্ত কালোঽস্তি তাবদ্দেবি গুরুং স্মরেৎ।
গুরুলোপো ন বক্তব্যঃ স্বচ্ছন্দং যদি ভাবয়েৎ ॥ ৬০ ॥
গুরোরগ্রে ন বক্তব্যমসত্যঞ্চ কদাচন।
যো বৈ হুংকৃত্য হুং কৃত্যগুরুং নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
অরণ্যে নির্জ্জন স্থানে স ভবেৎ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৬১ ॥
মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি।
কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরু রক্ষতি পার্ব্বতি ॥ ৬২ ॥
অশক্তা হি সুরাঃ সর্ব্বে অশক্তা মুনয় স্তথা।
গুরু শাপহতাঃ ক্ষীণাঃ ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি এই প্রকার পবিত্রাদপি পবিত্র শ্রীগুরুতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও শ্রীগুরুনিন্দা করে, হে মহাদেবি! সেই ব্যক্তি চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে ॥ ৫৯॥

হে দেবি! যতদিন শরীর বিনাশ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইভাবে শ্রীগুরুকে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গুরুদেবের লোপ হইয়াছে অর্থাৎ মৃত্যু হইয়াছে ইত্যাকার বাক্য কখনও মুখে আনিতে নাই ॥ ৬০ ॥

শ্রীগুরু-সমীপে কখনও মিথ্যা বলিতে নাই। যে ব্যক্তি হুঙ্কার করিয়া বাক্‌বিতণ্ডা দ্বারা শ্রীগুরুকে পরাজয় করে, সে নরাধম তার্কিক, দেহান্তে জনশূন্য অরণ্য মধ্যে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া অবস্থান করে ॥ ৬১ ॥

হে পার্ব্বতি! মুনিগণ, নাগগণ এমন কি দেবগণও যদি অভিসম্পাত প্রদান করেন শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলে যে সমস্ত আপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, অধিক কি অনিবার্য্য মৃত্যু ভয় হইতেও শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিতে সমর্থ ॥ ৬২ ॥

অপরদিকে গুরুশাপাহত-ব্যক্তিকে দেবতা কিম্বা মুনিগণও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না, পরন্তু অভিশাপগ্রস্তব্যক্তি সর্ব্ববিধ শক্তি-শূন্য হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই একেবারে ক্ষয় হইয়া যায় ॥ ৬৩ ॥

মন্ত্ররাজ মিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষর দ্বয়ং।
শ্রুতি বেদান্ত বাক্যেন গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদম্॥ ৬৪॥
শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরু সেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিনঃ॥ ৬৫॥
গুরুকৃপা প্রসাদেন আত্মারামো হি লভ্যতে।
অনেন গুরুমার্গেণ আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥ ৬৬॥
আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং পরমাত্ম স্বরূপকম্।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগদ্‌গুরুম্॥ ৬৭॥
বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং শ্রীমদ্‌গুরুম্।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতম্॥ ৬৮॥
পরাৎপরং পরং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকম্॥
হৃদয়াকাশ মধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিক সন্নিভম্॥ ৬৯॥

অনুবাদ

হে দেবি! বেদ, বেদান্ত ও শ্রুতি বাক্যে শ্রীগুরুকে পরমপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "গুরু" এই অক্ষরদ্বয় সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ॥ ৬৪॥

বেদ, স্মৃতি ও সংহিতাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া যদি গুরুসেবায় নিবিষ্টমনা না হয়, সে যদি সন্ন্যাসীও হয় তথাপি তাহাকে প্রকৃত সন্ন্যাসী বলা যায় না, তাহাকে বেশমাত্রধারী কৃত্রিম সন্ন্যাসী জানিবে॥ ৬৫॥

মানবগণ গুরুকৃপাবলেই আত্মারাম অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দজ্ঞানের অধিকারী পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই প্রকার বিশুদ্ধভাবে গুরুসেবাকারী ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান লাভের যথার্থ অধিকারী॥ ৬৬॥

পরমাত্মার প্রতিবিম্বস্বরূপ সামান্য কীটাদি হইতে অসামান্য বস্তু ব্রহ্ম পদার্থ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্বময় শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি॥ ৬৭॥

যিনি সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ নিত্যজ্ঞান সুখস্বরূপ, ভেদজ্ঞানের বহির্ভূত, নিত্য, পূর্ণ, নিরাকার, নির্গুণ আত্মারাম সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি সর্ব্বদা বন্দনা করি॥ ৬৮॥

যিনি পরাৎপর, ধ্যানযোগ্য, নিত্য ও আনন্দপ্রদ, হৃদয় আকাশ-মধ্যস্থ শুদ্ধস্ফটিক মণির ন্যায় নির্ম্মল, সেই শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে॥ ৬৯॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং ধ্যায়ত চিন্ময়ং হৃদি।
তত্র স্ফুরতি যো ভাবঃ শ্রুত্বাত্বং কথয়াম্যহম্॥ ৭০॥
অগোচরং তথাগম্যং রূপনামাদিবর্জ্জিম্।
নিঃশব্দন্তু বিজানিয়াৎ স ভাবো ব্রহ্ম পার্ব্বতি॥ ৭১॥
যথা নিজ স্বভাবেন কর্পূরং কুঙ্কুমাদিকম্।
শীতোষ্ণাদি স্বভাবেন যথা ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্॥ ৭২।
গুরু ধ্যানাৎ তথা নিত্যং দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
পিণ্ডে পদে তথা রূপে মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥৭৩॥
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।
পিণ্ডং কিং তন্মহাদেব পদং কিং সমুদাহৃতম্।
রূপঞ্চ রূপাতীতঞ্চ এতদাখ্যাহি শঙ্কর॥৭৪॥
শ্রীশঙ্কর উবাচ।
পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংসমুদাহৃতম্।
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতং নিরঞ্জনম্॥৭৫॥

অনুবাদ

এইরূপ অঙ্গুষ্ঠমাত্র চিন্ময় পুরুষের ধ্যান করিতে করিতে পরম যে পবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৭০॥

হে পার্ব্বতি! পূর্ব্বকথিত ধ্যান-যোগসিদ্ধ হইলে, বাক্য মনের ও অগোচর, অগম্য, রূপ ও নামাদি বর্জ্জিত, শাব্দিক জ্ঞানের অবিষয় একটি পরম পবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই ভাবকেই ব্রহ্মভাব বলিয়া বুঝিবে॥ ৭১॥

কুঙ্কুম ও কর্পূরাদি দ্রব্যে যেমন স্বভাবতঃই সুগন্ধ অবস্থান করে, শীতও গ্রীষ্মাদি ঋতুগুলি যেমন একটির পর একটি পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় সেইরূপ পরব্রহ্মে যে নিত্যত্ব তাহাও স্বতঃসিদ্ধ জানিবে॥ ৭২॥

নিয়ত শ্রীগুরুধ্যানে নিবিষ্টমনা ব্যক্তিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং তাহাকে পিণ্ড, পদ ও রূপসম্বন্ধে মুক্ত পুরুষ বলা অযৌক্তিক হয় না॥ ৭৩॥

শ্রীপার্ব্বতী দেবী বলিলেন—হে শঙ্কর! পিণ্ড, পদ, রূপ ও রূপাতীত কাহাকে বলে, দয়া করিয়া আমাকে বলুন। ৭৪॥

পার্ব্বতীর বাক্যে পুনরায় মহাদেব বলিতে লাগিলেন—হে দেবি! কুণ্ডলিনী

সোঽহং সর্ব্বময়ো ভূত্বা পরং ব্রহ্ম বিলোকয়েৎ।
পরাৎ পরতরং নান্যৎ সর্ব্বমেব নিরাময়ম্ ॥৭৬॥
যস্যাবলোকনাদেব সর্ব্ব সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ।
একান্ত নিস্পৃহঃ শান্ত স্তৎক্ষণাদ্ ভবতি প্রিয়ে ॥৭৭॥
লব্ধং বাথ ন লব্ধং বা স্বল্পং বা বহুলং তথা।
নিষ্কামেনৈব ভোক্তব্যং সদা সন্তুষ্ট মানসাৎ ॥৭৮॥
সদানন্দঃ সদাশান্তো রমতে যত্র কুত্রচিৎ।
যত্রৈব তিষ্ঠতে সোঽপি সদেশঃ পুণ্যভাজনঃ ॥৭৯॥
মুক্তস্য লক্ষণং দেবি তবাগ্রে কথিতং ময়া।
উপদেশো ময়া দেবি গুরুমার্গেণ দর্শিতঃ ॥৮০॥
গুরু ভক্তি স্তথা ধ্যানং সকলং তব কীর্ত্তিতম্।
অনেন যদ্ভবেৎ কার্য্যং তদ্বদামি মহাতপঃ ॥৮১॥

অনুবাদ

শক্তিকে পিণ্ড, হংসকে পদ, বিন্দুকে রূপ এবং পরমাত্মা নিরঞ্জনকেই রূপাতীত বলিয়া জানিবে ॥ ৭৫ ॥

সোঽহং অর্থৎ আমিই পরংব্রহ্মস্বরূপ এই প্রকার অভেদ জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইনি শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠ, এতদ্ ব্যতীত অন্য কোন নিরাময় অর্থাৎ পরম মঙ্গলময় বস্তু আর নাই ॥ ৭৬ ॥

হে প্রিয়ে। এই পরম পদার্থের দর্শন লাভ ঘটিলে জীব তৎক্ষণাৎ সঙ্গ-বর্জ্জিত, নিঃস্পৃহ ও শান্ত ভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৭ ॥

কোন বস্তুর প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি অথবা প্রাপ্ত বস্তু অল্প বা অধিক হউক, তাহাতে কোনরূপ বিচলিত চিত্ত না হইয়া সর্ব্বদা প্রীতিসহকারে অথচ নিষ্কাম ভাবে প্রাপ্ত বিষয়ের উপভোগ করিতে হইবে ॥ ৭৮ ॥

এইরূপ পবিত্র চেতা ব্যক্তি সর্ব্বদা সদানন্দ মনে যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, সেই স্থানকেই পবিত্র বলিয়া মনে করিবে ॥ ৭৯ ॥

হে দেবি! তোমাকে এই সকল মুক্ত পুরুষের লক্ষণ ও শ্রীগুরুর আশ্রয় পন্থার উপদেশ বলিলাম ॥ ৮০ ॥

তোমার নিকট গুরুভক্তি পন্থা ও গুরু ধ্যানাদি সকলই প্রকাশ করিলাম।

লোকোপকারকং দেবি লৌকিকন্তু ন ভাবয়েৎ।
লৌকিকাৎ কর্ম্মণো যান্তি জ্ঞানহীনা ভবার্ণবে ॥৮২॥
গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরৌনিষ্ঠা পরংতপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥৮৩॥
ধন্যা মাতা পিতা ধন্যো ধন্যং সর্ব্বং কুলং তথা।
ধন্যা চ বসুধা দেবি গুরুভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥৮৪॥
শরীরমিন্দ্রিয় প্রাণা অর্থ স্বজন বান্ধবাঃ।
পিতৃ মাতৃ কুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥৮৫॥
আজন্ম কোট্যাং দেবেশি জপব্রত তপঃ ক্রিয়াঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমং দেবি গুরু সন্তোষ মাত্রতঃ ॥৮৬॥
বিদ্যাধন মদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ।
গুরোঃ সেবাং ন কুর্ব্বন্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥৮৭॥

অনুবাদ

এ সকল হইতে যেরূপ মহা তপস্যার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এক্ষণে তোমার নিকট তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮১ ॥

হে দেবি! তোমার নিকট যে বিষয় প্রকাশ হইল ইহা লোকসকলের সর্ব্বথা উপকারক হইলেও সামান্য লৌকিক উপদেশ মনে করিও না। যাহারা শ্রীগুরুতত্ত্ব-জ্ঞানহীন তাহারাই লৌকিক অর্থাৎ সাধারণ লোকাচার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সংসার সাগরে নিপতিত হয় ॥ ৮২ ॥

হে দেবি! শ্রীগুরুই দেবতা, শ্রীগুরুই ধর্ম্ম, শ্রীগুরুনিষ্ঠাই পরম তপস্যা, শ্রীগুরু অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই, শ্রীগুরুতত্ত্ব অপেক্ষা আর পরম তত্ত্ব নাই ॥ ৮৩ ॥

হে দেবি। যে বিশুদ্ধ ব্যক্তির চিত্তে পরম দুর্লভ গুরুভক্তির প্রকাশ হয় তাহার মাতা, পিতা, কুল এবং সেই ব্যক্তির জন্মস্থান সমস্তই ধন্য জানিবে ॥ ৮৪ ॥

হে দেবি! আপন শরীর, ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চপ্রাণ, ধন, স্বজন, বান্ধব, পিতৃ ও মাতৃ-কুল এই সমস্তই নিঃসংশয়ে শ্রীগুরু-স্বরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৮৫ ॥

হে দেবেশি! মানব কোটী জন্ম পর্য্যন্ত জপ, ব্রত ও তপোনুষ্ঠান করিয়াও শ্রীগুরুর সন্তোষ ব্যতীত তাহার ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৮৬ ॥

গুরোঃ সেবাপরং তীর্থমন্যতীর্থমনর্থকম্।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্‌গুরোশ্চরণাম্বুজম্ ॥৮৮॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীহরপার্ব্বতি সংবাদে শ্রীশ্রীগুরুগীতা স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অথ শ্রীগুরুগীতা ফলশ্রুতিঃ

ইদন্তু ভক্তিভাবেন পঠ্যন্তে শ্রূয়তেঽথবা।
লিখিত্বা বা প্রদীয়তে সর্ব্ব কামফল প্রদম্ ॥১॥
গুরুগীতাভিধং দেবি শুদ্ধং তত্ত্বং ময়োদিতম।
ভবব্যাধিবিনাশার্থং স্বয়মেব সদা জপেৎ ॥২॥
গুরুগীতাক্ষরৈকৈকং মন্ত্ররাজমিদং প্রিয়ে।
অনয়া বিবিধা মন্ত্রাঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম ॥৩॥

---

অনুবাদ

যাহারা বিদ্যা ও ধন-মদে মত্ত হইয়া শ্রীগুরু সেবায় পরাঙ্মুখ হয় তাহাদিগকে অত্যন্ত মন্দভাগ্য বলিয়া জানিবে॥ ৮৭ ॥

হে দেবি! শ্রীগুরু সেবাই পরমতীর্থ স্বরূপ, শ্রীগুরু সেবা-ব্রত-ধারী মহাত্মাদিগের অন্য তীর্থের কোনই প্রয়োজন নাই, কেন না সদ্‌গুরুর শ্রীপাদপদ্মই তীর্থ সকলের আশ্রয় স্বরূপ জানিবে॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীগুরুগীতার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীগুরুগীতার ফলশ্রুতির অনুবাদ।

মহাদেব বলিলেন—এই গুরুগীতা স্তোত্র, শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিলে অথবা লিখিয়া গুরু-ভক্তকে দান করিলে সর্ব্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়॥ ১ ॥

হে দেবি! গুরুগীতা নামক যে বিশুদ্ধ সত্ত্বমূলক পরমতত্ত্ব তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, ভব-ব্যাধি বিনাশের জন্য সাধকগণ নিয়ত ইহা জপ (পাঠ) করিয়া থাকেন॥ ২ ॥

হে প্রিয়ে! এই গুরুগীতার প্রত্যেক অক্ষরটাই এক একটী মন্ত্ররাজ জানিবে। অপরাপর মন্ত্র ইহার ষোড়শাংশেরও তুল্য নয়॥ ৩ ॥

সর্ব্বপাপং সমুদ্বেগং সর্ব্বদারিদ্র্য নাশনম্ ।
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বসঙ্কট নাশনম্ ॥৪॥
যক্ষরাক্ষসভূতানাং চৌর ব্যাঘ্রভয়াপহম্ ।
মহাব্যাধি হরঞ্চৈব বিভূতি সিদ্ধিদং ভবেৎ ॥৫॥
মোহনং সর্ব্বভূতানাং বন্ধ বিমোচকং পরম্ ।
দেবভূপ প্রিয়করং লোকানাং বশমানয়েৎ ॥৬॥
মুখ স্তম্ভকরং নৃণাং সদ্‌গুণানাং বিবর্দ্ধকম্ ।
দুষ্কর্ম্ম নাশনঞ্চৈব সৎকর্ম্ম সিদ্ধিদং ভবেৎ ॥৭॥
ভক্তিদং সিদ্ধয়েৎ কার্য্যং নবগ্রহ ভয়াপহম্ ।
দুঃস্বপ্ন নাশনঞ্চৈব সু-স্বপ্নানাং প্রদর্শকম্ ॥৮॥
সর্ব্বশান্তিকরং নিত্যং বন্ধ্যা পুত্র ফলপ্রদং ।
অবৈধব্য করং স্ত্রীণাং সৌভাগ্যদায়কং পরম্ ॥৯॥
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদি বর্দ্ধকম্ ।
নিষ্কামতস্ত্রিবারং বা জপেন্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥১০॥

অনুবাদ

এই গুরুগীতা সর্ব্বপ্রকার পাপ-তাপ বিনাশক, সর্ব্বপ্রকার দারিদ্র দুঃখ হারক, সর্ব্ববিধ অকাল মৃত্যু নিবারক ও সর্ব্ববিধ বিপদকে সমূলে বিধ্বংশ করে ॥ ৪ ॥

এই গুরুগীতা যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, তস্কর, ব্যাঘ্র ও মহাব্যাধি নাশক এবং অণিমা লঘিমাদি মহা ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ জানিবে ॥ ৫ ॥

এই গুরুগীতা মহামন্ত্র সর্ব্বভূত-মোহন, বন্ধন হারক, মুক্তি প্রদায়ক, দেবতা ও নৃপতিগণের প্রীতিজনক এবং লোকবশীকরণের শক্তি ইহাতে বর্ত্তমান জানিবে ॥ ৬ ॥

এই গুরুগীতা পাঠ করিলে শত্রুদিগের মুখ স্তম্ভন করে, সৎগুণাবলী বৃদ্ধি করে, দুষ্কর্ম্ম বিনাশ করে এবং সৎকর্ম্মে সিদ্ধি প্রদান করে ॥ ৭ ॥

এই গুরুগীতা গুরুভক্তি বর্দ্ধনে, অভিলষিত কার্য্যে সিদ্ধি প্রদানে, নবগ্রহ ভীতি নিবারণে, দুঃস্বপ্নাদি নাশনে এবং সুখ স্বপ্ন প্রদানে সর্ব্বদা সমর্থ জানিবে ॥ ৮ ॥

এই গুরুগীতা সর্ব্বপ্রকার শান্তিপ্রদ। বন্ধ্যাস্ত্রীর পুত্র দাতা, নারীগণের অবৈধব্যকর এবং সৌভাগ্য দায়ক। ৯॥

এই গুরুগীতা পরমায়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং পুত্র। পৌত্রাদি বর্দ্ধক জানিবে

সর্ব্ব দুঃখং ভয়ং বিঘ্নং নাশয়েত্তাপহারকম্ ।
সর্ব্ববাধা প্রশমনং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্ ॥১১॥
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।
কামিনাং কামধেনুশ্চ কল্পিতস্য সুরদ্রুমম্ ॥১২॥
চিন্তামণিং চিন্তিতস্য সর্ব্বমঙ্গল কারকম্ ।
জপেচ্ছাক্তশ্চ শৈবশ্চ গাণপত্যশ্চ বৈষ্ণবাঃ ।
সৌরশ্চ সিদ্ধিদং দেবি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্ ॥১৩॥
সংসার মল নাশার্থং ভব তাপ নিবৃত্তয়ে ।
গুরুগীতাম্ভসি স্নানং তত্ত্বজ্ঞঃ কুরুতে সদা ॥১৪॥
স এব সদ্‌গুরুর্যঃস্যাৎ সদসদ্ ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
তস্য স্থানানি সর্ব্বানি পবিত্রানি ন সংশয়ঃ ॥১৫॥

অনুবাদ

যে ব্যক্তি অকামচিত্তে এই গীতা স্তোত্র তিনবার পাঠ করে সে জীবন্মুক্তি লাভে সমর্থ হয় ॥ ১০ ॥

এই গুরুগীতা সকল প্রকার দুঃখ, ভয়, বিঘ্ন, ও আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ বিনাশক এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল দাতা ॥ ১১ ॥

এই গুরুগীতা পাঠ করিয়া গুরুভক্ত জন যেরূপ বাসনা করে তাহা অচিরকাল মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা কামনাকারীর পক্ষে কামধেনু সদৃশ, এবং অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি সম্বন্ধে কল্পতরু তুল্য জানিবে ॥ ১২ ॥

এই গুরুগীতা চিন্তিত পদার্থ সম্বন্ধে চিন্তামণি এবং মঙ্গল কারক। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও সৌর সকলের পক্ষেই সিদ্ধিদায়ক, জানিয়া সাধকগণ সর্ব্বদা পাঠ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সংসারে পাপ তাপ বিনাশের জন্য এবং পরা শান্তিলাভের জন্য এই গুরুগীতারূপ পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি বোধ করিয়াছেন তিনিই সদ্‌গুরু বলিয়া কথিত। এবম্বিধ শ্রীগুরুদেবের যাবতীয় বসতি স্থানই পরম পবিত্র অর্থাৎ তীর্থ স্থান বলিয়া জানিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥

সদেশঃ শুদ্ধো যত্রাসৌ গীতা তিষ্ঠতি দুর্লভা।
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে ক্ষেত্রপীঠে বসন্তি হি ॥১৬॥
শুচিরেব সদাজ্ঞানী গুরুগীতা জপেন তু।
তস্যদর্শন মাত্রেন পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৭॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্য নিজ ধর্ম্মোময়োদিতঃ।
গুরুগীতা সমোনাস্তি সত্যং সত্যং বরাননে ॥১৮॥
ইদং রহস্য নো বাচ্য তবাগ্রে কথিতং ময়া।
সুগোপ্যঞ্চ প্রযত্নেন যেনাত্মানং প্রযাস্যসি ॥১৯॥
ষড়ানন গণেশাদি দেবতানাঞ্চ পার্ব্বতি।
মনসাপি ন বক্তব্য মম সান্নিধ্যকারকম্ ॥২০॥
অতীব চিত্তশান্তে চ শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্বিতে।
প্রবক্তব্যামিদং দেবি মমাত্মাসি সদাপ্রিয়ে ॥২১॥

অনুবাদ

এই পরম পবিত্র গুরুগীতা যে দেশে প্রতিষ্ঠিত অথবা পূজিত হয়, সেই দেশ পবিত্র হইয়া থাকে, সেই স্থানে ক্ষেত্রপীঠ বা তীর্থ স্বরূপ জ্ঞানে দেবগণও অবস্থান করেন ॥ ১৬ ॥

যে ব্যক্তি এই গুরুগীতা পাঠ করে সে ব্যক্তি নিজে ত শুচি ও তত্ত্বজ্ঞানী হয়-ই অধিকন্তু যাঁহারা তাঁহাদের দর্শন করেন তাঁহাদিগেরও আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১৭ ॥

হে বরাননে! আমি বারংবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার নিজধর্ম্ম অর্থাৎ উপাসনা পদ্ধতি তোমার সমীপে প্রকাশ করিলাম, তুমি নিশ্চয় জানিবে এই গুরুগীতা তুল্য পরম বস্তু আর নাই ॥ ১৮ ॥

হে দেবি! তোমার নিকট এই যে গুরুতত্ত্ব বিষয়ক গুরুগীতা কথিত হইল ইহা অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন রাখিবে, অভক্তের নিকট কখনও প্রকাশ করিবে না ॥ ১৯ ॥

কার্ত্তিক ও গণেশাদি দেবগণ এবং শৈব ও শাক্তাদি উপাসকসম্প্রদায় যদি ভক্তি শূন্য হয়, তবে তাহাদের নিকটও আমার সান্নিধ্যকর এই গীতা বলা দূরে থাকুক, বলিব এরূপ মনেও করিবে না ॥ ২০ ॥

হে প্রিয়ে! যাহাদের চিত্ত অতীব শান্ত এবং বিশ্বাস-ভক্তি সম্বলিত

অভক্তে বঞ্চকে ধূর্ত্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে নরে।
মনসাপি ন বক্তব্যং গুরুগীতাভিধং প্রিয়ে ॥২২॥
আগমো নিগমশ্চাপি নির্ব্বাণশ্চ ত্রিধাগমঃ।
অস্মাদুদ্ধৃত্য দেবেশি গুরুগীতা ময়োদিতা ॥২৩॥
গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্য সন্তাপহারকঃ ॥২৪॥
সংসার-সাগর-সমুদ্ধারণৈক-মন্ত্রং
ব্রহ্মাদি দেবমুনি পূজিত সিদ্ধমন্ত্রম্।
দারিদ্র-দুঃখ-ভয়-শোক-বিনাশ-মন্ত্রং
বন্দে মহাভয় হর-গুরুরাজ মন্ত্রম্ ॥২৫॥
ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীগুরুগীতা-ফলশ্রুতি সমাপ্তা।

---

অনুবাদ

তাহাদিগকেই এই গীতা বলিবে। তুমি আমার আত্মতুল্য বলিয়া আমি তোমার নিকট ইহা প্রকাশ করিলাম ॥ ২১ ॥

অভক্ত, বঞ্চক, শঠ, পাষণ্ড ও নাস্তিকের নিকট এই গুরুগীতা বলা দূরে থাকুক, বলিব বলিয়া মনেও করিও না ॥ ২২ ॥

হে দেবি! আগম, নিগম ও নির্ব্বাণ এই ত্রিবিধপ্রকার আগম শাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র; আমি উক্ত আগমত্রয় হইতে সার উদ্ধারপূর্ব্বক তোমার নিকট গুরুগীতারূপে প্রকাশ করিলাম ॥ ২৩ ॥

হে দেবি! শিষ্যের বিত্তাপহারক গুরু অনেক আছে কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ নাশক গুরু অত্যন্ত দুর্লভ জানিবে ॥ ২৪ ॥

ভবসিন্ধু পারের পক্ষে যাহা শ্রেষ্ঠমন্ত্র, যাহা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও পূজ্য, দারিদ্র, দুঃখ, ভয় ও শোকাদি বিনাশ সম্বন্ধে যাহা মহামন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত, আমি সেই মহাভয়হারী "গুরু" এই মন্ত্র-মহারাজকে বন্দনা করি ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীগুরুগীতার ফলশ্রুতির বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

---

পঞ্চগীতা সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

শরীরং সুরূপং ততো বা কলত্রং,
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরু তুল্যম্।
মনশ্চেন্নলগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥১॥
কলত্রং ধনং পুত্র পৌত্রাদি সর্ব্বম্,
গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্নলগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥২॥
ষড়ঙ্গাদি বেদো মুখে শাস্ত্র বিদ্যা,
কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্নলগ্নম্,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৩॥
বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ,
সদাচার বৃত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্নলগ্নম্,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৪॥
ক্ষমা মণ্ডলে ভূপ-ভূপাল-বৃন্দৈঃ,
সদা সেবিতং যস্য পদারবিন্দম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্নলগ্নম্,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৫॥
যশো মে গতং দিক্ষুদান প্রতাপাৎ,
জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎ প্রসাদাৎ।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্নলগ্নম্,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৬॥

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজে

ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্ ।

গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্নলগ্নম্,

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৭॥

অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে,

ন দেহে মনো বর্ত্ততেমেত্বনর্ঘ্যে ।

গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্নলগ্নম্,

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৮॥

অনর্ঘ্যানি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্,

সদা সুস্থদেহে সুখং মে সদাস্তু ।

গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্নলগ্নম্,

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৯॥

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহি,

যতির্ভূপতি ব্রহ্মচারী চ গেহী ।

লভেদ্বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্ম সজ্ঞং,

গুরোরুক্ত বাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥১০॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিতং শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকম্ সমাপ্তম্ ।